উজ্জীবন

Ujjiban

Synopses of Discourses Presented
By The Resource-Persons & the Participants
During The Ninth Re-fresher Course In Bengali
'Pre-Independence Bengali Literature'

4th - 27th March 1998

Department of Bengali Language & Literature
Academic Staff College • University of Calcutta

Compiled & Edited
By

JYOTIRMOY GHOSH
Rabindranath Tagore Professor
&
Co-Ordinator, The Ninth Refresher Course In Bengali

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

উপাচার্য রথীন্দ্রনারায়ণ বসু

সহ-উপাচার্য (অর্থ) হিরণ ভট্টাচার্য

সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) প্রবুদ্ধনাথ রায়

পূর্ববর্তী সহ-উপাচার্য (অর্থ) করুণা ভট্টাচার্য

স্বপনকুমার প্রামাণিক

প্রিয়লাল মজুমদার

তপনকুমার মুখোপাধ্যায়

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

উৎপল ঝা

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

ধূর্জটিপ্রসাদ দে

অত্রি ভৌমিক

এবং

বিভাগীয় ছাত্রছাত্রী-শিক্ষকমণ্ডলী-কর্মী ও আধিকারিকবৃন্দ

অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের কর্মিবৃন্দ

মুদ্রক :

রঞ্জন মজুমদার

অ্যাট্রিব লেজার গ্রাফিক্স

নিউব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা

ফোন: ৫৬৭-২০২৪

'আমরা
আরম্ভ করি,
শেষ করি না;
আড়ম্বর করি, কাজ
করি না; যাহা অনুষ্ঠান
করি, তাহা বিশ্বাস করি না ;
যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন
করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্য রচনা
করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে
পারি না ; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত
থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না;
আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ
পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে
থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের
গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের
সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ
করিয়া আমাদের পলিটিক্স,
এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে
নিজের প্রতি ভক্তি-
বিহ্বল হইয়া উঠাই
আমাদের জীবনের
প্রধান উদ্দেশ্য ...'

লেখকসূচী

অজিতকুমার ঘোষ (৩২), অদীপ ঘোষ (৩৮), অনিমেষ বসু (৭),অনিল আচার্য (৩৪),
অন্নদাশঙ্কর রায় (৮), অমিতাভ দাশগুপ্ত (৩১), অশোক বসু (৪০),
অশোক মুখোপাধ্যায় (৩৭), অরুণকুমার বসু (২৮), অরুণা সরকার (৩৫),
অলোক রায় (২৯), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২৬), আবদুর রউফ (৪৪),
আশরাফ হোসেন (৪৬), আশিসকুমার দে (৪৯), কল্যাণীশঙ্কর ঘটক (৫২),
কার্তিক লাহিড়ী (৫০), কৃষ্ণ ধর (২৩),গায়ত্রী নাথচৌধুরী (৫৬),
গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (৫৪), গৌতম চট্টোপাধ্যায় (৫৩), চিত্তরঞ্জন লাহা (৬০),
চৈতন্য বিশ্বাস (৫৮), জনার্দন গোস্বামী (৫৬), জয়ন্তকুমার হালদার (৬৪),
জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (৬১), জ্যোতির্ময় ঘোষ (১৯), তপনকুমার পাণ্ডে (৭০),
তাপস ভট্টাচার্য (৬৮), তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (৬৯), তৃপ্তি পালচৌধুরী (৭২),
দর্শন চৌধুরী (৮০), দিব্যজ্যোতি মজুমদার (৭৭), দীপেন্দু চক্রবর্তী (৭৯),
দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৭৫), ধূর্জটিপ্রসাদ দে (২৪),নন্দিতা মিত্র (৮৭),
নন্দিনী মুখোপাধ্যায় (৮৯), নিত্যানন্দ সাহা (৮৩), নির্মলনারায়ণ গুপ্ত (৮৩),
নির্মলেন্দু ভৌমিক (৮৪),পল্লব সেনগুপ্ত (১০৫), পিনাকেশ সরকার (৯৬),
প্রভাসকুমার রায় (৯৯), প্রমীলা ভট্টাচার্য (১০৩), প্রশান্তকুমার পাল (৯১),
প্রিয়লাল মজুমদার (২১), প্রীতিপ্রভা দত্ত (১০০), বরুণকুমার চক্রবর্তী (১০৯),
বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (১১২), বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (১০৯),
বিশ্বনাথ রায় (১০৭), বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য (১১১), বিপ্লব দাশগুপ্ত (১১৫),
মনিলাল খান (১১৬), মধুমিতা চক্রবর্তী (১২৩), মনোজকুমার অধিকারী (১১৯),
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (২০), মাধবী দে (১২৪), মাধবী বিশ্বাস (১২১),
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১১৭), মিহির ভট্টাচার্য (১২৭), যূথিকা বসু (১২৭),
রত্না বসু (১৩৮), রথীন্দ্রনারায়ণ বসু (৫), রবীন্দ্রনাথ বল (১৩৪),
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৯), রামেশ্বর শ (১৩১),
রীতা কর (১৩২), রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী (১২৮), রেবা সরকার (১৩৬),
শর্মিষ্ঠা সেন (১৪০), শ্যামল চক্রবর্তী (১৩৯), শ্রীমতী চক্রবর্তী (১৪১),
সত্যজ্যোতি দাস (১৬৬), সত্যবতী গিরি (১৪৩), সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (১৫৮),
সিদ্ধেশ্বর সেন (২৫), সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৫৬), সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় (১৪৬),
সুগতা সেন (১৪৮), সুধাময় বাগ (১৬৩), সুধীর বিষ্ণু (১৬০), সুমনা পুরকায়স্থ (১৫৩),
সুমিতা চক্রবর্তী (১৪৭), সুমিতা দাস (১৬৭), সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৬২),
সুলেখা পণ্ডিত (১৬৮),সুস্মিতা সোম (১৫৪), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১১), স্বপন বসু (১৫৮),
স্বপন মজুমদার (১৪৯), স্বরূপকুমার যশ (১৫০), হাসনে আরা সিরাজ (১০)

একুশের উজ্জীবনী প্রেরণা

'আমার ক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নকালে আমাকে বাংলা-অধ্যাপকের সুলভ সংস্করণরূপে চালাতে গেলে তাতে কাজেরও ক্ষতি হবে, আমার পক্ষেও সেটা স্বাস্থ্যকর হবে না। আমি এই জানি যে, আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গবাণী-বীণাপাণির মন্দিরদ্বারে বরণ করে নেবার ভার আমার'পরে। সেই কথা মনে রেখে আমি তাকে অভিনন্দিত করি। এই কামনা করি যে, যখন ধূম্রমলিন নিশীথপ্রদীপের নির্বাপণের ক্ষণ এল, তখন বঙ্গদেশের চিত্তাকাশে নবসূর্যোদয়ের প্রত্যুষকে যথার্থ স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন ভৈরবরাগে ঘোষণা করে এবং বাংলার প্রতিভাকে নব নব সৃষ্টির পথ দিয়ে অক্ষয় কীর্তিলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ । ভাষণ : ডিসেম্বর ১৯৩২

১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' রূপে যে-অভিভাষণটি পাঠ করেছিলেন তার একটি অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তিনি এই আশা প্রকাশ করেছিলেন। সমগ্র ভাষণটি আপনাদের সুপরিচিত । তাই বিস্তারিত বিশ্লেষণে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলার অধ্যাপক'রূপে 'শিক্ষার বিকিরণ' নামে পুনরায় যে ভাষণটি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন, সেটিও একটি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এই ভাষণ-প্রবন্ধটিও বহুমাত্রিক। আমি প্রাসঙ্গিক একটি অংশ উদ্ধৃত করছি—

'সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন। ইস্কুল-কলেজের বাইরে শিক্ষা বিছিয়ে দেবার উপায় সাহিত্য। কিন্তু সেই সাহিত্যকে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার আধার করতে হবে, দেখতে হবে তাকে গ্রহণ করবার পথ সর্বত্র সুগম হয়েছে। এজন্যে কোন্ বন্ধুকে ডাকব? বন্ধু যে আজ দুর্লভ হলো। তাই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারেই আবেদন উপস্থিত করছি।

'বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি : তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্‌বেল ধারা বাঙালিচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।'

আজ যখন আমরা পঁয়ষট্টি বৎসরের ব্যবধানে স্বাধীন দেশে দাঁড়িয়ে দেখছি, বহুভাষাভাষী বহু সংস্কৃতির এই ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি ভাষা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের যথাযোগ্য পদক্ষেপ পর্যন্ত সম পরিমাণ উদ্যোগ ও আর্থিক আনুকূল্যসহ গৃহীত হয় নি, তখন সর্বাগ্রে মনে পড়লো: এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপকরূপে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের

দু'টি অবিস্মরণীয় ভাষণ। ভাষণদুটির প্রাসঙ্গিকতা এখনও বহুল পরিমাণে বিদ্যমান বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের অন্তর্গত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগীয় ১৯৯৫ সালের 'রবীন্দ্রসাহিত্য ও তুলনামূলক সাহিত্য' শীর্ষক উজ্জীবনী পাঠমালা (রিফ্রেশার কোর্স) -র সঞ্চালক আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ যখন আমাকে জানালেন, তাঁর পাঠমালাটি 'একুশে ফেব্রুয়ারির উদ্দেশে নিবেদিত'-রূপে তিনি চিহ্নিত করতে চান, তখন আমি সানন্দে সম্মতি দিয়েছি এবং যেহেতু সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার আধাররূপে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকাই সর্বাগ্রগণ্য, তাই মনে করেছি, একুশে ফেব্রুয়ারির স্মরণীয়তা হবে এ রকম একটি পাঠমালার উপযুক্ততম পরিপ্রেক্ষিত।

১৯৯৫ সালের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন স্বীকৃত- 'উজ্জীবনী পাঠমালা'র মূল অভিপ্রায়কে এইভাবে আমি ও 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন সমিতি' একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের মর্মকথার সঙ্গে অন্বিত করতে দ্বিধা বোধ করি নি। স্বভাবতই, ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে এবারেও অধ্যাপক ঘোষ যখন একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের প্রস্তাব করেন, তখন আমি তাতে সানন্দে সম্মতি জানিয়েছি। দুই বাংলারই আপনজন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি পঁচানব্বই বৎসর বয়সেও উজ্জীবিত অন্নদাশঙ্কর ১৯৯৫ সালের মতো এবারেও এপারে একুশের ভাবগত ও সাহিত্যিক তাৎপর্য যেভাবে পরিস্ফুট করেছেন, তা-ও তাঁরই মতো আমাদের অনেককেই বাষ্পরুদ্ধ করেছে। আজকের সভার প্রধান অতিথি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আবদুর রউফ-এর ভাষণটির প্রতিও আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অন্যতম প্রধান অতিথি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ শয্যাশায়ী হয়ে পড়ায় শেষ মুহূর্তে আসতে না-পারলেও তিনি আমাদের একুশে প্রসঙ্গে স্মরণীয় একটি রচনা পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ।

একুশে ফেব্রুয়ারি প্রসঙ্গে আরো একটি অনুষ্ঠান অচিরেই হতে চলেছে। সেখানেও আপনাদের উপস্থিতি কাঙ্ক্ষিত।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ অনুসরণ করে আমরা এই পাঠমালায় অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের 'অ্যাকাডেমিক' অভিপ্রায়ের সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা-সাহিত্যগত আকুতিকে সমন্বিত করে এই যে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছি, এখানে মাতৃভাষা, সাহিত্যপ্রেমিক এবং সংস্কৃতিমনস্ক সবাইকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।

রথীন্দ্রনারায়ণ বসু
উপাচার্য

৪ মার্চ ১৯৯৮
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতা তুমি

অনিমেষ বসু

স্বাধীনতা , তুমি স্বপ্ন-শিখরে ছিলে
আজ আমাদের বুকের নিবিড়ে উত্তাপ এনে দিলে

স্বাধীনতা, তুমি আমাদের প্রত্যয়
জাগিয়ে দিয়েছ , হৃদয়ে সূর্যোদয়

স্বাধীনতা, তুমি আমাদের উচ্ছ্বাসে
চিরদিন বাঁচো নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে

স্বাধীনতা, তুমি সন্তান-হারা মার
অশ্রুসজল বুকের মধ্যে নতুন আবিষ্কার

স্বাধীনতা, তুমি উষ্ণ রক্ত, ঘাতকের ছোঁড়া গুলি
বুকে নিয়ে থাকা স্বপ্নসমেত শহীদের মুখগুলি

স্বাধীনতা, তুমি রক্তে রাঙানো রণে
অর্জিত বলে, হারাবো না কোনোক্ষণে

স্বাধীনতা, তুমি একুশে ফেব্রুয়ারি—
বলো স্বাধীনতা,— তোমাকে ভুলতে পারি ?

চিরায়ু একুশ

অন্নদাশঙ্কর রায়

দেশ ভাগ হয়ে গেলেও ভাষা ভাগ হয়ে যায় নি। এপারের বাংলা ভাষা ওপারেরও বাংলা ভাষা। মাঝখানে কোনো সীমান্তরেখা নেই। সুতরাং বাংলা ভাষার জন্য যদি কেউ ঢাকায় প্রাণদান করে তবে তা কলকাতার বাংলা-ভাষীদের প্রাণেও বাজে। সেই কারণে একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষাশহীদদের জন্য আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেদনা বোধ করি।

ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার খবর পাবার পরেও আমি নিহতদের জন্য শোকাতুর হই। কারণ তাঁরা ভাষা সূত্রে আমার আত্মীয়। এর ঠিক একবছর পরে একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে শান্তিনিকেতনে আমরা যে সাহিত্য-মেলা অনুষ্ঠান করি সেটি ঐ একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণেই।

কিন্তু, সেকথা কাউকে জানতে দিই নি, কারণ তাহলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে কয়েকজন বাঙালি-মুসলিম সাহিত্যিক আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার অনুমতি পেতেন না। পরে কলকাতায় আবার আমরা ওপার থেকে কাউকে না পেয়ে এপারের সাহিত্যিকদের নিয়ে স্মারক অনুষ্ঠান করেছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে এই অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আপনা থেকে গজিয়ে ওঠে। পেছনে কোনো রাজনৈতিক দল কিম্বা কোনো সরকারি সংস্থা থাকে না। যাঁরা যোগ দেন, তাঁরা বক্তৃতা দেন, গান করেন। সাধারণত রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ কিম্বা নজরুলের গান গাওয়া হয়। তাছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত একটি নতুন গানও গাওয়া হয়— 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি?...'

না, ভোলা যায় না। যাঁরা রক্ত দিয়ে সে-দিনটিকে রাঙিয়ে দিলেন, তাঁরা যথার্থই আমাদের ভাই। এখানে ধর্ম বা রাজনীতির প্রশ্ন অবান্তর।

আমি দীর্ঘদিন ওপার বাংলায় জেলায়-জেলায় কর্মসূত্রে ঘুরেছি। অনেক

মানুষের সঙ্গে মিশেছি। অনেক মুখ আজও মনে আছে। মনে পড়ে এখনও অনেক ছবি, অনেক অভিজ্ঞতা।

ধর্মান্ধতা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। সে যে-ধর্ম প্রসঙ্গেই হোক না কেন। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে পারস্পরিক যে-ভালোবাসা , তাই শ্রেয়। কিন্তু ভালোবাসা আর বিশ্বাস একাধারে না-মিললে শুধু ব্যক্তিগত বা পারস্পরিক জীবন নয়, দেশ-জাতি-ভবিষ্যৎ কোনোকিছুরই ভিত্তিভূমি কি খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের , এমনকী মানুষে-মানুষে অনেক সময় যে-ব্যবধান তৈরি হয়, তার মূলে অনেক কারণই খুঁজে বের করা সম্ভব। ধর্মসংস্কৃতিজনিত কারণটি তীব্র চেহারায় দেখা দিলে, তখন বলি ধর্মান্ধতা।

কিন্তু যেমন আছে এই নেতিবাচক প্রবণতা, তেমনই কি নেই উদার মানবচেতনার অগণিত দৃষ্টান্ত? সে-রকম দৃষ্টান্তও অনেক মনে পড়ে। এই দুর্দিনের অন্ধকারে সেগুলিই দীপশিখার মতো জ্বল্‌জ্বল্‌ করে। চোখে জল আনে। বুকে বলও।
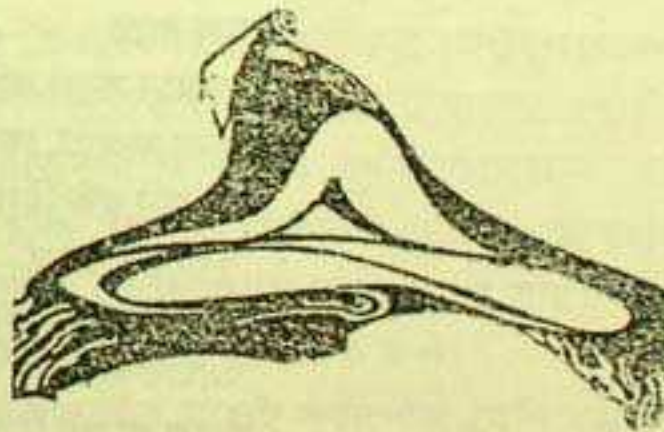
রক্তের মাঝে লাল সূর্য

হাসনে আরা সিরাজ

কোনো এক ফাল্গুনের সকালে
এক নৃশংস ঘাতক
ছড়িয়ে দিয়েছিল, লাল আবিরের মতো
তাজা লাল মানুষের রক্ত,
আমার সাদা বিছানায়।
সেই সময়, কেউ হয়তো
আমার নাম ধরে ডেকেছিল,
আমার পিঠে চাবুক গর্জে উঠলো,
আমি চমকে উঠে পড়ে গেলাম,
লাল রক্তের মাঝে।
পিঠবয়ে নেমে যাচ্ছে, লাল রক্ত · · ·
আমরা বাঙালি,
আর রক্ত চাই না,
ফেলে দাও, তোমাদের
হাতের ধারালো ছুরি,
আমাকে বিশ্বাস করো
কেউ জানবে না
তোমাদের পরিচয়,
পদ্মার স্বচ্ছ নীল জলে ভাসিয়ে দেবো
ঐ সব অস্ত্র।
যে মাটির আমি স্বপ্ন দেখতাম
মধ্য রাতে,
সেখানে সবুজ কচি-পাতায়
খেলা করতো, লাল, হলুদ প্রজাপতিরা।
সেখানে রক্ত ছিল না তো?
সূর্যাস্তের আগে
লাল শিমুলের পাপড়িতে দেখতাম
আমার ভাইয়ের মিষ্টি মুখ
যাকে রক্তের মিছিলে হারিয়েছি
ফাল্গুন মাসে
২১ ফেব্রুয়ারি।

অস্তিত্বের নির্ভর

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বাংলা আমার ভাষা, আমার মুখের ভাষা, লেখার ভাষা, আত্মপ্রকাশের মাধ্যম, এ ভাষা আমার অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। একুশে ফেব্রুয়ারি তাই আমায় মনে করায় আমার অস্তিত্ব। এই দিনটির তাৎপর্য আমার অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে।

নানা সূত্রের হিসেবে দেখেছি, 'আজ সারা বিশ্বে দুই বাংলার অধিবাসী এবং প্রবাসী বাঙালিদের ধরলে প্রায় তেইশ কোটি লোকের' মুখের ভাষা বাংলা। স্বভাবতই মনে হয় বাসভূমি নির্বিচারে সমগ্র বাঙালিদের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে একটা 'ইন্টারনেট সিস্টেম' গড়ে উঠুক। প্রত্যেক বাঙালির হৃদয়বীণা মাতৃভাষার সুরঝঙ্কারে ঐক্যসুরে ধ্বনিত হোক। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বাসস্থান সেখানে গৌণ।

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, বাঙালির সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা আবহমানকাল ধরে ব্যাপ্ত। প্রাচীনকালে, উপ-মহাদেশের মানচিত্রের দিকে তাকালেও বঙ্গ-সংস্কৃতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অনুভূত হয়। বাংলা ভাষাভাষীর সমস্ত জীবনটাই যেন লিরিকের মতো। ভৌগোলিক 'পরিবেশ-পরিস্থিতি' সব মিলিয়ে মনের গড়নেও রয়েছে লিরিকের সারাৎসার অর্থাৎ এ সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে একটা পৃথক সুর।

বাংলা ভাষাভাষীর স্বভাবের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক বৈপরীত্য বা প্যারাডক্স। একদিকে রয়েছে গীতধর্মী সত্তা অন্যদিকে রয়েছে পৌরাণিক ভাষায় রুদ্র ভৈরবের অস্তিত্বের ব্যঞ্জনা। মধ্যযুগ থেকে তুর্কী, আফগান প্রভৃতি যে সব বৈদেশিক শক্তির আগমন ঘটেছে বাংলাদেশে, তাঁরা প্রত্যেকেই বাঙালির এই বিপরীতমুখী অস্তিত্বের বর্ণনা করেছেন। মধ্যযুগের তুর্কী ঐতিহাসিকেরা বাঙালিদের বলেছেন বিদ্রোহের প্রতীক। এই মধ্যযুগেই বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসে প্লাবিত বঙ্গদেশ ঐতিহ্যাকাশে ভাস্বর দেখা যায়। আবার কালকেতু-ফুল্লরা বাঙালির সংগ্রামী ঐতিহ্যের আর এক রূপ।

ভারতবর্ষে বাঙালির মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশি ধর্মীয় সমন্বয় ঘটেছে বলা যায়। কবীর, নানক, দাদুসহ বাউলদের প্রভাব বাংলায় মধ্যযুগ থেকেই লক্ষণীয়। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, অনেক গৌণ বৈষ্ণব উপ-সম্প্রদায়ের

প্রবক্তা মুসলিমরা । কাজেই বাংলাভাষার এই বিশিষ্ট ইতিহাস আছে প্রায় প্রথমাবধি।

উনবিংশ শতকে তথাকথিত রেনেসাঁসের যুগে, অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতে তথা বাংলায় তখন বঙ্গসংস্কৃতি ও ভাষার সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ফলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নতুন মাত্রা লাভ করে। আর সেই অভিঘাতেরই ফসল রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল প্রমুখ মহৎ সাহিত্যিক। বস্তুত মানবতাবাদী এবং যুক্তিবাদী যে চেতনা তার সঙ্গে এদেশে প্রথম সংযোগ ঘটে বাঙালিরই।
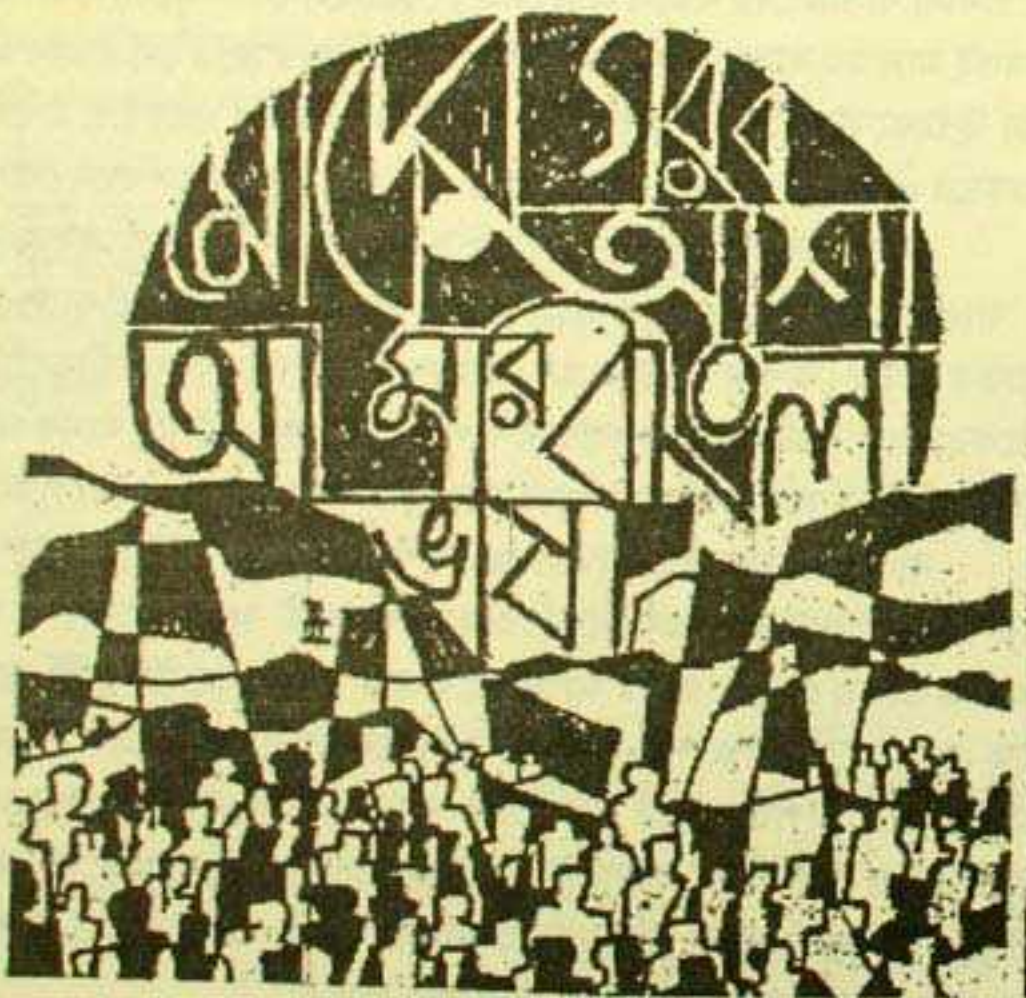
এই পটভূমিতে দাঁড়িয়েই আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যবহ নবদিগন্তপ্রসারী একুশে ফেব্রুয়ারি। কিন্তু শুধু একুশে ফেব্রুয়ারি নয়— এর সমান্তরালে মনে রাখতে হবে শিলচরের কথাও । ভাষার জন্যে প্রাণদান—

একথা একমাত্র বাঙালিই ভাবতে পেরেছে, এযাবৎকালের ইতিহাসে একমাত্র বাঙালিই সর্বস্ব পণ করতে পেরেছে। শুধু ঢাকায় নয়, আসামের শিলচরেও। একথা যেন আমরা না ভুলি।

সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতার স্বার্থে সংগঠিত যে প্রবল হিন্দু ও হিন্দুত্বের চাপের মধ্যে আমরা আছি এই চাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের স্মরণে রাখতে হবে একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদদের পাশাপাশি শিলচরের শহীদদের কথা। তাঁরাই এই সর্বনাশী চাপ থেকে আমাদের আত্মরক্ষার প্রেরণা।

অবিভক্ত বাংলার যে রাজনৈতিক খণ্ডন তার পেছনে প্রধানত দায়ী অবাঙালি নেতৃত্ব — পশ্চিম পাকিস্তান। আবুল হাসান, শরৎ বসু, সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ যাঁরা যথার্থ বাঙালি তাঁরা প্রত্যেকেই অবিভক্ত বাংলার প্রস্তাব তুলেছিলেন। এই খণ্ডন ছিল জোর করে আরোপিত।

বস্তুত বাংলা ভাষা ও বাঙালি সত্তা স্বতন্ত্র। আমি অন্য ভাষার বিরোধী নই, কিন্তু, বঙ্গভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি স্বাতন্ত্র্যকামী এক সত্তা, তাই স্বাভাবিকভাবেই এই সত্তার কাছে একুশে ফেব্রুয়ারির ঢাকার শহীদরা এবং আসামের শিলচরের শহীদরা এক অবিস্মরণীয় আত্মিক প্রেরণা।

সমগ্র মধ্যযুগ থেকে দেখা গেছে দিল্লির বাদশাহ যখন যাকে বাংলার মসনদে গভর্নর বা রাজার প্রতিনিধি করে পাঠাচ্ছেন, বঙ্গমাটির সংস্পর্শে এসে তারা প্রত্যেকেই স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠে বিদ্রোহ করছে। ইসলাম খাঁ, মুর্শিদকুলি খাঁ বা তারও আগে আলাউদ্দিন খলজী প্রেরিত তাঁর নিজের পিতা প্রত্যেকেই বাংলায় এসে স্বাধীন রাজা হয়ে বসেন। এখানেই বাংলার জাতিগত বৈশিষ্ট্য।

বাংলা ভাষা স্বভাবে ও চরিত্রে আন্তর্জাতিক। সে বিশ্বকে আপন করে, প্রত্যেকটি মানুষকে স্বাতন্ত্র্যকামী করে, বিদ্রোহী করে, ভালোবাসতে শেখায় তাই বাংলা ভাষা জীবনের সুদৃঢ় অবলম্বন, অপরিহার্য আশ্রয়। একুশে ফেব্রুয়ারি তাই জীবনসত্তায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত, নব নব তাৎপর্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে, নতুন চিন্তায় ভাবিত করে, ভাষামনস্ক করে তোলে।

প্রসঙ্গত

'ভুল হ'য়ে গেছে বিলকুল
আর-সব কিছু ভাগ হ'য়ে গেছে
ভাগ হয়নি কো নজরুল
এই ভুলটুকু বেঁচে থাক···'

পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষভাবে অধ্যাপনার সুযোগ পাওয়ায় কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রফেসর-হেড হিসাবে যোগ দিয়েই স্নাতক(সাম্মানিকসহ) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠ্যক্রম আদ্যন্ত ঢেলে সাজানো অনিবার্য মনে হয়েছিল। বিভাগীয় সহকর্মিবৃন্দ সকলেই, বিশেষত ড. রামেশ্বর শ' এ-কাজে আমাকে খুবই সাহায্য করেছিলেন। তিনি ছাড়া ড. দর্শন চৌধুরী, ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় ও ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতা পেয়েছিলাম। সবচেয়ে বড়ো কথা প্রয়াত অধ্যাপক ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য, আমার প্রত্যক্ষ শিক্ষক অধ্যাপক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষকপ্রতিম অধ্যাপক ড. অজিতকুমার ঘোষ এ-কাজে আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞরূপে সর্বতোভাবে আমার নতুন উদ্‌যোগকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

১৯৮৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক' পদে যোগ দিই এবং ১৯৯১ সাল থেকে দু'বৎসরের জন্য বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করি। বিভাগীয় দায়িত্ব ছাড়াও সেই সময়ে শিক্ষা-সাংবাদিকতা-গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ফ্যাকালটির ডীন রূপে আমাকে এক বৎসরের কিছু বেশি সময় সাংবাদিকতা বিভাগেও অধ্যক্ষরূপে কাজ করতে হয়েছিল। তবু, যথাসময়ে পরীক্ষাগ্রহণ ও ফলপ্রকাশের মাধ্যমে বিভাগের শিক্ষাবর্ষটিকে সঠিক অবস্থানে নিয়ে আসা, স্নাতকোত্তর পড়াশোনা-পরীক্ষাকে পার্ট ওয়ান ও পার্ট টু-তে বিভক্ত করা এবং সর্বোপরি, স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমকে ঢেলে সাজার কাজটিও করে ওঠা সম্ভব হয়।

পাঠ্যক্রম ঢেলে-সাজার কাজটি করতে গিয়ে যেসব বিষয়ে দৃষ্টি দিতে

হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে প্রধানতম : ত্রিকালের বাংলা সাহিত্যের পঠনপাঠনকে সময়োচিত ('নেট' ও 'স্লেট' পরীক্ষার কথা মনে রাখাও ছিল খুবই জরুরি) আরো অনুপুঙ্খ , অর্থবহ এবং সমগ্র চেহারা ও চরিত্রে স্থাপন করা ।

সে-সময়ে নানা বিরুদ্ধতা, তীব্র ও কূট, জটিল ও আক্রমণাত্মক, দেখা দিয়েছিল। তবু দিনের পর দিন অসংখ্য বিভাগীয় সভা ও বোর্ড অব স্টাডিজ-এর সভায় সহকর্মিবৃন্দের প্রায় সকলেরই এবং বিশেষভাবে মাননীয় উপাচার্য বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী রথীন্দ্রনারায়ণ বসু মহাশয়ের পূর্ণ সমর্থন পাওয়ায় সেই বিরুদ্ধতাও অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিল। সমকালের বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রগুলির পাতায় সেই প্রচেষ্টা ও বিরুদ্ধতার খবর মিলবে। আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞদ্বয় অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস ও অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ এবং বিভাগীয় অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ও অনুজপ্রতিম সহকর্মিদ্বয় অধ্যাপক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ও ড. মানস মজুদারের সক্রিয় সহযোগিতার স্বতন্ত্র উল্লেখ সত্যের খাতিরেই অবশ্যকর্তব্য।

এ সব কথা কেন? কেননা, পাঠ্যক্রমের কথা বাদ দিয়ে 'উজ্জীবনী পাঠমালা' অর্থাৎ রিফ্রেশার কোর্সের তাৎপর্য ও ফলাফল অনুধাবন করাও অসম্ভব। 'পাঠমালা' কোনো গতানুগতিক কৃত্য নয়, তার একটি প্রাণবান গতিময়তাও বিদ্যমান।

সবটা জড়িয়ে প্রচেষ্টা ও লক্ষ্য ছিল এইরকমই। প্রথম দিন থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত । ফলের কথা বলা সহজ নয়। সকলের বিচার ও সিদ্ধান্ত, দিতে পারার ও নিতে পারার প্রবণতা ও ক্ষমতাও একাকার হতেই পারে না। আমি জানি, ফল নয়, আমার শুধু 'কর্মে ছিল অধিকার'। সাধ্যমতো কাজটুকুই করতে চেয়েছি মাত্র। আর কিছু নয়।

অনুষ্ঠান থাকলেই কিছু-না-কিছু আনুষ্ঠানিকতাও থেকে যায়। কিন্তু অনেক সময়েই উপলক্ষ যেমন লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে যায় তেমনিই আনুষ্ঠানিকতাও অনুষ্ঠানকে অতিক্রম করে যায়।

এই পুস্তিকাটির গ্রন্থনা ও প্রকাশনা আদৌ আনুষ্ঠানিক নয়। এই পুস্তিকাটিতে প্রধানত সংকলিত হয়েছে 'উজ্জীবনী পাঠমালা'য় উপস্থাপিত 'পত্র' (পেপার) ও ভাষণসমূহের সারাৎসার। এই সারাৎসারগুলি কম-বেশি মূল্যবান ও সংরক্ষণযোগ্য। এগুলি বিক্ষিপ্ত কাগজের মাধ্যমে, 'টাইপ' ও

'জেরক্স' করে বিতরণ করলে সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষত অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বাংলা টাইপের হাল কি, তা জানেন। সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিও এখানে সংকলিত হলো।

আমাদের অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের বিচক্ষণ ও কঠোর কিন্তু প্রিয় পরিচালক প্রিয়লালবাবু এই সব তথ্যই জানতে চান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকেও যথানিয়মে জানিয়ে থাকেন। তাই তথ্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে কোথাও-কোথাও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত নিবেদন, অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রণিধানযোগ্য পঠনীয় রচনাদি পরিবেশনের লক্ষ্যেই এই সংকলন-প্রয়াস।

সব জড়িয়ে প্রস্তুত সংকলনটি, এবারের 'উজ্জীবনী পাঠমালা'য় অংশগ্রহণকারী , পাঠদাতা, অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ, অংশত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিবর্গের সকলকেই কোনো-না-কোনো দিক থেকে কম বা বেশি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উজ্জীবিত করতে পারে , এই বিনম্র প্রত্যাশা নিয়ে প্রকাশিত হলো।

সপ্তাখানেকের দিবারাত্রির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রায়-অসাধ্য এই কাজটি সম্ভব করে তোলায় যাঁরা আমার সহকর্মী ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রেসের স্বত্বাধিকারী তরুণ কর্মোদ্যোগী শ্রীরঙ্গন মজুমদার ও তাঁর সহযোগী অজিত দে যেমন আছেন, তেমনই আছেন আমার ছাত্রছাত্রী, পাঠদাতা, পাঠগ্রহীতা, অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের কর্মিবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও শিক্ষকবৃন্দ। বিশেষত বিভাগীয় সহকর্মিবৃন্দের সহযোগিতা ছাড়া ৪মার্চ থেকে ২৭ মার্চ ব্যাপী এতগুলি দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজ কিছুতেই সুসম্পন্ন হতে পারতো না। তাই, 'সবারে আমি নমি'।

●

এই নিয়ে প্রায় পরপর তিনটি 'উজ্জীবনী পাঠমালা'র দায়িত্ব আমার বহন করতে হলো। সঞ্চালকের এই দায়িত্বভার গ্রহণ মানেই আর্থিক ঝুঁকির ভারও বহন। অনুষ্ঠান অর্থবহ ও সফল হলে ভালো লাগে। কিন্তু প্রবাদকথিত 'ব্রাহ্মণে'র গরুটিকে খুঁজে পাই কোথায়? গরুর অভাব নেই । কিন্তু সর্বার্থসাধক সেই বিশেষ 'গরু'টি কোথায়?

তবু আমাদের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান অনুজপ্রতিম বিমল যখন প্রায়

শেষ মুহূর্তে জানালেন, এই মুহূর্তের বিভাগীয় বিন্যাসের বিশিষ্টতার বৈগুণ্যে যদি আমি দায়িত্ব না-নিই, তা-হলে এই উজ্জীবনী পাঠমালাটি এবারের ঘোষণামতো আর হতেই পারবে না, তখন বিভাগের মর্যাদার প্রশ্নে আমাকে সম্মত হতেই হয়েছিল। আমার সঙ্গে কেউ থাকলে ভালো হতো। কিন্তু এই 'ঝামেলা'র কাজে সচরাচর কেউ নিজেকে জড়াতে চান না।

ন্যূনতম সময়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান তবু যে এতটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো, তার জন্য বিভাগীয় প্রধানের সজাগ দৃষ্টির পাশাপাশি বিভাগীয় কয়েকজন গবেষক-ছাত্রছাত্রীর অক্লান্ত একাগ্র কর্মনিষ্ঠার উল্লেখ করতেই হয়। অধ্যাপিকা শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায়সহ অপর্ণা সেনগুপ্ত, প্রবীণ শিকদার, কার্তিক বিশ্বাস ও কুতুবুদ্দিন মোল্লা প্রমুখ কয়েকজনের কর্তব্যনিষ্ঠা বিভাগের গৌরব বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রশাসনের দিক থেকে অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের পরিচালক অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক প্রিয়লাল মজুমদার, নিবন্ধক ড. তপনকুমার মুখোপাধ্যায়, কলা-বাণিজ্য অনুষদের সচিব ড. ধূর্জটিপ্রসাদ দে, অর্থ-আধিকারিক অত্রি ভৌমিক এবং বিভাগের সহকর্মিবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিটি শিক্ষাকর্মী-বন্ধুর সহযোগিতাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিদায়ী সহ-উপাচার্য (অর্থ) ড. করুণা ভট্টাচার্যের সহৃদয়তা অন্ধ ও নির্বোধ যান্ত্রিকতা ছাপিয়ে আমাদের স্পর্শ করেছে। পরিশেষে, এবারের পাঠমালার অংশগ্রহণকারী শিক্ষকবন্ধুদের এবং তাঁদের পাঠদানকারী বিশেষজ্ঞগণের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ। কেননা, সকলেই জানেন, 'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুইজনে'।

এবারের 'উজ্জীবনী পাঠমালা'র কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে—

১. ১৫ মার্চ অন্নদাশঙ্কর পদার্পণ করলেন পঁচানব্বইয়ে। ৪ মার্চ উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে ও তরুণ শিল্পী ইন্দ্রজিৎ নারায়ণ-অঙ্কিত লালনের একটি বড়ো বাঁধানো ছবি তাঁর হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা কৃতার্থ। আমাদের সৌভাগ্য, উপাচার্য মহোদয় দু'টি কাজই করেছেন আমাদের অনুরোধে। তাঁর কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

দুই বাংলার মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র অন্নদাশঙ্কর আবেগমথিত কণ্ঠে একুশের মহিমা স্মরণ করেছেন, মানবতার মাহাত্ম্য ঘোষণা করেছেন। উপাচার্য মহোদয়সহ কেউ নিরাবেগ থাকতে পারে নি। অন্নদাশঙ্করের

ভাষায় স্মরণ করেছি শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে উপনীত প্রেমিক ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে—

'ভুল হ'য়ে গেছে বিলকুল
আর-সব কিছু ভাগ হ'য়ে গেছে
ভাগ হয়নি কো নজরুল
এই ভুলটুকু বেঁচে থাক···'

এই ভুলটুকু বেঁচে থাক। এই আমাদের একান্ত মনের আকাঙ্ক্ষা।

২. কবি সিদ্ধেশ্বর সেন 'একুশের কবিতামালা' পাঠ করেছেন। তাঁকেও উত্তরীয় পরিয়ে সম্মানিত করেছি আমরা।

৩. রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অনুজপ্রতিম ড. চিত্তরঞ্জন লাহা উপাচার্য (অস্থায়ী)-রূপে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁকে আমরা এবারের উজ্জীবনী পাঠমালায় সম্মানিত করেছি।

৪. 'উজ্জীবনী পাঠমালা'র সমাপ্তি-দিবসে আমি বক্তাদের বক্তব্যের সারাৎসারসহ একটি সংকলন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হাতে তুলে দিয়ে থাকি। এবারের বৈশিষ্ট্য: শুধু বক্তাদের নয়, অংশগ্রহণকারীদেরও উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলির সারাৎসারসহ এই সংকলন। বক্তা ও অংশগ্রহণকারীদের পূর্ণাঙ্গ রচনা নয়, সারাৎসারই মুদ্রিত হলো। সেজন্য অসম্পূর্ণতার দায় ও দায়িত্ব তাঁদের নয়। একান্তই আমার। অর্থাৎ সীমিত আর্থিক বরাদ্দের জন্যই রচনাগুলিকে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করতে হয়েছে।

৫. এবারের শংসাপত্র প্রদানের জন্য আমাদের অনেকেরই শিক্ষক প্রবীণ বিভাগীয় অবসরপ্রাপ্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

৬. অনুষ্ঠানের শেষদিন প্রথম পর্যায়ের অনুষ্ঠানরূপে বাংলা বানান সংস্কার সংক্রান্ত যে আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছি, তা বস্তুত যশস্বী ভাষা-বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের মুখোমুখি খোলাখুলি আলোচনার ব্যবস্থা। ১৯৩৬ সালে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বাগ্রে বাংলা বানান বিধি প্রবর্তন করেন। অন্নদাশঙ্করের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কয়েকবৎসরের চেষ্টায় পুনশ্চ বানান সংস্কার সম্পন্ন করেছে। তাই আকাদেমির

প্রচেষ্টার সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযোগসাধনের দিকে লক্ষ্য রেখেই আকাদেমির সক্রিয় সহযোগিতায় এই বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা। আকাদেমির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যরূপেও এই কাজটি খুব জরুরি মনে হয়েছে। আকাদেমির সচিব সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট আধিকারিক উৎপল ঝা এবং আকাদেমিতে আমাদের সহকর্মী কবি শঙ্খ ঘোষ, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক পবিত্র সরকার প্রমুখ এবং মাননীয় উপাচার্য, অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের পরিচালক অধ্যাপক প্রিয়লাল মজুমদার ও বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে পরামর্শ করেই এই আলোচনার ব্যবস্থা।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৭ মার্চ, ১৯৯৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক
ও
সঞ্চালক : নবম উজ্জীবনী পাঠমালা

একুশে ফেব্রুয়ারি

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মানুষ খুঁজছে নিজেকে হাতড়ে নৈরাশ নির্ভাষা
অপরিচয়ের অন্ধ সুড়ঙ্গ, সুদূর কলক আশা—
মানুষের মা মানবশিশুকে উদ্ধার করে শেষে
বুকের রক্তে মাতৃদুধের ভেলকি দেখান হেসে
সেই দুধে মুখ— মাতৃভাষার ফুটল- যে মউঝুরি
শিরায় শোণিতে ঝনন আত্ম-আবিষ্কারের সুরই।
আত্ম-আবিষ্কর্তা মানুষ জগৎ ছিনিয়ে নিতে
রক্ত-সমুদ্দুর সাঁতরিয়ে মৃত্যুকে আড়ি দিতে
বাংলাদেশের দুলাল হল সে
— একুশে ফেব্রুয়ারি
পুনর্জন্মে তারই অমরতা ফরমান করে জারি।

একুশে ও উজ্জীবনী পাঠমালা

একুশের আহ্বান সাড়া জাগায় না, বিশ্বের কোনো প্রান্তে এমন কোনো মানুষের কথা আমার জানা নেই— বাংলা যাঁর মাতৃভাষা। বিশেষত আমার মতো কয়েক কোটি বঙ্গভাষাভাষী তো আছেনই, যাঁরা জলমাটির সম্পর্কে ওপার-বাংলার মানুষ। আমাদের সর্বস্বত্যাগের মধ্যেও এই একটি গর্ব ও গৌরবের সুখ আছে যে, বাহান্ন'র ভাষা-আন্দোলনকে ওপার বাংলার যাঁরা বিশ্বব্যাপী মাহাত্ম্য দান করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমার গ্রাম আমার জেলারও প্রতিবেশী মানুষের সংখ্যা অগণিত। তা-ছাড়া নিছক বঙ্গভাষাভাষীরূপে সব দুঃখ সত্ত্বেও আমাদের একটি বিজয়গর্ব তো আছেই— বিশ্বের একটি অন্তত দেশের রাষ্ট্রভাষা আমাদেরই মাতৃভাষা।

অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের অনারারি ডিরেক্টররূপে আমার বিশেষ আনন্দের কারণ, আমারই কার্যকালে ১৯৯৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একুশের অনুষ্ঠান একটি নিয়মিত আনুষ্ঠানিক উৎসবরূপে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। খুব সঙ্গত ও প্রত্যাশিত কারণেই বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক আমার অনুজপ্রতিম ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ বিভাগীয় তৃতীয় উজ্জীবনী পাঠমালার (রিফ্রেশার কোর্সের এই সুন্দর ভাষান্তরটিও ড. ঘোষের) সঞ্চালকের দায়িত্ব পেয়েই আমাদের প্রিয় ও মাননীয় উপাচার্য ড. রথীন্দ্রনারায়ণ বসু মহাশয়ের সম্মতিক্রমে ও সক্রিয় উৎসাহে তাঁর পাঠমালার সূচনার দিন একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখেই অসাধারণ রুচিসম্মত ও সফল একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। বলাই বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রই এই সাফল্যের অংশীদার : ছাত্রছাত্রী-শিক্ষার্থী-শিক্ষাকর্মী-আধিকারিক সকলেই।

এবারেও বিভাগীয় নবম উজ্জীবনী পাঠমালার সঞ্চালকরূপে অধ্যাপক ঘোষ পুনশ্চ ৪ মার্চ তারিখেই দুই বাংলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্করকে মধ্যমণিরূপে একটি চিত্তাকর্ষক একুশে স্মরণোৎসব উদ্‌যাপন করেন ঐতিহাসিক দ্বারভাঙা সভাগৃহে। অন্নদাশঙ্করই '৯৫ সালের প্রথম আনুষ্ঠানিক একুশের উৎসবেও ছিলেন মধ্যমণি। এবারেও তিনি। একুশের

সঙ্গে অন্নদাশঙ্করও যেন সমার্থক হয়ে গেছেন বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে।

সঞ্চালকরূপে অধ্যাপক ঘোষ প্রত্যেকবারই একটি বা একাধিক মূল্যবান সংকলন প্রকাশ করেন। প্রচন্ড পরিশ্রম, সাহিত্যিক কল্পনাশক্তি ও তাঁর ছাত্রছাত্রীবাহিনীর সাহায্যেই এত কিছু সম্ভব হয়ে ওঠে। প্রতিবারই অনুষ্ঠানের শেষ দিনে সংকলন প্রকাশ যে কী অবিশ্বাস্য কর্মতৎপরতায় সম্ভবপর, তা সকলেই অনুভব করবেন। একান্ত প্রথাবিরোধী এই সব নজির তাঁর পরবর্তীদের অনুপ্রাণিত করবে, আশা করি।

এবারের সংকলনের অভিনবত্ব এখানেই যে শুধু আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞগণের বক্তব্যেরই সারাৎসার নয়, অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপিত রচনাগুলিরও বস্তুসার সংকলিত হয়েছে। এই সারস্বত উদ্যোগ অভিনন্দনযোগ্য, সন্দেহ নেই।

প্রিয়লাল মজুমদার
পরিচালক
অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ

রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৭ মার্চ, ১৯৯৮

সেলাম একুশে

কৃষ্ণ ধর

তোমাকে নিয়ে কি আমি কিছু লিখতে পারি
বাহান্ন বছর ধরে রয়েছি যে দূরে
স্মৃতিও ধূসর হয়, নদীর স্রোতের ধ্বনি যায় না শোনা
এতই দূরের আমি হতভাগা, মজ্জমান বিস্মৃতির তলে।

তবুও ভোরের আজান এসে বলে দিয়ে যায়
আজকে তোমার দিন, ঘুম ভেঙে জাগরণ এসে
শোনায় সে লোককথা, তুমি প্রবচনে মিশে আছো সুনিবিড়
কচি কচি শহীদদের নামগুলি এক বুক রক্তে মাখামাখি হয়ে
শুয়ে আছে বর্ণমালার কাঁথায় নিস্পন্দ শরীরে
বিদ্যাসাগরের ছাঁচে পড়া শব্দাবলীর সোপান বেয়ে
উঠে আসি মায়ের বুকের কাছে
তার স্তনসুধারস দিয়ে মাতৃভাষার শরীর নির্মাণ
তুমি এসে বলে গেলে, এখনই তো জাগার সময়
বাতাসে উড়াল দিয়ে ডানা ঝেড়ে বলে গেল পাখি,
এখনও ঘুমুবি তুই? জননীর রক্তে ভাসে মাটি,
মুখের জবান কাড়ে, দুহাতে পোড়ায় ওরা লালনের একতারা
নিষেধাজ্ঞা জারি করে লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণের বিস্ময়ে গান গাওয়া
স্তব্ধ করে দেয় তোর সত্যপীর গাজনের পালা।

মনে পড়ে আমারও একদিন যায় যাবে প্রাণ চলে
গান গেয়ে বেরিয়েছি পথে, স্বপ্নের তোরণ গড়ে
একদিন সকালের কাছে গিয়ে দেখেছি আকাশ
নীলিমাকে স্পর্শ করে একুশের শহীদ মিনার
আমরা তাকে বর্ণমালা দিয়ে ঢেকে রেখেছি হৃদয়ে
শিশিরে ধুয়েছি তার শরীরের ধুলোবালি
শীতরাতে রেখেছি বুকের কাছে উষ্ণতার আবরণে
তপ্ত হলে বর্ষায় দিয়েছি তাকে ধারাজল।

আকাশ নক্ষত্র জানে ঘুমোয় না সে কোনোদিন
তার সারাক্ষণ জাগরণ, মায়ের মুখের ভাষা আগলে রাখে
কখনো সতর্ক করে আমাদের বিচ্যুতির
ফের রণক্ষেত্রে উজ্জ্বল নিশান তোলে সাহসের
একুশের অপর নাম দেশকালভাষার চেতনা
সত্তার সংগ্রাম।

ধন্যবাদ

সবশেষে সবচেয়ে তৃপ্তিকর কাজের দায়িত্বটি আমার। আজকের 'উজ্জীবনী পাঠমালা'র উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একুশের সুরে-ছন্দে-লয়ে এমনভাবে বাঁধা যে মনে হলো, আবির চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী সঙ্গীতটির পরে রাজেশ্বর ভট্টাচার্য হয়ে অজিত পাণ্ডে পর্যন্ত সমস্তটা জড়িয়ে একটিই গান যেন। মাঝে যখন এ কালের অন্যতম বিশিষ্ট কবি সিদ্ধেশ্বর সেন স্বরচিত একুশের কবিতাগুচ্ছ পাঠ করছিলেন, তখনও কোথাও কোনো ছেদ ঘটেছে বলে একটিবারও মনে হয় নি। অমিতাভ বাগচীর আবৃত্তিও একুশকে স্মরণে -মননে আত্মস্থ করতে সহায়ক হয়েছে।

আমাদের উপাচার্য ব্যস্ততার মধ্যেও এই অনুষ্ঠানে প্রায় শেষ পর্যন্ত থেকেছেন। আজকের সভার মধ্যমণি মনীষী অন্নদাশঙ্কর পঁচানব্বইয়ের মুখে দাঁড়িয়ে যেভাবে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক ঐক্যসাধনার কথা আবেগরুদ্ধ গলায় আমাদের শোনালেন, তাতে আমরা অভিভূত। 'চতুরঙ্গ'- সম্পাদক আবদুর রউফ একুশের তাৎপর্য ও আমাদের কর্তব্যপথ সন্ধানে গভীর মননশীলতার পরিচয় দিলেন। অন্নদাশঙ্করের আসন্ন ৯৫-তম জন্মদিনটিকে মনে রেখে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পরিকল্পনায় 'নবম উজ্জীবনী পাঠমালা'র সঞ্চালক সমগ্র অনুষ্ঠানে একটি অভিনব মাত্রা যুক্ত করে দিলেন। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্যপদে নিযুক্ত বাংলার অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন লাহাকে প্রধান অতিথিরূপে আহ্বানও যথাযোগ্য হয়েছে।

অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের পরিচালক অধ্যাপক প্রিয়লাল মজুমদার, বাংলার বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদের ভাষণে নবম উজ্জীবনী পাঠমালার এই সব বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ যেভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে সঞ্চালিত করেছেন, সেই একাগ্র কর্মসাধনাই তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এইভাবে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ করলেন এবং যাঁরা উপস্থিত থাকতে পারলেন না, সকলকেই অশেষ শুভেচ্ছা ও অজস্র ধন্যবাদ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৪ মার্চ, ১৯৯৮

কলা-বাণিজ্য-সচিব

একই বাচনিক হৃদয়ে, একুশে

সিদ্ধেশ্বর সেন

শুধু অতীতাশ্রয়ী নয়, এ জীবনের চলনের
ইতিহাস
কর্ম্মময়, মানবিক
আশা—
অনেক সংগ্রামের এ নদীমাতৃকে, দুইতটে
দেশে—
এপারে-ওপারে, তরঙ্গের শীর্ষে, যাওয়া-আসা
এসব দেখেছি আমি
একই বাচনিক হৃদয়ে বসবাসে, মেশে
একই কবির বাণীর প্রত্যাশা—
কোনও ধর্মমোহ নয়, জাতির উত্থান বিবেক
তাই সে মুক্তিযুদ্ধের একাত্তরে , শহীদ একুশে
প্রাণ পেয়ে
জেগে ওঠে—
যেমন সে জাগা আমাদের, অতন্দ্রের
তখনই, রচনাও করেছি তো
দু'পারে-বাংলার এক-রক্তরাখীর মতো
বাক্‌স্তোত্র, ঘন-অর্থবহ:
'মায়ের মুখের পুণ্য-ভাষা'।
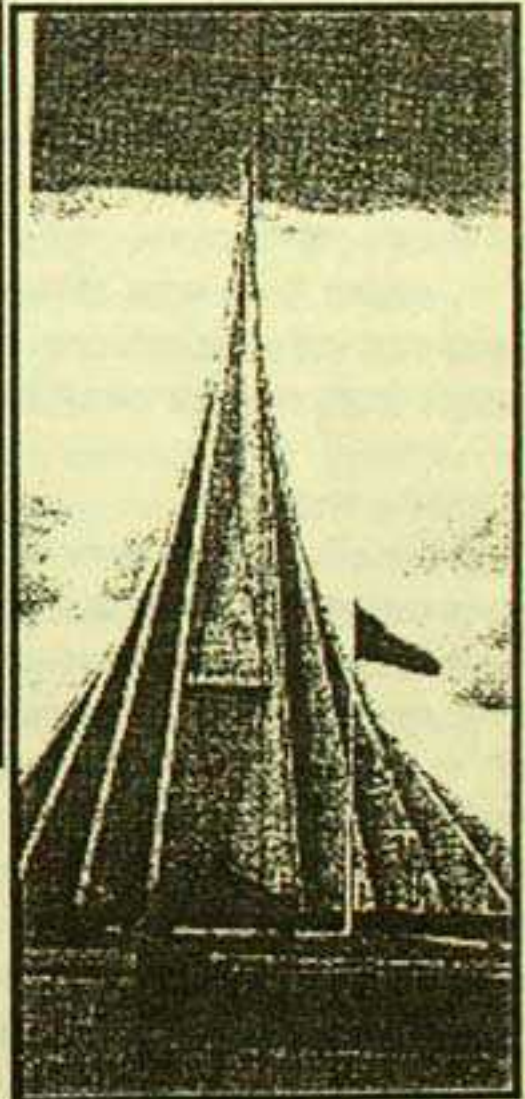
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যপাঠের ভূমিকা

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বভারতের একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্যমণ্ডিত ভৌগোলিক সংস্থানের মধ্যে এক-ভাষাভাষী সংহত নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় সহস্রাধিক বৎসর ধরে যে জীবনাদর্শ, আধিমানসিক স্বরূপ ও শিল্পসমুৎকর্ষ বিকাশ লাভ করেছে তার শ্রেষ্ঠ প্রতীকের নাম বাংলা সাহিত্য। আর্দ্রভূমির দেশ বাংলা ; স্থল, জল আর বায়ুপ্রবাহ এদেশের স্থাবর সংস্কৃতির প্রতি অকৃপণ দাক্ষিণ্যদানে কিছু বিরূপ। অবিশ্বাস্য অল্প সময়ের মধ্যে মঠ-মন্দির কালের কবলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, রাজপ্রাসাদ ও পর্ণকুটিরের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না শতাব্দীকালের ব্যবধানে। মূর্তি, চিত্র, পুঁথি— সব কিছুই অচিরকালের মধ্যে কীটের ভোজ্যে পরিণত হয়েছে, বাস্তবে তার মূর্তি চক্ষুষ্মানের কাছে নিষ্প্রভপ্রায়। কিন্তু মহাকালের রক্তচক্ষু অবহেলা করে এবং বর্ষাবাদল কীটপতঙ্গের গ্রাস এড়িয়ে যে বিপুল পুঁথিসম্ভার এযাবৎকাল রক্ষা পেয়েছে, তার মধ্যেই প্রাচীনকালের বাঙালির যথার্থ মনঃপ্রকৃতি, শিল্পচেতনা ও আত্মপরিচয় ধরা পড়েছে। এ-জাতির প্রাচীন ও মধ্যযুগের আন্তর-স্বরূপ যে বিস্মরণীয় যবনিকার তলে চিরমুকত্ব লাভ করেনি, তার একমাত্র কারণ বাংলার পুঁথি-আশ্রয়ী মধ্যযুগীয় সাহিত্য। আমাদের প্রাচীন শিল্পের গৌরব আজ ধ্বংসস্তূপে সমাধি লাভ করেছে, শৌর্যবীর্যের প্রমাণও ইতিহাসের বিবর্ণ পৃষ্ঠায় নথিভুক্ত হয়ে আছে। আমাদের সেনা সজ্জিত-চতুরঙ্গে রঘুর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল কিনা তা মহাকবি কালিদাসই ('রঘুবংশম্') বলতে পারেন। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে — তা সে প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক— যে কালেরই সাহিত্য হোক না কেন, বাঙালির সমগ্র চেতনা-প্রবাহ তার মধ্যে ধরা পড়েছে , একথা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা বাঙালি-জীবনের সেই আশ্চর্য স্বরূপ অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আলোচনা করব।

মৃত্তিকার উপরে মনের প্রতিষ্ঠা, আর সাহিত্য হলো সেই মনের বাঙ্ময় প্রকাশ। সুতরাং সাহিত্যালোচনার পূর্বে দেশের পরিচয়গ্রহণ প্রয়োজন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের রেখাচিত্র অঙ্কনের পূর্বে তার পটভূমি বিশ্লেষণের জন্য তদানীন্তন ইতিবৃত্ত ও জনজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক।

প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি

আর্য পিতৃগণের প্রাচীনগ্রন্থে পূর্বজনপদবাসী গৌড়-বঙ্গ-সুহ্ম সমতটের সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ নেই। একদা ব্রহ্মাবর্তের মহর্ষিকুল অঙ্গ-বঙ্গবাসী আর্যেতর নরগোষ্ঠীর প্রতি অতিশয় ঘৃণ্য ধারণা পোষণ করতেন, এই 'দেশোহনার্যনিবাসঃ' — এর প্রতি আর্য ভূদেবদের শ্রদ্ধা থাকে কী করে? তাই এদেশে এলে আর্যদের জাতি যেত, দুঃসাহসিক আর্য যুবকেরা এদেশে যাতায়াত করলে তাদের ভালে 'ব্রাত্য' কলঙ্কতিলক এঁকে দেওয়া হতো। তারপরে নানা প্রায়শ্চিত্তমূলক যাগযজ্ঞাদি ('ব্রাত্যস্তোম') করবার পর তারা আবার আর্যমণ্ডলে স্থান পেত। সে যাই হোক, কালক্রমে এদেশের প্রতি উত্তরাপথের আর্যদের উন্নাসিক 'আর্যামি'র অনুকম্পা হ্রাস পেল, পাণিনি-পতঞ্জলির গ্রন্থে মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রে, রামায়ণ-মহাভারত এবং বৌদ্ধ-জৈনগ্রন্থে গৌড়-বঙ্গ শ্রদ্ধার আসন লাভ করল। মূলত উত্তরাপথের আর্যসংস্কার সংস্কৃত ভাষা ও স্মৃতি-সংহিতার বিধানই অস্ট্রিকগোষ্ঠীভুক্ত ও আর্যমহিমাবঞ্চিত বাঙালিকে দ্বিজত্ব দান করেছে।

হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান যুগে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমা বারবার পরিবর্তিত হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সীমাস্বরূপ এই বিশাল ভূখণ্ডটি নির্ধারিত হতে পারে : ' উত্তরে হিমালয় এবং

হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভোটানরাজ্য। উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্রনদ-উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি, পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত ; পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম-ধলভূম-কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ।' এই সীমার মধ্যে বাংলা ভাষার বিকাশ, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য—' এই ভূখণ্ডেই ঐতিহাসিক কালের বাঙালির কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি।'—(ড. নীহাররঞ্জন রায়— বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব)।

একদা এদেশ গৌড়ভূমি বলে পরিচিত হয়েছিল, পরে মুসলমান যুগ থেকে এদেশের একাংশ বঙ্গের (পূর্ববঙ্গ) নামানুসারে গোটা ভূখণ্ডটাই 'বঙ্গ', 'বাঙ্গালা','বঙ্গাল' প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হলো, পাশ্চাত্য বণিকেরাও এই বাংলাদেশকে ভূগোলে স্বীকার করে নিল। রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ— সবই আজ বঙ্গ-বাংলা নামের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

এই বিরাট ভূখণ্ডের ইতিবৃত্ত, বিশেষত রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত, উত্তরাপথের রাজ্যপ্রণালী ও রাজন্যবৃত্তের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। মৌর্য ও কুষাণ যুগে উত্তরাপথের রাজনৈতিক ইতিহাস বাংলাদেশকেও কিছু স্পর্শ করেছিল বটে , কিন্তু এদেশ যথার্থ ইতিহাসের পটে স্থান পেল গুপ্ত শাসনকালে— খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে। গুপ্ত শাসনে এসে প্রায় দু'শতকের (৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী) মধ্যে ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিসংহিতার প্রভাবে বাংলার আর্যসংস্কার বিশেষ দৃঢ়মূল হয়েছিল। হূণ আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্যের বনিয়াদ ভেঙে পড়লে কিছুকালের জন্য কর্ণসুবর্ণের (আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি গ্রাম) রাজা শশাঙ্ক-নরেন্দ্র গুপ্ত (৭ম শতাব্দী) বাংলাকে ঐতিহাসিক গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলায় কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অবসানে চারিদিকে যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা শুরু হলো , ঐতিহাসিক শাস্ত্রে তাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলে। জলাশয়ে বড়ো বড়ো মাছেরা ছোটো ছোটো মাছগুলিকে উদরসাৎ করে। সমাজেও যখন 'জোর যার মুলুক তার' নীতির আবির্ভাব হয়, তখন তাকেই বলে 'মাৎস্যন্যায়'। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় শ'খানেক বছর ধরে এদেশে বিশৃঙ্খল অরাজকতা দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করেছিল। তারপর অত্যাচারিত জনসাধারণ ও বিব্রত রাজপুরুষেরা এই বিশৃঙ্খলা দূর করবার জন্য সমবেত হয়ে গোপালদেব নামে এক সেনাপতিকে বাংলার রাজসিংহাসনে রাজারূপে অভিষিক্ত করলেন— যদিও গোপালদেব কোনো রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেননি। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রাজা গোপালদেব 'প্রকৃতি'দের (অর্থাৎ প্রজা) দ্বারা রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন, এ সংবাদ বিস্ময়কর বটে। অষ্টম শতাব্দী থেকে ১১৬০ খ্রীঃ অব্দ— তিন শত বৎসরেরও বেশি পালবংশ গৌড়ের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে পারিবারিক কলহে পালবংশ দুর্বল হয়ে পড়লে সামন্তের দল মাথা তুলে দাঁড়াল, তাদের ভিন্-প্রদেশাগত সৈন্যবাহিনীও সামন্তদের দলে যোগ দিল— বাংলায় আবার এক রাষ্ট্রসঙ্কট ঘনাল। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে যাঁরা বাংলার সিংহাসন অধিকার করলেন, তাঁরা সুদূর কর্ণাটকের অধিবাসী ব্রাহ্মণ সেনবংশ, বৃত্তিতে তাঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয়।

সেনবংশের আদিপুরুষ সামন্ত সেন কর্ণাটক ত্যাগ করে রাঢ়দেশে গঙ্গাতীরে বাস করেছিলেন। তাঁর পৌত্র বিজয় সেন গৌড়রাজ্যের রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং অল্পকালের মধ্যেই পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর পুত্র বল্লাল সেন (১১৫৮ খ্রীঃ সিংহাসন লাভ) এবং তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত) বাংলাদেশে সেনবংশের অধিকার দৃঢ়তর করেন। পালরাজারা ধর্মমতে মহাযানী বৌদ্ধ হলেও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁদের অশ্রদ্ধা ছিল না। বস্তুত তাঁদের সুদীর্ঘ-কালব্যাপী শাসনকালে গৌড়বঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ হয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য মতে ঘোরতর-

আহ্বায়ুক্ত বিদেশী সেনবংশের রাজসভাতে উচ্চ সমাজের, বিশেষত ব্রাহ্মণ সমাজের আনাগোনা বৃদ্ধি পেলেও, জনসাধারণের সঙ্গে এই শাসনের যোগাযোগ স্বাভাবিক কারণেই শিথিল হয়ে পড়েছিল। সেনরাজগণ সংস্কৃত সাহিত্য, বৈদিক যাগযজ্ঞ ও স্মৃতিসংহিতার বিধিনিষেধের দ্বারা বৌদ্ধ বাঙালিকে ব্রাহ্মণ্য মতাশ্রয়ী করার চেষ্টা করলেও তার সার্থকতা ঘটবার আগেই তুর্কী জাতির অধিনায়ক ইসলাম ধর্মাবলম্বী ইফ্‌তিকার উদ্দিন-বিন্‌-বখ্‌তিয়ার খিলজী মুষ্টিমেয় অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। অতর্কিত আক্রমণে বিভ্রান্ত, অরক্ষিত পুরীর অধিনায়ক বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন সপরিবারে পূর্ববঙ্গের নিরাপদ অঞ্চলে পলায়ন করেন (১১৯৯ বা ১২০২ খ্রীঃ অঃ) । এর অল্পকালের মধ্যেই গৌড়ভূমিতে ইসলামধর্ম এবং তুর্কী শাসনের চণ্ডপ্রভাব বিস্তারলাভ করে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। ভীরুতার জন্য রাজা লক্ষ্মণ সেন ঘরে-পরে, স্বদেশী ও বিদেশী ঐতিহাসিকের কাছে নিন্দিত হয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, লক্ষ্মণ সেন কোনোকালেই ভীরু-কাপুরুষ ছিলেন না।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই চর্যাগানগুলির আলোচনায় আমাদের নিবিষ্ট হতে হবে।

শাক্ত সাহিত্যপাঠ

অরুণকুমার বসু

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ রায়ের (১৮৮৮-১৯৫৭) সম্পাদনায় যে 'শাক্ত পদাবলী' নামক সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল দীর্ঘদিন সেটি বিশ্ববিদ্যালয়-পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়ে ঐ বিষয়ে ছাত্রদের কাছে একটি বিভ্রান্তির জটিলতা সৃষ্টি করেছে। অন্য কোনো যোগ্যতর সংকলনের অভাবে এবং শাক্ত পদসাহিত্য সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বলাভ করায় উক্ত চয়নটিই বর্তমানে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্যতা লাভ করেছে। কিন্তু সংকলনটি অবৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পিত , অনৈতিহাসিকভাবে বিন্যস্ত, পটভূমিকা সম্পর্কে অস্বচ্ছ ধারণার সঞ্চালক, ঐতিহাসিক মূল্যায়নের আদর্শ থেকে বিচ্যুত । শক্তি উপাসনাকে অবলম্বন করে গীতিপদের প্রবর্তক রামপ্রসাদ (১৭২০-১৭৮১) , এ কথা মেনে নিলেও স্বীকার করতেই হয় কবিসংগীতকারদের হাতে বা কণ্ঠে প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে আগমনী গান ছড়িয়ে পড়েছিল। নতুন শহরের গণতান্ত্রিক চেতনা নগরমুখিতা , ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, ধর্মসহিষ্ণুতা ও মনোরঞ্জনশিল্প এইসব ব্যাপার শক্তিপদরচনাকে তীব্র করেছিল। অন্যদিকে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী, জমিদার , বেনে, দেওয়ান, মুৎসুদ্দি, রাজা রাজন্যবর্গের বিলাসিতা আড়ম্বর অর্থব্যয় প্রতিযোগিতা দুর্গাপূজা কালীপূজাকে ঘিরে বীভৎস প্রদর্শনবাদের রূপ নিয়েছিল। বাংলা শ্যামাসংগীতগুলি এই সময়ের স্বরলিপি।

কিন্তু এই আলোচ্য শ্যামাসংগীত-সংকলনকে কি মধ্যযুগীয় কাব্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদাবলীর পাশে স্থান দেব ? নাকি আধুনিক সাহিত্য-ইতিহাসের সূচনালগ্নের সঙ্গে যুক্ত করব ? এই জাতীয় সংকলনে কি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, কাঙাল ফকিরচাঁদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, দাশরথি রায় এমনকী রবীন্দ্রনাথের পদও থাকবে ? তাহলে নজরুলও কেন অন্তর্ভুক্ত হবেন না ?

শক্তি-উপাসনা ও স্বদেশচেতনা কেমন করে উনিশ শতকে একাকার হয়ে গেল, তার বিবরণ কি এই জাতীয় সংকলনে থাকবে না ?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাংলা সাহিত্য

অলোক রায়

বিদ্যাসাগরকে একসময় প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনে শুধু পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা এবং অনুবাদক মনে করা হতো। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনে যে-বইগুলি তিনি লেখেন, সেগুলি প্রাথমিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করে গেছে। বর্ণপরিচয় শুধু বর্ণসংস্কারের জন্য নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার আদর্শ গ্রন্থ বলেই মূল্যবান। বীজাকারে ছোটোগল্পের সূত্রপাতও হয়েছে সেখানে। চরিত্র সরলরৈখিক হলেও তার মধ্যে সজীবতার অভাব নেই। বাংলায় ঈশপের গল্পের ভাবান্তর আগেও হয়েছে, কিন্তু কথামালা ঈশপ অবলম্বনে নতুন সৃষ্টি। আসলে মহাভারতের সামান্য অংশ ছাড়া বিদ্যাসাগর কখনই আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। কালিদাসের শকুন্তলা আর বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা মিলিয়ে দেখলেই অনুবাদের আদর্শ বুঝতে পারা যাবে। বিদ্যাসাগরের ভাবান্তর আসলে অনুসৃষ্টি (transcreation). অন্তত শকুন্তলা, সীতার বনবাস ও ভ্রান্তিবিলাস আধুনিক বাংলা গদ্য আখ্যান হিসেবেই বিচার্য। মৌলিক সাহিত্যকর্মে বিদ্যাসাগর বেশি সময় দিতে পারেননি, কিন্তু প্রভাবতী সম্ভাষণ ও স্বরচিত জীবনচরিত পড়লে বোঝা যায়, ইচ্ছা করলে তিনি সাহিত্যসৃষ্টিতেও সক্ষম ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব বাংলা সাহিত্যসমালোচনার আদি নিদর্শন, এবং মেঘদূতের ভূমিকা ও পাঠবিচার সেই সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যবিচারবোধ ছিল অভ্রান্ত। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব এবং বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার পুস্তিকাগুলি বিতর্কমূলক রচনার আদর্শ। রামমোহনের সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের রচনার তুলনা করলে তার বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে।

শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন তৎসম শব্দ বাহুল্য ও সমাসাড়ম্বরের জন্য বিদ্যাসাগরের ভাষাকে একসময় 'ভট্টাচার্যের চানা' নাম দিয়ে বিদ্রূপ করা হতো। কিন্তু বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বাদে অন্যান্য গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও সুললিত। তিনি বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট চাল বা তাল (rhythm) আবিষ্কার করেন, ফলে তাঁর গদ্যে আছে অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত। গদ্যে যতিবিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি ধ্বনিসামঞ্জস্যের প্রতি বিশেষ নজর দেন। 'কমা' চিহ্নের কিছু বাহুল্য থাকলেও বিদ্যাসাগরের গদ্যেই প্রথম 'সচেতন সুষম বাক্যগঠনরীতি' দেখা গেল। তৎসম ভাববচন সংবলিত যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহারের জন্য তাঁর গদ্য কিছুটা বিস্তারধর্মী। সীতার বনবাসের গদ্যরীতিকে যেজন্য প্রমথনাথ বিশী 'ঐরাবতের গজেন্দ্রগমন' বলেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণীয় 'ব্রজবিলাস ও তজ্জাতীয় বিতন্ডা ও বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলিতে ভাষা কেমন টাট্টু ঘোড়ার মতো ছুটিয়াছে, চার পায়ের আঘাতে গ্রাম্যশব্দের লোষ্ট্র খণ্ড ছুটিয়া গিয়া প্রতিপক্ষকে আঘাত করিয়াছে।' এক কথায় বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের আগে ভাষার এমন বিচিত্র গতিছন্দ আর কোথাও [illegible]য়া যাবে না। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ' বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী [illegible]লেন।'

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ

অলোক রায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে এক সময় বাঙালি শুধু 'মহাপুরুষ' নয়, 'অবতার' বলে পূজা করেছে। নবীনচন্দ্র সেনের মনে হয়েছিল 'নরনারায়ণ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'— 'পুণ্যং পরোপকারশ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নে— এই মহাধর্ম সংস্থাপন করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র অবতার।' দীর্ঘদিন তাঁকে 'করুণাসাগর' হিসেবেই দেখা হয়েছে। কিন্তু 'বিদ্যাসাগর' শুধু তাঁর উপাধি নয়, বিদ্যাচর্চায় তাঁর আজীবন নিষ্ঠা এবং শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অসামান্য ভূমিকার কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এবং এখানেই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সাদৃশ্য নির্দেশ সম্ভব। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অন্যতম প্রধান লক্ষণ ছিল Humanismus— জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা-মানবিক বিদ্যার অনুশীলন। ইউরোপে গ্রীক লাতিন সাহিত্যচর্চা — ' The Revival of Antiquity '— তা থেকে মানব সংক্রান্ত সকল বিষয়ে আগ্রহ— Humanism তথা মানবতাবাদের নতুন সংজ্ঞা। এর মধ্যে ছিল যুক্তির মুক্তি, ব্যক্তির মুক্তি (নারী ও নিম্নবর্ণের প্রতিষ্ঠা) ও জাতির মুক্তি— এই মুক্তিভাবনার মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। বঙ্গীয় রেনেসাঁস খণ্ডিত হতে পারে, তার মধ্যে অনেক সীমাবদ্ধতা ও স্ববিরোধ থাকতে পারে, তবু উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে নবজাগরণ এক অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক ঘটনা। বিদ্যাসাগর বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে না পারলেও তাঁর মধ্যেই Renaissance Man কে অনেক পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।

বিদ্যাসাগরের মধ্যে ছিল একদিকে অত্যুচ্চ আদর্শবাদ, অন্যদিকে বাস্তব বিষয়বুদ্ধি। সমাজসংস্কারের কাজে তিনি বিদ্রোহী—' আমি দেশাচারের দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যিক বোধ হইবে, তাহা করিব।' কিন্তু মনু-পরাশরের বিধান তিনি প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেন, সমাজবিপ্লব বা রাষ্ট্রবিপ্লব তাঁর কাম্য নয়। সহবাসসম্মতি আইন (Age of Consent Bill) নিয়ে তাঁর মন্তব্য এই কারণেই বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শ্রদ্ধাবান সমসাময়িক তাই মন্তব্য করেন, 'ঐ আইন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের পূর্ণ সহানুভূতির অভাব ও পরিবর্তিত আকারে ঐ আইন বিধিবদ্ধ করার প্রার্থনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন তখন , যেমন তেমন পরিবর্তনের প্রার্থী হইয়া কখনও সংস্কার-ক্ষেত্রে কিংবা রাজদ্বারে উপস্থিত হন নাই। সুযুক্তি ও সমাজধর্মের সীমার মধ্যে থাকিয়া যতদূর পরিবর্তন সম্ভব, তিনি স্বদেশবাসিগণের ততদূর মঙ্গলসাধনেই আজীবন প্রয়াস পাইয়াছেন।'

এ কালে বিদ্যাসাগরের চিন্তাভাবনা ও কর্মকৃতিত্বের নতুন ভাবে বিচার করা হচ্ছে। ইংরেজশাসন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব, ঐতিহ্যরক্ষায় তাঁর আগ্রহ, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর স্ববিরোধী আচরণ (নিজের স্ত্রী ও কন্যাদের শিক্ষাদানে অনাগ্রহ) ইত্যাদি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপন করে দেখা হচ্ছে।

রবীন্দ্রকাব্যের শেষ দশক (১৯৩০-১৯৪১)

অমিতাভ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের গোটা লেখালেখির একেবারে পরিণত পর্বে তিনি কোন্ রবীন্দ্রনাথ হলেন? ১৯১৩ তে নোবেল পুরস্কার পাবার পর তিনি পশ্চিমী দুনিয়ায় Poet, Philosopher and prophet বলে চিহ্নিত হন। ১ম মহাযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত য়ুরোপের যখন পায়ের তলার মাটি নেই, 'পোড়ামাটি'র দেশ, মাথার উপরে নিঃশ্বাসের বাতাস নেই, আলো নেই, মাঝখানে আছে কেবল বিশ্বযুদ্ধের ক্ষুধিত রূপ; নৈতিকতার প্রশ্ন যখন ভেঙে চুরমার, পুরোনো মূল্যবোধ অবলুপ্ত, সামাজিক সত্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে —মানবজীবন কেবল জন্ম, ক্ষুধা, কামনা, জরা ও মৃত্যুতে পর্যবসিত; য়ুরোপের বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকদের রচনায় যখন ছিন্নমস্তার জয়গান; শিল্প, সুন্দর, আধ্যাত্মিক, নৈতিকতার যুগ শেষ— এলিয়টের Waste Land এর নৈরাজ্য, নৈরাশ্য অবিশ্বাসের ভয়াল রূপ তখন প্রাচ্যের অস্ত্যর্থক অভিব্যক্তির কবিকে Poet Philosopher prophet বলে মনে করে।

বাংলায় তখন এলিয়টের প্রভাব বিপুল। যা কিছু উজ্জ্বল তাই সোনা নয়—এ জাতীয় এলিয়টীয় চিন্তায় নেতিবাচক সংশয়াকুল সুরে লিখছেন জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত। জীবনানন্দ কবিকে চিঠিতে প্রশ্ন করেন— আপনি symphony শোনেন, cacophony শোনেন নি? নৈরাজ্য দেখেননি ? কবির উত্তর— 'অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে।'

কিন্তু ক্রমশ কবি বোঝেন যুদ্ধ-পূর্ব পৃথিবী বাঁচার জন্য তাঁর আধ্যাত্মিকতাকে নিয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধোত্তর পর্বে আর পারছে না। ইতিমধ্যে আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় সমস্ত পৃথিবী কম্পমান। কবি পৃথিবীর এই পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন, মানবচিত্তের বিস্ফোরণ, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাতের সবকিছুকেই ধরতে চান। আবার পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি দায়ভারও থেকেই যায়। তিনি তো কবি, নেতা বা গুরু নন। তাই ভানুসিংহের পদাবলীর পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত প্রকাশনা এই সময়েই (১৯৩০)।

২য় মহাযুদ্ধে আর্যসভ্যতার অহংকার, জাত্যাভিমানের ডালি সমর্পণ করে হিটলারের হাতে; অসভ্য জাতিকে চাবুক মেরে সভ্য করার দায়িত্ব নেয় ফ্যাসিবাদ। তখন রবীন্দ্রনাথ বোঝেন তাঁর কাব্যের নিভৃত শান্তি-নিবেদন-সমর্পণের পালা শেষ। সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে লেখেন আফ্রিকা (১৯৩৫) যে কবিতার কোনো পূর্বগামিতা নেই তার ৭০/৭১ বছরের কাব্যসাধনায়। অথচ এ কবিতায় তিনি আমাদের 'গুরু' বা 'নেতা'র পদটিই গ্রহণ করলেন। মাঘোৎসবের বেদী থেকে যার আধ্যাত্মিক চৈতন্যের বিকাশ, ক্রমশ তিনি চলে এলেন পত্রপুট, সেঁজুতি, সানাই, নবজাতক, রোগশয্যা, আরোগ্য, জন্মদিনের পর্বে।

এই পর্বে তিনি ছবি আঁকতে শুরু করলেন। শান্ত সুন্দর ভারতীয় চিত্রকলা নয়, প্রথাবিরোধী এক Devonic Passion তাঁর ছবিতে ধরা দিল। বাইরের প্রশান্তির অন্তরালে ভিতরে যে রক্তক্ষরণ, যন্ত্রণা, ভাঙচুর তাঁকে তিলে তিলে ক্ষয় করছিল, ছবির সেই দুর্বোধ্য, দুর্মদ, প্রচণ্ড, উগ্র ও অদ্ভুত form-এ রঙের তীব্রতায় ধরা পড়ল। তাঁর তৎকালীন চিত্তের আবেগ এই Language of silence এ রূপ নিল। এক ধরনের মানসিক অস্থিরতা তাঁকে নতুন উদ্‌ভাবন ও সৃজনে ব্যাপৃত করেছিল, লিখলেন ত্রয়ী নৃত্যনাট্য। সঞ্চয়িতা-কাব্যসংকলন, গীতিবিতান (পরে গীতবিতান) সংগীত সংকলন, বাংলার কাব্যপরিচয়-

আধুনিক বাংলা কাব্য সংকলন ইত্যাদি প্রকাশ করেন। আবার সমকালীন গান্ধী-প্রবর্তিত হরিজন আন্দোলনের ছায়াও ধরা রইল চণ্ডালিকায়।

নিখিলচিত্তের রক্তপাত ও যন্ত্রণার উপর তাঁর কবিতা দাঁড়ালো, পুনশ্চ থেকে শেষ লেখা দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগের প্রতিনিধি। আহত, রক্তাক্ত, বিগত বিশ শতক তাঁর হাত থেকে Narrative কবিতা কেড়ে নিয়ে জন্ম দিল গদ্যকাব্যের। শুধু গঠনশৈলী নয়, বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গিও হলো নতুন— নিরাভরণ, নিরলংকার। চরম আত্মপ্রত্যয়ের দম্ভ থেকে পথ খোঁজা, পথ হারানো, পাথরে মাথা ঠোকা, কবি এসে দাঁড়ালেন সহজ সরাসরি সাদাসিধে অথচ দৃঢ় কঠিন গদ্যকবিতার স্তরে। সমস্ত সার্থকতা, ব্যর্থতা, জটিল চরিতার্থতা নিয়ে জীবনের শেষে এক নতুন আধুনিক রবীন্দ্রনাথ দেখা দিলেন। তিনি যেখানে শেষ করলেন, চল্লিশের দশকে আমরা সেখান থেকেই শুরু করলাম।

একাঙ্ক নাটক : বিবর্তনধারা, রূপ, রীতি ও আঙ্গিক

অজিতকুমার ঘোষ

১. একাঙ্ক নাটকের বৃত্ত অথবা বস্তুর মধ্যে কয়েকটি স্তর থাকে। স্তরগুলি এক একটি অঙ্কের দ্বারা চিহ্নিত হয়। অবিচ্ছিন্ন ঘটনাধারা সমান বেগে চলতে পারে না। তাকে মাঝে মাঝে থামতে হয়। এই থামার স্থানেই একটি অঙ্কের সমাপ্তি ঘটে। সাময়িক থামা মানে নতুন করে চলার বেগ সঞ্চয় করা।

২. নাট্যশাস্ত্রে অঙ্কের সংজ্ঞা নির্দেশ ক'রে বলা হয়েছে— 'নানাবস্থোপেতঃ কার্যস্ত্বঙ্কোঽবিকৃষ্টস্তু' — নানা অবস্থাযুক্ত এবং নাতিদীর্ঘ হবে। ভরত আরো বলেছেন, 'একদিবসপ্রবৃত্তঃ কার্যস্ত্বঙ্কো'— অঙ্ক একদিনে নিষ্পাদ্য বৃত্তান্তযুক্ত হবে। নাটকের অন্তর্গত একটি অঙ্ক থেকে পরবর্তী একাঙ্ক নাটকের আভাস পাওয়া যায়। একটি অঙ্কে যে বহু ঘটনা থাকবে না সে-কথাও ভরত বলেছেন।

৩. দশরূপকের মধ্যে পাঁচটিই হলো একাঙ্ক নাটক। যথা, ব্যায়োগ, প্রহসন, ভাণ, বীথী ও উৎসৃষ্টিকাঙ্ক। আধুনিক একাঙ্ক নাটকের ন্যায় সংস্কৃত একাঙ্ক নাটকগুলিতেও আয়তনের স্বল্পতা, চরিত্রসংখ্যার স্বল্পতা ও ঘটনার স্বল্পতা লক্ষ করা যায়। ব্যায়োগের ঘটনা একদিনে নিষ্পাদ্য। প্রহসনে প্রচলিত বাস্তব ঘটনা থাকে এবং ভাণে থাকে একটি একসংলাপী চরিত্র।

৪. ভরত শুধু দশরূপকের কথা বলেছেন, কিন্তু উপরূপকগুলির কথা বলেননি, কারণ উপরূপকগুলির উদ্ভব হয়েছিল অনেক পরে— দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। উপরূপকগুলি নৃত্যগীতবহুল একাঙ্ক নাটক। এগুলির মধ্যে অধিকতর খ্যাত হলো নাট্যরাসক। রাসক বিলাসিকা, হল্লীশ, ভাণিকা, উল্লাপ্য ইত্যাদি।

৫. সুনির্দিষ্ট মঞ্চে অভিনয়ের বহু আগে ভ্রাম্যমাণ নটের দল পথে পথে অনুকরণাত্মক নাটকের অভিনয় দেখিয়ে চলত। এ-সব গীতিনৃত্যবহুল কৌতুক রসাত্মক স্বল্পায়তন নাটকের মধ্যে একাঙ্ক নাটকের পূর্বাভাস ছিল। পাণিনি যে নটসূত্রম্-এর কথা বলেছেন তা থেকে বোঝা যায়, স্মরণাতীত কাল থেকে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভ্রাম্যমাণ নাটকের অভিনয় চলে এসেছিল। অ্যারিস্টটল নিজেও 'Poetics'-এ সোফ্রোন ও জেনারকাস -এর মাইম বা অনুকরণমূলক অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

৬. গ্রীক নাটকে কোনো অঙ্কবিভাগ নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে ক্রিয়ার বিরতি ঘটেছে কোরাস সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। সিমান্ডারের নব কমেডির মধ্যে প্রথম অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ দেখতে পাই। হোরেস সর্বপ্রথম পঞ্চাঙ্ক নাটকের প্রয়োজন বোধ করেন। তাঁর পরে সেনেকা পঞ্চাঙ্ক বিভাগ প্রবর্তন করেন। ইবসেন পঞ্চাঙ্ক বিভাগের রীতি কমিয়ে এনে চার অঙ্ক অথবা তিন অঙ্ক বিভাগের রীতি প্রবর্তন করেন। পরে তিন অঙ্ক সাধারণ রীতি হয় এবং দুই অঙ্ক অথবা মাঝে বিরতি দিয়ে অথবা বিরতিহীন, অঙ্কহীন নাটক লেখা হয়েছে।

৭. গ্রীক নাটকের মধ্যে ত্রয়ী ঐক্যের কথা বলা হয়েছে। অ্যারিস্টটল ক্রিয়া-ঐক্য, সময়-ঐক্যের কথা বলেছেন। স্থান-ঐক্যের কথা বলেন নি। কিন্তু নাট্যক্রিয়া একই স্থানে সংঘটিত হতো বলে স্থান-ঐক্যের কথা পরে এসে যায়। অবশ্য কাহিনীবিস্তার, বিবর্তন ও স্তরবৈচিত্র্যের জন্য গ্রীক নাটককে একাঙ্ক নাটকের পর্যায়ে ফেলা যায় না, কিন্তু ত্রি-ঐক্যের মধ্যে পরবর্তী একাঙ্ক নাটকের আভাস পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে স্বল্পায়তন গীতিনৃত্যবহুল, কৌতুকরসাত্মক নাটক লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলিকে হ্রস্বাকার নাটক (short play) বলা যেতে পারে, কিন্তু খাঁটি একাঙ্ক নাটক বলা চলে না। একাঙ্ক নাটকের জন্য দৃঢ়বদ্ধ, সুবলয়িত, সুসংহত গঠন এবং ঘটনা ও ভাবের অখণ্ডতা প্রয়োজন। এই ঐক্য, অখণ্ডতা, অবিভাজ্যতা এবং স্বল্প পরিমিতির মধ্যে তীব্র বেগসঞ্চার করবার শিল্পসচেতনতা থেকেই একাঙ্ক নাটক সৃষ্টি হয়।

৮. একাঙ্ক নাটকের জন্ম ও ছোটোগল্পের জন্ম একই সময়ে ঘটেছে, অর্থাৎ উনিশ শতকে। একই জীবনচেতনা, শিল্পবোধ ও প্রকাশের তাগিদ থেকে ক্ষুদ্র আকারের মধ্যে পূর্ণস্বরূপকে উপলব্ধির চেষ্টা, বিন্দুর মধ্য দিয়ে সিন্ধু দর্শন, ক্ষণিকের মধ্য দিয়ে চিরন্তনের আভাস, চলমানের মধ্য দিয়ে ধ্রুবকে পাওয়ার প্রয়াস। প্রথমে স্থূল ভাবে আত্মপ্রকাশ, তারপর ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাধর্মী শিল্প রূপে তার পরিমার্জিত পরিণতি। Curtain raiser অথবা মূল নাটকের আরম্ভের আগে কোনো হাল্কা, স্বল্পায়তন নাটক রূপে উপস্থাপিত করা। এই ধরনের নাটক মূল নাটকের শেষেও সংযোজিত হতো, তাকে বলা হত After piece অথবা শেষের নাটিকা।

৯. বর্তমান যুগের একাঙ্ক নাটকের প্রসারের কারণ, মানুষের ব্যস্ততা বাড়ছে, সময় কমছে। অথচ নাট্যরস আস্বাদনের মৌলিক তৃষ্ণা তার মধ্যে বর্তমান । এমন নাটক চাই যা স্বল্প সময়ের হলেও দীর্ঘ সময়ের ভাবনা জাগাতে পারে। যার মধ্যে দিয়ে সহজে ও প্রত্যক্ষভাবে দর্শকের কাছে পৌছান যায়। একাঙ্ক নাটকের অভিনয় সহজসাধ্য ও কম ব্যয়সাপেক্ষ। প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এ-নাটকের বহুল অভিনয় ও ব্যাপক প্রচার সম্ভব।

১০. অঙ্ক নিয়ে প্রথমেই বিচার করা দরকার। একটির বেশি অঙ্ক থাকলে কি তাকে একাঙ্ক নাটক বলা চলে? একটি অঙ্কের অন্তর্গত কয়েকটি দৃশ্য থাকলে তাকে কি একাঙ্ক বলা চলে? The Monkey's Paw -র মধ্যে তিনটি দৃশ্য। Waiting for Lefty -র মধ্যে ছয়টি দৃশ্যে বিভিন্ন চরিত্রের অবতারণা। অনেক ক্ষেত্রে আবার আলো কমিয়ে এবং কিছুক্ষণের বিরতি দিয়ে একাধিক দৃশ্যের আভাস দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য এ-ধরনের নাটক একাঙ্ক সংকলন-গ্রন্থে স্থান পেলেও এদের কখনো নিখুঁত একাঙ্ক বলা যেতে পারে না। নিখুঁত একাঙ্ক নাটক বলতে বোঝায় একটি অঙ্কে সমাপ্ত, একটি অখণ্ড ক্রিয়াযুক্ত, একই স্থানে উপস্থাপিত এবং একটি অবিচ্ছিন্ন সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাটক। The Rising of the Moon, Hewers of Coal, Bishop's Candlesticks , শিককাবাব, বিদ্যুৎপর্ণা, দেবী, রাজপুরী, কবয়ঃ এগুলি হলো নিখুঁত শিল্পসম্মত একাঙ্ক নাটক।

১১. একাঙ্ক নাটক স্বল্পায়তন হলেও এর ক্রিয়ার মধ্যে অ্যারিস্টটল কথিত দুটি স্তর- জটিলতা (complication) ও জটিলতামোচন (denonement)- এর মধ্যে দেখাতে হবে। অর্থাৎ স্বল্প পরিসরের মধ্যে তরান্বিত গতি, উত্থানপতন, স্তরের বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য দেখানো দরকার। এ-সব দেখাতে গিয়ে নাটকীয় উপাদানগুলি, অর্থাৎ নাট্যোৎকণ্ঠা, দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্য, আকস্মিকতা ইত্যাদি সুকৌশলে প্রয়োগ করতে হবে। প্রচন্ড নাট্যোৎকণ্ঠার আভাস (শিককাবাব, পৃ-৪৬২)। প্রচন্ড গতিময় উত্তেজনা (বিদ্যুৎপর্ণা, ৬৪)। আকস্মিকভাবে পরিস্থিতির বৈপরীত্য (নবসংস্করণ, ৭৯)।

১২. নাটকের গঠনের মধ্যে তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমত ঘটনাকে ক্রমগতিশীল করে একটি চূড়ান্ত উত্তেজনাজনক স্তরে নিয়ে যাওয়া। যেমন Night at an Inn, The Monkey's paw, রথের রশি (২৬) ইত্যাদি নাটকে। দ্বিতীয়ত প্রথম স্তরের বিপরীত ঘটনা ঘটে শেষ স্তরে। Miss Julie ও The Rising of The Moon -এ জুলি ও সার্জেন্টের চরিত্র বিপরীত অবস্থায় পরিণতি লাভ করেছে। রাজপুরী নাটকে এই বিপরীত অবস্থাপ্রাপ্তি দেখানো হয়েছে। তৃতীয়ত প্রথম স্তরে যে অবস্থা শেষ স্তরেও তা, শুধু মধ্য স্তরে সঙ্কট। Hewers of Coal, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেঘের আড়ালে সূর্য, বনফুলের নবসংস্করণ।

১৩. সংলাপ—নাট্যগুণ ও কাব্যগুণের সমাবেশেই সংলাপ বেগবান ও কাব্যরসাশ্রিত হয়। নাট্যগুণের প্রকাশ ঘটে ছোটো ছোটো বিরুদ্ধধর্মী বাক্যাংশের প্রয়োগে, স্ববিরোধিতায়, শব্দের পুনরাবৃত্তিতে, পরস্পরবিরোধী শব্দের ব্যবহারে, ক্ষিপ্রগামী ও দ্যুতিময় শব্দের প্রয়োগে, অসমাপ্ত বাক্যের ব্যবহারে; বিদ্যুৎপর্ণা (৬৩), রাজপুরী(১০৬)। কাব্যগুণের প্রকাশ হয় অলঙ্কৃত, কবিত্বময় শব্দ ও বাক্যের ব্যবহারে (বিদ্যুৎপর্ণা-৬৬)।

১৪. আয়তন—ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে এক ঘন্টার মধ্যে নাটকের শেষ হওয়া উচিত। চরিত্রসংখ্যা সাধারণত চার পাঁচের বেশি হওয়া উচিত নয়। বনফুলের গল্পের মতো মাত্র কয়েক লাইনের ইঙ্গিতধর্মী একাঙ্ক মন্মথ রায় লিখেছেন।

১৫. একাঙ্কের শ্রেণী বৈচিত্র্য—কাব্যছন্দে লিখিত একাঙ্ক রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যগুলি, কবয়ঃ। কাব্যময় ছন্দে লেখা একাঙ্ক — রথের রশি। গদ্য সংলাপাশ্রিত একাঙ্ক। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে — পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক। ফর্ম অথবা নাট্যরীতির দিক দিয়ে — বাস্তবধর্মী, প্রকাশবাদী রীতি, রূপক ও সাঙ্কেতিক রীতি, অ্যাবসার্ড রীতি, ব্রেখটীয় রীতি, মিশ্ররীতি। ট্র্যাজেডি, কমেডি, ফার্স বা নিছক কৌতুকধর্মী।

বাংলা সাহিত্য : প্রভাব ও পরিক্রমা

অনিল আচার্য

সাহিত্য, বিশ্বের সব দেশেই, সমাজের দর্পণ বলে বিবেচিত। ভাষা হলো সাহিত্যের প্রকাশ মাধ্যম। সাহিত্যের সূত্রপাত লেখ্য ভাষায় নয়, কথ্য ভাষায়। লেখ্য ভাষা হিসেবে বাংলা তুলনামূলকভাবে অনেক নবীন।

কী ভাবে কথ্য ভাষা দীর্ঘপরিক্রমার পথে লেখ্য ভাষায় রূপান্তরিত হয়, সমাজ ও সংস্কৃতির

কোন্ বিচিত্র ধারাপথে সাহিত্য হয়ে বিকশিত হয়, কীভাবে সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সাহিত্যের জন্ম হয়, মানবেতিহাসে সে এক অন্য মহাভারত।

মধ্যযুগ থেকে, পড়চা ও দলিলের সোপান বেয়ে শ্রীরামপুর কলেজ তথা উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও ফোর্ট উইলিয়াম ঘুরে যে লিখিত সাহিত্যের অগ্রগমন কীভাবে তার বিপরীতে অন্য ভাষা ও অন্য সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। নিঃশব্দতার সংস্কৃতি নব্যমধ্যবিত্তের প্রয়াসে ও প্রযত্নে নব নব রূপ গ্রহণ করে, তার তাত্ত্বিক ও বস্তুগত দিকটির আলোচনা কেন প্রয়োজন, বাংলা সংস্কৃতিতে 'নবজাগরণ' শব্দটি প্রকৃত অর্থে, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং বাংলার সামাজিক-আর্থনীতিক ক্ষেত্রে কোন্ দ্যোতনা ব্যাক্ত করে, সে-কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য।

বাংলা সাহিত্যে প্রেম ও নরনারীর সম্পর্ক এবং তার বিপরীতে নিম্নবর্গ এবং অন্যান্য বর্গের অবস্থান বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারায় অবশ্যই একটি আলোচনার বিষয়।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক , ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশোত্তর পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মতবাদের প্রেক্ষাপটে সাহিত্য এক শতক থেকে অন্য শতকে, এক দশক থেকে অন্য দশকে কীভাবে নতুন নতুন রূপ ও মাত্রা সঞ্চয় করেছে সেটিও এখানে বিশেষভাবে আলোচ্য।

সাহিত্যের ক্রমান্বয়ে নাগরিক মধ্যবিত্তায়ন, ভোগবাদ এবং ইংরেজি প্রভাবে চিন্তা-ভাবনা এবং ক্রমশ একমাত্রিকতার অনুসরণও বিবেচ্য।

একই সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, বিশ্বমুখীনতা এবং বিশ্ববিমুখতা বা জীর্ণপুরাতনের প্রতি অপার প্রেম এবং মুগ্ধতা বাংলা সাহিত্যে এবং চিন্তনে এক গতিহীন ও বিকাশবিরোধী প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে।

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা, 'বিজ্ঞাপনবিমোহিত মন' এবং অন্যদিকে বিশ্বায়ণ ও ক্রমাগত নগরায়ণে তার অবস্থান আজ বিশেষভাবে চিন্তার ও ভাবনার অবকাশ রাখে।

এটি এই আলোচনার একটি সামান্য কাঠামো এবং এরই বিস্তৃত আলোচনা আজকের বিষয়।

রবীন্দ্রমানস ও রক্তকরবীর নন্দিনী

অরুণা সরকার

'যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিক ভাবে দেখাই সঙ্গত ।' (কালান্তর: রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত)

এই প্রত্যয়ে দাঁড়িয়েই রক্তকরবী নাটকের নারীচরিত্র নন্দিনী প্রসঙ্গে দু'একটি কথা আলোচনা করছি । হয়তো একালের বিচারে আমরা ততখানি তৃপ্ত হতে পারবো না যতখানি নাটকের মতো গণমাধ্যমে আশা করি । বক্তব্য বিশ্লেষণের আগে শুধু এটুকুই বলা চলে যে, একটি বস্তুনিষ্ঠ বা objective Art form কে নিয়ে কাজ করতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিনিষ্ঠ বা Subjective হয়ে পড়েছেন । সেক্ষেত্রে আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা না মেটার সম্ভাবনা কিছু মাত্রায় থেকেই যায় ।

যাই হোক, স্বদেশ ও স্বকাল এবং বিশ্বচেতনায় তিনি যখন সম্পূর্ণ ঋদ্ধ সেই সমসাময়িক কালেরই একটি রচনা তাঁর 'রক্তকরবী' (১৯২৬), নাটক । 'মুক্তধারা' (১৯২২) -য় দেখেছি যন্ত্রের বিরুদ্ধে আর 'রক্তকরবী'তে পুঞ্জীভূত ধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা

বাঞ্ছনীয় যে, আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক অর্থ বা ধনোৎপাদন ও তার বন্ধনের সুষম ব্যবস্থার মাধ্যমে আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের মুক্তির যে দিক নির্ণয় করা হয় — রবীন্দ্রমন তদানুসারী নয় । অর্থবাদের বিরুদ্ধে তিনি যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন তার রূপ স্বতন্ত্র । সোনার খনি থেকে মানুষের প্রাণকে মাটির উপরতলার সোনার আঁচল বিছানো ফসলের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন — যেখানে প্রাণের 'রূপের নৃত্য', যেখানে 'প্রেমের লীলা' । আর তার প্রকাশ যার মধ্য দিয়ে ঘটেছে, সে এক নারী-নন্দিনী।

'রক্তকরবী' নাটক রূপক, সাঙ্কেতিক, তত্ত্ব প্রধান কিংবা পালা যাই হোক না কেন, এরকম নারী oriented নাটক আর কোনোটিকেই বলা চলে না । নন্দিনীর স্পর্শে গোটা যক্ষপুরীতে প্রাণের হাওয়া লেগেছে । যে চন্দ্রার আশঙ্কা বিশুপাগলকে 'নন্দিনীতে পেয়েছে' সে নিজেও কি বিচলিত হয়নি ? নইলে সর্দারের কাছে বাড়ি যাবার ছুটি চাইবে কেন ? সে তার রুদ্ধ প্রাণের হাঁপিয়ে ওঠার জন্যেই । স্বয়ং রাজাই তো এই প্রাণের প্রত্যাশী । প্রকান্ড মরুভূমির তৃষ্ণা ও দাহ নিয়ে তার তপ্ত প্রাণের রিক্ততা ও ক্লান্তির কথা জানিয়ে নন্দিনীর মতো ছোট্টো ঘাসের দিকে অসহায়ের মতো হাত বাড়িয়েছে ।

কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্ব সংঘাতই এই নাটকের মূল উপজীব্য । রঞ্জন আর রাজা সেই সংঘাতের প্রক্রিয়ার দুই দিক । রঞ্জন স্বয়ং প্রাণ — যা অপ্রতিরোধ্য । পুরুষের যৌবন ও শক্তির প্রকাশ এই প্রাণের রঞ্জিত রূপের মধ্যে । নন্দিনীও এই প্রাণেরই নারীমূর্তি । হ্লাদিনী ও আনন্দ-সত্তা । প্রাণের দৃষ্টিগোচর মৃত্যু ঘটলেও আনন্দ অমর । নন্দিনী তার প্রেম ও আনন্দ সত্তা নিয়ে নাটকে পুরুষের প্রেরণা স্বরূপিণী হিসেবে কাজ করেছে। রক্তকরবীর প্রতীক, রঞ্জনের লাল রঙের (প্রাণের তীব্রতা বা অপ্রতিরোধ্য রূপ্য) সঙ্গে তুলনীয় । রাজাকে নন্দিনী তাই রক্তকরবীর মঞ্জুরী মশালে চতুর্দিক থেকে আলোকিত করতে এসেছে — অপ্রতিরোধ্য প্রাণের চূড়ায় পরিয়ে দিতে এসেছে বিজয়কেতন নীলকণ্ঠ পাখির পালক । রঞ্জন তো মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় হয়েছে — যা মৃত্যু সম্পর্কিত চিরন্তন রবীন্দ্র-চেতনা। এবং এই কারণেই রাজা তার দম্ভের সীমাকে বুঝেছে, নিজের সঙ্গে নিজের সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বন্দীশালার দরজা ভাঙার লড়াইয়ে পথে নেমেছে — ভাঙা ধ্বজাই তার শেষ কীর্তি ।

নাটকের পরিসমাপ্তিতে রঞ্জনের দেহ প্রাণের মিছিলের দ্বারোদঘাটন করেছে, নন্দিনী প্রাণ-মিছিলের প্রথম মুখ — আর সবাই শরিক । রাজা নিজেও যৌবন হত্যার অনুশোচনাদগ্ধ হয়ে সব ছেড়ে পথে । এই মিছিলকে মুক্তি-মিছিল বললে মুক্তির আঙিনায় শুনি পৌষের গান, ধূলার আঁচলে পরিণতির ফসল — এ তো আগামী দিনের বীজ ।

নন্দিনীতে আছে কিছু প্রবর্তনা আর বাকিটা আভাস । ভাঙার কাজে, অবস্থার পরিবর্তনের কাজে এই প্রথম নারীর প্রধান ভূমিকা গ্রহণের প্রসঙ্গ এল । 'মুক্তধারা'য় পুরুষের ব্যক্তিক আত্মোৎসর্গেই পালা শেষ হয়েছিল, সচেতন জনশক্তির প্রতীক্ষমানতার আভাসও ছিল । 'রক্তকরবী'তে রঞ্জনের সংকটে জনশক্তি জাগছিল, কিন্তু তারই আত্মঘাতি ঘটানো হলো । আরব্ধ কর্মের দায়িত্ব বর্তালো নারীর উপর । ব্যাপারটা অন্যভাবে ঘটতে পারতো । নন্দিনী সর্দারতন্ত্রের হাতে নিগৃহিতা হওয়ার পর রঞ্জনের আত্মপ্রকাশ ঘটানো যেত পূর্ণ উদ্যমে — প্রকাশ্যে । আসলে 'রক্তকরবী'তে ততটা আমূল পরিবর্তনের কথা নেই, যতটা ভাবা হয় । রাজা, যিনি সরকারী ভাবেই শোষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন, তারই বোধদয় দিয়ে নাটক শেষ । সর্দারতন্ত্র তো একটা স্বনির্ভর ব্যবস্থা নয় । বিভিন্ন শাসক শ্রেণীর কর্মসূচীর রূপায়ক এরা । কোনো কোনো সময়ে এদের গোষ্ঠী-সংহতি আকাশ ছোঁয়া হয় ঠিকই, তবু ইতিহাসের মুখ্য চালিকা এরা নয় । এরা তো নিছক paid Agents। রাজা নন্দিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সর্দারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে চললেন, আর রাজার উদ্বোধিত পৌরুষে রঞ্জনের প্রতিবিম্ব দেখলো নন্দিনী । তাই বিপ্লবী লড়াই কোনোমতেই

রক্তকরবীর কথাবস্তু নয় । তবু একটা রাজনৈতিক কর্মোদ্যমে নন্দিনীই প্রথম সামিল হওয়া নারীশক্তি । রঞ্জনের যথার্থ সহযোগিনী সে । 'রক্তকরবী'তে সচেতন জনশক্তিকে পরিকল্পনা মতো মেলানো হয়নি । আরব্ধ কর্মকে টেনে নিয়ে গিয়ে আগামী দিনের পরিণততর লড়াই-এর পথনির্দেশ করেছে নন্দিনী । রাজার বোধোদয় এ নাটকের লক্ষ্য, তাই চিত্ত পরিবর্তনে শক্তিময়ী নারীর গঠনশক্তিকে কাজে লাগানো হয়েছে । যে শক্তি অগ্ন্যুৎপাত ঘটাতে সক্ষম তাকে স্তিমিত করে শয়ন ঘরের প্রদীপ সাজানো-সমাজেরই চিরন্তন (Traditional) প্রক্রিয়া । রবীন্দ্রনাথও নন্দিনীর বিপ্লবী-শক্তিকে পুরোটা না চেয়ে তার কল্যাণী-শক্তির বন্দনা গেয়েছেন ।

পরিসমাপ্তিতে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ বাঁধা ঘাটের বাঁধিবোল ছেড়ে যাত্রা করে তত্ত্বাশ্রয়ের একটা স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিত বেছে নিয়েছেন । সেখানে শিল্পের শর্তে শিল্পকে গ্রহণ করলে সূত্র মেলানো সম্ভব । কিন্তু নাটক তো জীবন ও বাস্তব উপজীব্য শিল্পরূপ । তাই সেখানে মানুষের জীবন ও সমাজের বাস্তব রূপায়ণই প্রত্যাশিত । তত্ত্বাশ্রয়িতার কারণে রবীন্দ্রনাথ সে জায়গা থেকে সরে এসেছেন ।

রবীন্দ্র-চিন্তাধর্মের প্রসঙ্গ এখানে অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে । যদিও রবীন্দ্রনাথ সমকালের সঙ্গে যোগসূত্র রেখেই নারীধর্মের একটা পরিবর্তিত মনে পৌঁছাতে চেয়েছেন, তৎসত্ত্বেও বলা চলে, নারীধর্মের প্রশ্নে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মূল প্রত্যয়ের ভিত্তিটি কখনোই নড়ে যায়নি (এমন কি নাটকের মতো গণ মাধ্যমেও নয়) । নারীর প্রকৃত ধর্ম সম্পর্কে যে রূপটি কবির প্রিয় ছিল, আলোচিত নাটকের বক্তব্য বোধকরি তার সঙ্গে স্ব-বিরোধী অবস্থানে রয়েছে । নন্দিনীর চরিত্র-ভূমিকার গ্রাহ্যতা লুকিয়ে আছে তার প্রাণচঞ্চল সাবেকীয়ানায় ।

সমকাল ও রবীন্দ্র-নাটক

অশোক মুখোপাধ্যায়

(১) নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ সন্ধান

রচনাশৈলীতে , বিষয়ে, দর্শনে নব-নব দিগন্তের আভাস রবীন্দ্রনাটকে। বহুরকমের নাটক লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ— তার মধ্যে কোনো একটি ধরনের সঙ্গে তাঁকে চিহ্নিত করে ফেললে ভুল হবে। তাতে করে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের জটিল সামগ্রিকতা বুঝতে অসুবিধা হবে। এই ভুলটা দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছেও। শুধুমাত্র প্রতীকী বা সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ধরা আছে— এই ধারণা রবীন্দ্র-নাট্য বিষয় অসম্পূর্ণ বোধের এক দীর্ঘায়ত ঘরানা তৈরি করেছে। তার থেকে মুক্ত হয়ে খোলা মনে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের পরিচয় নতুন করে খুঁজে নিতে হবে। এ শুধু নাটক-পাঠকের দায় নয়, এ দায়িত্ব সমকালের বাংলা নাট্যআন্দোলনেরও।

(২) নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা

মূলত বিসর্জন, ডাকঘর, রক্তকরবী— এই তিনটি নাটক ঘিরে আলোচনা আবর্তিত হয়। দেখা যায়, এদের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে এমন বহু ভাবনা , দ্বন্দ্ব , সমস্যা যা এই মুহূর্তেও প্রবল প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আমাদের দরজায় রোজ কড়া নাড়ছে। ধর্ম-অনুশাসন-মানুষ (বিসর্জন), বন্ধুত্ব-বিচ্ছিন্নতা-মৃত্যু-মুক্তি-মানুষ (ডাকঘর), শোষণ-শাসন-উৎপাদন পদ্ধতি-যৌবন-জীবন-মানুষ (রক্তকরবী), এই রকম আরো

বহু অনুষঙ্গে ধনী এই নাটক তিনটি একটু অন্যরকম করে পড়লেই এর মধ্যে শুধু সমকাল নয়, আগামী দিনের বেদনাও যেন ফুটে ওঠে। মনস্ক প্রয়োজনাতে এই আধুনিকতার আবিষ্কার সমকালের থিয়েটারের জরুরী কিন্তু এখনো অবহেলিত একটি কাজ।

'বীরাঙ্গনা'র নায়কেরা

অদীপ ঘোষ

বীরাঙ্গনার পত্রলেখিকা নায়িকারা যে নবজাগরণের চেতনার ফসল— একথা বহু-ব্যবহারে আজ ক্লিশে হয়ে গেছে। তাই এই সত্যের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্যচর্চায় পুরুষ চরিত্রগুলি সেই নবজাগৃতির আলোক স্পর্শ থেকে বঞ্চিত। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র রাবণ ও অংশত ইন্দ্রজিৎ। এর কারণ হয়তো বা তাঁর সমকালীন সমাজে নারীদের স্থান ও কবির ব্যক্তিগত জীবনে নিজের মায়ের প্রতি গভীর সমবেদনা সহানুভূতি। ঘটনাচক্রে মাইকেল-সৃষ্ট নারীদের দৃষ্টিতে পুরুষেরা অধিকাংশ সময়েই অভিযুক্ত কলঙ্কিত। নবজাগ্রত চেতনা যেন তাদের অমাবস্যার অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। এমন কি ব্যতিক্রমী রাবণও নিজ মহিষীদের কাছে সমালোচিত, অভিযুক্ত এবং বিব্রত। বলাবাহুল্য 'বীরাঙ্গনা'য় প্রত্যক্ষভাবে কোনো পুরুষচরিত্র নেই। নায়িকাদের লেখা পত্রিকাগুলির উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে তাদের যে পরিচিতি স্পষ্ট -অস্পষ্টভাবে মেলে তার মধ্য দিয়ে তাদের চরিত্রের একটি রূপরেখা ফুটে উঠেছে।

প্রথম পত্রিকা শকুন্তলার। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি-রাজা দুষ্মন্ত। প্রথম থেকেই শকুন্তলা তাঁকে বিশেষণ-যোগে সম্বোধন করেছেন। এই সব সম্বোধনের মধ্য দিয়ে দুষ্মন্তের ঐশ্বর্যময় বীর্যবান রাজার চিত্রটি নিরপেক্ষভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু শকুন্তলার একটি অভিযোগ মারাত্মকভাবে দুষ্মন্ত চরিত্রকে কলঙ্কিত করে, যখন তিনি লেখেন, 'গন্ধর্ব বিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে' অর্থাৎ রাজা ছলনাকারী।

তবে দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার এই অভিযোগ পত্রিকায় উল্লিখিত থাকলেও তা-ই সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। কারণ, দুষ্মন্তের নীরবতা কিংবা উপেক্ষা-ছলনা যাই হোক না কেন, সে ব্যাপারে শকুন্তলা নিজেও নিঃসংশয়িতা হতে পারেন নি।

দ্বিতীয় পত্রিকা তারার। এখানে বৃহস্পতি-শিষ্য সোম একজন আদর্শ জ্ঞানপিপাসু ছাত্র। তারার উল্লেখের মধ্য দিয়েই তাঁর আত্মসংযমী চরিত্রটিও আভাসিত। এখানে কোনো কলঙ্কের চিহ্ন সোম চরিত্রকে স্পর্শ করে নি।

'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী'র পত্রিকায় দ্বারকানাথ চরিত্রের পরিচিত ঐশী মহিমা ছাড়া আর কোনো নবতর বৈশিষ্ট্য নেই। অবশ্য প্রেমিক রূপেও তিনি আমাদের কাছে এখানে প্রতিভাত।

তবে 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী'র পত্রিকায় দশরথের একটি ভিন্নতর চরিত্র পাওয়া যায়। যা আমাদের পরিচিত দশরথের চরিত্রের অনুগামী নয়। বাল্মীকি কথিত 'বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ', 'পরমধার্মিক', 'দূরদর্শী', 'যজ্ঞশীল', 'রাজর্ষি', 'জিতেন্দ্রিয়' দশরথ এখানে সম্পূর্ণত অনুপস্থিত। এখানে দশরথ সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে প্রাপ্ত তথ্য হলো তিনি ইন্দ্রিয় পরবশ, ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থের জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা করেন। আবার প্রয়োজনে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে অসমর্থও হন। এ পত্রিকায় বর্ণিত তাঁর ক্রিয়া-কর্মে একজন সত্যভ্রষ্ট ,ইন্দ্রিয় পরায়ণ রাজার চিত্রই স্পষ্ট।

বীরাঙ্গনায় লক্ষ্মণ চরিত্র কিন্তু শূর্পনখার লেখনীতে এক উন্নততর মহিমা লাভ করেছে। তাঁর মূর্তি এখানে বিভূতি-ভূষিত বৈশ্বানর-সদৃশ। নবযৌবনের প্রতি তিনি যে বিমুখ তথা সংযমী পুরুষ এ তথ্য শূর্পনখা পরোক্ষে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া তিনি যে যথেষ্ট দয়ালু একথাও নায়িকা জানাতে বিস্মৃত হন নি। 'দয়ার সাগর' উল্লেখের মধ্য দিয়ে এই দাশরথি চরিত্রটি ইতিবাচকতা লাভ করেছে।

দ্রৌপদীর পত্রিকায় অর্জুনের প্রেমে দ্রৌপদীর সংশয় তৃতীয় পান্ডবের প্রেমিক সত্তাকে বিবর্ণ করেছে, বৈজয়ন্তধামের বিপুল বৈভবে সাময়িক কালযাপনের ফলে তিনি দ্রৌপদীকে বিস্মৃত হতে পারেন - এই সংশয় অর্জুনকে ভোগবিলাসী রূপেই ইঙ্গিত করে। অর্জুনের প্রেমের গভীরতা ও বিশ্বস্ততার কোনো পরিচয় যে তখনও পর্যন্ত দ্রৌপদী পান নি তা একই সঙ্গে প্রমাণিত। তবে অর্জুনের বীরত্ব এখানে বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয় নি। অর্জুন শুধু বীর-ই নন, 'বীরোত্তম'— এই তথ্য দ্রৌপদী-ই আমাদের জানিয়েছেন।

ভানুমতীর পত্রিকায় উল্লিখিত নানা ঘটনা-বর্ণনার মধ্য দিয়ে দুর্যোধনের চরিত্রের যে রূপরেখা মেলে তা আদৌ ইতিবাচক নয়। 'পাপ-অক্ষবিদ্যা-শিক্ষা' কিংবা চিত্রসেনের হাতে বন্দী অবস্থা থেকে উদ্ধারের ইতিহাস দুর্যোধন চরিত্রকে অকৃতজ্ঞ , কৃতঘ্ন, কপটাচারী রূপেই প্রতিষ্ঠা করে। লক্ষণীয় 'এমনি', 'কুরুকুলমণি' ইত্যাদি রাজ-সম্বোধন ছাড়া ভানুমতীর লেখনীতে কখনোই তাঁর স্বামীর উদ্দেশে মহৎগুণ-প্রকাশক কোনো বিশেষণ দেখা যায় না। একবার অবশ্য 'বিজ্ঞতম' বলে সম্বোধন আছে। কিন্তু সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই 'বিজ্ঞতম' সম্বোধনে রয়েছে এক সূক্ষ্ম 'Satirical approach', আর হয়তো বা যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য আপাত স্তুতি অর্থাৎ এই বিজ্ঞতাকে আমরা নিরপেক্ষ ভাবে দুর্যোধন চরিত্রে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারি না।

অষ্টম পত্রিকায় একজন নায়িকা যখন তাঁর নায়ককে কঠোর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে শক্তিহীন বলেন, তখন এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে জয়দ্রথ অন্তত সেই শ্রেণীর মহাবীর নন, যিনি নায়িকার মনে একটা illusion এর জগত তৈরি করতে পারেন। এই সত্য অধিকতর দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন স্ত্রী-দুঃশলা নিজ স্বামী জয়দ্রথকে সিংহ-কল্প অর্জুনের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে 'বনচরতুল্য' বলেছেন। এছাড়া কৌরবদের প্রতি তাঁর যে পক্ষপাত আছে তা-ও এই পত্রিকার থেকে স্পষ্ট হয়েছে। তবে পত্রিকার অন্তিমপর্বে পিতা জয়দ্রথের স্নেহময় মূর্তির একটা ক্ষণিক আভাস মেলে। যুদ্ধথেকে নিবৃত্ত করতে নিরুপায় ধৃতরাষ্ট্র-কন্যা পুত্র মণিভদ্রের দোহাই পাড়েন। পুত্রের প্রসঙ্গ এনে দুঃশলা জয়দ্রথের স্নেহময় পিতৃত্বের সম্ভাবনাই নিয়ে আসেন। বাঁচার অন্তিম প্রয়াস তো শ্রেষ্ঠ প্রয়াসই হয়।

জাহ্নবীর পত্রে শান্তনুর একটি নিষ্কলঙ্ক বিশ্বস্ত প্রেমিকের একটি অস্পষ্ট মূর্তি মেলে। অস্পষ্ট— কারণ পুত্র দেবব্রত-র অনন্যতা নিয়েই জাহ্নবী-লেখনী অধিকতর সবাক । তবে প্রেমের বিবাহে শান্তনু যে নিদারুণ আহত হবেন— এ সত্য এপত্র থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তাই জাহ্নবীর বর্ণনায় বারবার দেবব্রত-প্রসঙ্গ শান্তনুর সান্ত্বনা-স্বরূপ বলে মনে হয়। এবং এসব থেকে শান্তনুর এক রোম্যান্টিক প্রেমিক মূর্তিই তৈরি হয়ে ওঠে।

দশম পত্রিকায় পুরুরবার বিপন্ন-ত্রাতা, অনন্যবীর রূপেই আত্মপ্রকাশ । দুরন্ত কেলী দৈত্যের হাত থেকে উর্বশীকে রক্ষা করবার বর্ণনা এই সত্যকেই সমর্থন করে।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয়, উর্বশী একস্থানে লিখেছেন, '··· ও রূপ মাধুরী/ দেবী মানবীর বাঞ্ছা।' অর্থাৎ পুরুর বা মর্তের মানুষ হয়েও স্বর্গের দেবতাদেরই তুল্য, কখনও বা আরও কিছু বেশি। স্বর্গের উর্বশীর কাছে মর্তের আকর্ষণ যিনি বহু পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর চারিত্রিক মহিমা সম্বন্ধে কোনো সংশয় জাগে নি।

অন্তিম পত্রিকাটি জানার উদ্দিষ্ট— স্বামী ও রাজা নীলধ্বজ। নীলধ্বজের বীরত্ব নিয়ে এখানে কোনো সংশয় নেই। অর্থাৎ তাঁর বীরত্ব নিঃসংশয়িত। বিশেষত জনা যখন নীলধ্বজের কাছে প্রশ্ন রাখেন যে, পুত্রের মৃত্যুর প্রতিবিধানের জন্য নীলধ্বজ কি উদ্যত! তিনি কি উদ্যত 'নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে?' তখন একথা বুঝে নিতে পরিশ্রান্ত হতে হয় না যে নীলধ্বজ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ — অর্থাৎ যথেষ্ট শক্তিমান। তাঁর বীরদর্পের উল্লেখ এ পত্রে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। এছাড়া, জনার অভিযোগপত্রের থেকে ভক্ত নীলধ্বজের একটি আশ্চর্য শান্ত, সহনশীল মূর্তিরও আভাস আছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় বীরাঙ্গনায় পরোক্ষভাবে যে সব পুরুষের দেখা মেলে তারা কেউই মধুসূদনের নবজাগ্রত চেতনার মানস সন্তান নয়। এমনতর হওয়ার সম্ভাবনা ও সুযোগ এখানে নিতান্তই কম। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ, 'বীরাঙ্গনা'র নায়িকারা প্রত্যেকেই নবচেতনার আলোয় উজ্জ্বল। আর উজ্জ্বলতা তো প্রতিষ্ঠা পায় অন্ধকারে। তাই একই সঙ্গে নায়ক নায়িকার নবজাগ্রত চেতনা এ কাব্যে হয়তো সম্ভবপর ছিল না। আর এ ব্যাপারে মধুসূদনের ব্যক্তিগত মানস উদ্যোগ কতখানি ছিল তা-ও যথেষ্ট সংশয়ের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ : গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

অশোক বসু

রবীন্দ্রচর্চা : রবীন্দ্রনাথ 'বিষয়' হয়ে ওঠেন ১৯০৫ থেকে। এ বছরেই রবীন্দ্রনাথের ওপর প্রথম একটি বই প্রকাশ হয় (বঃ ১৩১২)। লেখক প্রমথনাথ রায়চৌধুরী। বইয়ের নাম 'কথা বনাম কাজ'। পরের বছরে (বঃ ১২১৩/ খ্রীঃ ১৯০৬) দ্বিতীয় বইটি লেখেন কাব্যবিশারদ কালিপ্রসন্ন। স্বনামে নয়, 'রাহু'- এই ছদ্ম নামে। নাম- 'মিঠে কড়াঃ ইহা কড়িও নহে কোমলও নহে পুরো সুরে মিঠে করা'। ২৪ পাতার বই। বই না বলে পুস্তিকা বলাই ভালো। কয়েকটি সংস্করণও হয়েছিল। এই দশকে আর কোনো প্রকাশনা নেই। পরের দশকেই ১৯১১-১৯২০, সংখ্যাটি ১৩ তে দাঁড়ায়। এই দশকেই ১৯১৩ খ্রীঃ কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। ১৯১৭ এবং ১৯২০ ছাড়া প্রতি বছরেই কম করে ১টি বই প্রকাশ হয়েছে। ব্যতিক্রম, ১৯১১তে ২টি এবং ১৯১২ ও ১৯১৪ সালে ৩টি করে। নোবেল-প্রাপ্তি বছরেও ১টি। তৃতীয় দশকে, ১৯২১-১৯৩০, প্রকাশনার সংখ্যা মোট ১৭টি। ১৯২৩, ১৯২৪ ও ১৯২৮ সালে কোনো প্রকাশনা নেই। চতুর্থ দশকে, ১৯৩১-১৯৪০, প্রকাশনের সংখ্যা ৩০। এ দশকেই দেখা গেল প্রতিবছরই বই প্রকাশ হয়েছে, এর মধ্যে ১৯৩১ সালেই ১০টি। ১৯৪১ সালে কবির মহাপ্রয়ান। পঞ্চম দশকে, ১৯৪১-১৯৫০, প্রকাশনার সংখ্যা ৮৮। এর মধ্যে ১৯৪১ সালে২১টি, ১৯৪২সালে১০টি, ১৯৫০সালে ১২। এই দশকের বাকী বছরগুলিতে কম করে ৫টি বই প্রকাশ হয়েছে। এরপর প্রতি দশকেই রবীন্দ্রচর্চা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। ষষ্ঠ দশকে, ১৯৫১-১৯৬০, এই সংখ্যা ১০৬। সাতের দশক, ১৯৬১-১৯৭০, কবির জন্ম শতবর্ষের দশক। এই দশকের মোট প্রকাশের সংখ্যা ৩২৪। ১৯৬১সালেই ১৩৫ বইয়ের প্রকাশ। আটের দশকে, ১৯৭১-১৯৮০ মোট প্রকাশ ২০৮। পরের দশকে, ১৯৮১-১৯৯০, সংখ্যা আবার বৃদ্ধির দিকে। ১৯৮৬ কবির ১২৫ তম জন্মবর্ষ। এ

বছরের প্রকাশন সংখ্যা ৫৫ । নয়ের দশকের সংখ্যা সঠিক জানা না গেলেও ১৯৮৭ পর্যন্ত মোট সংখ্যা ২৪৮ । অনুমান করা যায় ১৯৯০তে সংখ্যাটি ৩৫০ ছাড়িয়ে গেছে । শতাব্দীর শেষ দশকে রবীন্দ্রচর্চা আরও বেড়েছে । এই হিসাব শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের । পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধের হিসেব এতে ধরা হয়নি । ধরা হয়নি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশ-বিদেশের গবেষণা পত্রের সংখ্যাও ।

রবীন্দ্রপঞ্জী : যে কোনো বিষয়চর্চা বা গবেষণার প্রথম ধাপই হলো গ্রন্থপঞ্জী । তথ্যপঞ্জীর সহায়তা। পঞ্জীর ব্যবহার যেমন সহজেই করা যায়, পঞ্জী সংকলন বা তৈরি করা খুবই কষ্টসাধ্য । অমানুষিক পরিশ্রম, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠা এবং সবার উপরে বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা আর ধৈর্য ছাড়া ভালো নির্ভরযোগ্য, তথ্যবহুল গ্রন্থপঞ্জী বা তথ্যপঞ্জী তৈরি করা সম্ভব হয় না । পঞ্জী যেমন গবেষণার ক্ষেত্রে অপরিহার্য, তেমনি পঞ্জীকরণ কৌশলও গবেষণা সমধর্মী কাজ । কাজটা মূলত গ্রন্থাগারিকদের । রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী বা রবীন্দ্র-তথ্যপঞ্জী বেশ কিছু প্রকাশ হয়েছে এবং আরও প্রস্তুতির বিভিন্ন স্তরে । এ গুলির মধ্যে উল্লেখ্যঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার রবীন্দ্রশতবার্ষিকী বিশেষ সংখ্যা (১৩৬৮বৈশাখ ও ১৩৯৩ জ্যৈষ্ঠ), পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্য পুস্তক পর্ষদ থেকে প্রকাশিত নির্বাচিত পুস্তক তালিকা (১৯৮০-১৯৮৭); বাংলা আকাদেমি, ঢাকা প্রকাশিত বাংলা দেশে রবীন্দ্রচর্চা : রচনাপঞ্জী (১৯৮৬); তাপস ভট্টাচার্য সংকলিত রবীন্দ্র প্রসঙ্গ : গ্রন্থপঞ্জী (১৯৮৮); রবীন পাল ও দীননাথ সেনের 'বিষয় রবীন্দ্রনাথ' (১৯৮৮); 'জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীঃ বাংলা' (১৯৫৮-১৯৬১ এবং ১৯৮২-১৯৯১ সম্প্রতি শ্রীমতি শীলা চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে মূল্যঃ ২২৫টাকা) ; দিলীপ কুমার মজুমদারের 'রবীন্দ্র বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী' (১৯৮২); ফলিত কলা একাডেমি, দিল্লী প্রকাশিত ' Tagore Centenary Exhibition (1961) প্রভৃতি ।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাগারচর্চাঃ কবির গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর খন্ডচিন্তা নানা রচনায় চিঠিপত্রে ছড়িয়ে । অখন্ড ভাবনা এবং পূর্ণাঙ্গ রচনা নিতান্তই নগন্যঃ দুটি প্রবন্ধ, একটি ইংরেজি কবিতা, একটি বাংলা কবিতা আর কিছু শুভেচ্ছাবাণী ।

প্রথম প্রবন্ধঃ লাইব্রেরি, কবির তখন নবীন বয়স- মাত্র ২৫ । 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২বঃ/১৮৮৫খৃঃ) পৌষ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ । পরে বিচিত্র প্রবন্ধের অন্তর্ভূক্ত হয় । গ্রন্থাগার সম্পর্কে তত্ত্বমূলক আলোচনা । গ্রন্থাগারের দর্শন স্বরূপ প্রকৃতি ও তাৎপর্য একটি নিটোল এবং সুললিত কাব্যমাধুর্যে প্রকাশঃ 'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত ।' কবির তাই সকলের কাছে আহ্বানঃ 'লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্রপথের চৌমাথার উপর দাঁড়াইয়া আছি । কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব হৃদয়ের অতল স্পর্শে নামিয়াছে । যে যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও; কোথাও বাধা পাইবেনা ।' গ্রন্থাগার সেই স্থান যেখানে অতীত বর্তমানের অপেক্ষায়, বর্তমান ভবিষ্যতের প্রজন্মের । 'কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানব কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে- কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে । এসো এখানে এসো । এখানে আলোকের জন্ম-সংগীত গান হইতেছে ।'

দ্বিতীয় রচনা : লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য । এটি মূলত একটি অভিভাষণ । কবি ১৯২৮ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য 'নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হন । রচনাটি সেই উপলক্ষে লেখা । এটি কবির পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত । বিশ্ববন্দিত

চিরনবীন কবির বয়স তখন ৬৭ । প্রথম প্রবন্ধ ছিল তত্ত্বগত । কবির ভাবদৃষ্টি লাইব্রেরির প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য অনুধাবন করে মহাপ্রজ্ঞায় তাকে উদ্ভাসিত করেছেন । এই দ্বিতীয় রচনায় লাইব্রেরির মূল উদ্দেশ্য তার কর্তব্য তার কাজের কথাই সহজ উপমায়-উদাহরণে প্রকাশ করেছেন । এই সময়ের মধ্যে কবির 'শান্তিনিকেতন' প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপ্তি হয়েছে । উচ্চশিক্ষার জন্য 'বিশ্বভারতী' গড়ে উঠেছে । কবি এখন সুপরিচিত শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষা সংস্কারক । বিশ্বভারতীর অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার । শান্তিনিকেতনের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই গড়ে উঠেছে নিজস্ব গ্রন্থাগার । বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক তখন রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ।

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ : এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারকে তাঁর কবি- প্রজ্ঞায় নয়, বিশ্লেষণ করেছেন একজন দরদী পাঠক এবং একজন গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে । গ্রন্থাগার মানব সভ্যতার একটি অমূল্য অবদান, সমাজ-সৃষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠান । গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ও ইতিহাস বহু পুরাতন হলেও বিজ্ঞান-তত্ত্বে ও বিজ্ঞান-সত্যে একে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানসূত্রে প্রকাশ করে গ্রন্থাগারের সমস্ত কাজ কলাকৌশল কিংবা গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা পরিষেবা এবং তার মূল্যায়ন করার যে পদ্ধতি তা ৫টি সূত্রাকারে উদ্ভাবন করেন জাতীয় অধ্যাপক ড. এম আর রঙ্গনাথন । সূত্রগুলি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের 'পঞ্চসূত্র' নামে পরিচিত । গ্রন্থাগার বই সংগ্রহ করে পাঠকের ব্যবসায়ের জন্য । বইয়ের সঠিক ব্যবহারের কথা অর্থাৎ পঞ্চসূত্রের প্রথম চারটি সূত্রের কথাই রবীন্দ্রনাথ 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' প্রবন্ধে খুবই প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়-উপমায় উল্লেখ করেছেন তাঁর কাব্য- প্রতিভার প্রাজ্ঞপারমিতায় । গ্রন্থাগারে সুনির্বাচিত সংগৃহীত গ্রন্থসমূহের পূর্ব ব্যবহারেই গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের সার্থকতা । আজকের পরিবর্তিত পরিবেশে 'দূরদর্শন বৈদ্যুতিক গ্রন্থাগার' ব্যবহারের ব্যাপক সম্ভাবনার মুহূর্তেও বারংবার উচ্চারিত হচ্ছে গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা । আয়োজিত হয়- বই নিয়ে মিছিল, উত্থাপিত হয় 'গ্রন্থ-পক্ষ'ও 'গ্রন্থাগারদিবস' । গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল কথাই হলো: বই ব্যবহারের জন্য, বই পড়ার জন্য। বই নিজে পড়া অন্যকে জানান ও পড়তে উৎসাহিত করা । জ্ঞান অর্জন করা, অর্জিত জ্ঞানকে পরিশীলিত করে অন্যের সাথে ভাগ করে নেওয়া । গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোনোরূপ চর্চা ছাড়াই রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এই মূল নীতি অতি সহজ কথায় উল্লেখ করেছেন : 'লাইব্রেরি তার যে অংশে মুখ্যত জমা করে সে অংশে তার উপযোগিতা আছে, কিন্তু যে অংশে সে নিত্য ও বিচিত্রভাবে ব্যবহৃত সেই অংশে তার সার্থকতা' । গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিককে তাঁর পরামর্শ: 'গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগ দানের উপর তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত , গ্রন্থ সংখ্যার উপর নয়' ।

গ্রন্থাগার কোনো স্থানুর প্রতিষ্ঠান নয়— সে হবে সজীব ও সক্রিয় । প্রতিটি পাঠেচ্ছু ব্যক্তিকে সে গ্রন্থ সরবরাহ করবে । সংগৃহীত প্রতিটি গ্রন্থের প্রতি উপযুক্ত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে । গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্র একথাই বলে । রবীন্দ্রনাথ এসবেরই উল্লেখ করেছেন এই দ্বিতীয় প্রবন্ধে: 'লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে । সে হচ্ছে তার সম্পদের দায় । যেহেতু তার বই আছে সেইহেতু তার সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয় ।' কবির মতে : 'লাইব্রেরিকে ব্যবহার্য করতে গেলে লাইব্রেরির পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই । নইলে তার মধ্যে প্রবেশ করা চলে না ।' সে যেন দিশাহীন অচেনা শহর । লাইব্রেরির সার্থকতা সেখানেই যেখানে সে 'নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য — সেই হলো বড়ো লাইব্রেরি — আকৃতি নয় প্রকৃতিতে ।' এখানে পাঠকের অভ্যর্থনা অর্থে গ্রন্থাগারে নতুন বইয়ের প্রদর্শনী, গ্রন্থ-তালিকা প্রকাশের কথাই বলা হয়েছে । সেটা মুখে বা টেলিফোনেও হতে পারে । এই অভ্যর্থনা আতিথেয়তা

থাকলে তবে তো পাঠক গ্রন্থাগারে আসবে। কবির কথা: 'যে-কোনো বিষয়ে ভালো বই আসবা মাত্র তার ঘোষণা হওয়া চাই।' গ্রন্থাগারিকের কাজ হলো গ্রন্থের সঙ্গে পাঠকের সচেষ্টভাবে পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া।'

জনসাধারণের গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্রনাথ : রাজকীয় কৌলীন্যে ও অর্থকৌলীন্যে গ্রন্থাগার তখন সীমিতজনে পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত সংগ্রহ। জনসাধারণ দূরের কথা শিক্ষিতজনের গতিও সেখানে বাধিত। কলকাতার শিক্ষিতজনের জন্য প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হলো- সেট কাফ হলে। পরে ১৮৮৯ খ্রীঃ উত্তর কলকাতায় বিডন স্ট্রীটে কিছু তরুণ যুবকের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলো 'চৈতন্য লাইব্রেরি।' প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন সক্রিয়ভাবে। কবি এতটাই আন্তরিক ছিলেন যে গ্রন্থাগারের অনুষ্ঠিত সভায় তিনি তাঁর রচিত ৮টি প্রবন্ধ পাঠ করেন এখানেই। প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে: ১। য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরি— সভাপতি: গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়;২। ইংরাজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধ— সভাপতি: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ৩। বঙ্কিমচন্দ্র— সভাপতি: গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; ৪। মেয়েলী ছড়া— সভাপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; ৫। স্বদেশী সমাজ— সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত; ৬। পথ ও পাথেয়— সভাপতি : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; ৭। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়— সভাপতি: আশুতোষ চৌধুরী; ৮। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা— সভাপতি: আশুতোষ চৌধুরী। চৈতন্য লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা ও গৌরববৃদ্ধির সাথে কবি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকেছেন নানা ভাবে। জনশিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা, নতুন নতুন গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা প্রসার ও পুষ্টির উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর অনেক কাজের মধ্যেও সময় করে নিতেন।

রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার আন্দোলন : বর্তমান 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ'-এর প্রতিষ্ঠা কাল (১৯২৫ খ্রীঃ) থেকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন। পরিষদের তিনিই ছিলেন প্রথম সভাপতি। ১৯২৮ খ্রীঃ কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিলভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির তিনি ছিলেন সভাপতি। কবি বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন। চৈতন্য লাইব্রেরি ছাড়াও যুক্ত ছিলেন রামমোহন লাইব্রেরি ও আরও অনেক গ্রন্থাগারের সাথে। শিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের অপরিহার্য ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থেকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার ও প্রচারের সাথেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছেন। এমন কি ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের সুবিধা ও প্রয়োজনীতার কথা ভেবে শান্তিনিকেতনে 'চলন্তিকা' নামে ভ্রাম্যমান বা চলমান গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গ্রন্থাগারিকরাও বিশ্বকবির কাছে তাঁদের মর্যাদা ও স্বীকৃতি পেয়েছেন: 'লাইব্রেরিয়ানের কাজটা মস্ত কাজ'। তিনি হবেন 'যথার্থ সাধক' ও 'নির্লোভ'। তাঁর থাকবে 'আতিথ্য পালনের যোগ্যতা'।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ তথা অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজ আয়োজিত নবম উজ্জীবনী পাঠমালার বক্তৃতা উপলক্ষে সঞ্চালক রবীন্দ্র-অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে এই লেখার প্রস্তুতি। লেখায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার' বইটির এবং রবীন্দ্রনাথের' লাইব্রেরি' ও 'লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য' প্রবন্ধ দুটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এ লেখা সর্বাংশে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো।

কাজী আবদুল ওদুদ এবং বাংলা সাহিত্য

আবদুর রউফ

মূলত মননশীল প্রাবন্ধিক হিসেবেই কাজী আবদুল ওদুদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাংলায় রেনেসাঁস পুরুষ বলতে যাঁদের নাম আমাদের সর্বাগ্রে মনে আসে সেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, অক্ষয়কুমার দত্ত ইত্যাদির তুলনায় আবদুল ওদুদের আবির্ভাব অনেক পরে ঘটলেও বাঙালি মুসলমান সমাজের তরফে তাঁকেই উল্লেখ করা যায় আদর্শ রেনেসাঁস পুরুষ হিসাবে। বাস্তবিক বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারা এবং মূল্যবোধের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আস্থা। আস্থার এই গভীরতার প্রমাণ মেলে বাংলার নবজাগরণের একটি সর্বাঙ্গীণ মূল্যায়নে তাঁর আন্তরিক উৎসাহ থেকে। এ ব্যাপারে তিনি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বাংলার নবজাগরণের ইতিবাচক পরিণতির প্রতি গভীর আস্থাবোধের কারণেই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এই নবজাগরণের পথিকৃত রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের এই মহাপুরুষের প্রতি তাঁর আকর্ষণের অন্যতম আর একটি কারণ ছিল হজরত মোহাম্মদ এবং ইসলামের অবদানের (যতখানি সমসাময়িক জীবনে প্রাসঙ্গিক) সারবত্তাটুকু রেনেসাঁর ভাবধারার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে রামমোহনের অসামান্য দক্ষতা। এই পথেই হিন্দু-মুসলমানের ভাবগত মিলনের সম্ভাবনা সম্পর্কে আবদুল ওদুদ আস্থাশীল হয়ে উঠেছিলেন। রামমোহনকে নিয়ে তাই তিনি লিখেছেন বেশ কয়েকটি অনবদ্য নিবন্ধ। যেগুলি বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ।

সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য এবং বঙ্গীয় রেনেসাঁস ভাবধারার ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে তাঁর মনে রেনেসাঁস দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ ফসল সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল। তাঁর বিবেচনায় ইউরোপে গ্যেটে এবং ভারতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠ ফসল। তাই এই দুই অসামান্য মনীষীর জীবন ও কৃতির অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা জুড়ে আছে আবদুল ওদুদের প্রবন্ধ সাহিত্যের বিরাট অংশ। সাহিত্যের রস বিচার, সমাজ, ধর্ম, প্রচলিত কল্যাণচেতনা ইত্যাদির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনার ক্ষেত্রে ওদুদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবিত হয়েছিল উল্লেখিত দুই মনীষীর ধ্যান-ধারণার দ্বারা। কিন্তু তিনি অন্ধ অনুকরণবৃত্তিকে কখনও প্রশ্রয় দেননি। তাঁর কর্ষিত চিত্ত স্বভাবতই সৃজনশীল ছিল। তাই গ্যেটে-রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর তন্নিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণে সব সময়েই যুক্ত হয়েছে কিছুটা বাড়তি মাত্রা। যে কারণে এসব বিচার-বিশ্লেষণ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠতে পেরেছে।

গ্যেটে-রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার প্রভাবজনিত দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতার কারণেই আবদুল ওদুদ যখন বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, মীর মশাররফ, কাজী নজরুল ইসলাম এবং অন্যান্য আরও অনেক সাহিত্যিকের মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছেন সে সব প্রয়াসের মধ্যে সব সময়েই লক্ষ করা গেছে নির্মোহ পক্ষপাতহীন যুক্তিবিচারের ভিত্তি। ফলে মূল্যায়নগুলি হয়ে উঠতে পেরেছে বস্তুনিষ্ঠ। এবং বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার কারণেই বাংলা সাহিত্যে যেসব মূল্যায়নের একটি চিরকালীন স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

যে কোনও বিচার-বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ইত্যাদির প্রশ্নে কাজী আবদুল ওদুদ নির্মোহ, পক্ষপাতহীন এবং বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারতেন তাঁর মুক্ত বুদ্ধির কারণে। বুদ্ধির মুক্তি ছিল তাঁর সাধনার বস্তু। ঢাকায় কয়েকজন সমমনস্ক বন্ধুর সহায়তায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলে সেই সংগঠনের মুখপত্র 'শিক্ষা'-র মাধ্যমে তিনি সূচনা করেছিলেন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের। সংগঠনটি

দীর্ঘস্থায়ী না হলেও এই আন্দোলনের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এই আন্দোলন বাঙালি মুসলমানদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিল তার মধ্যেই সূচিত হয়েছিল পরবর্তী কালের ভাষা আন্দোলন এবং 'বাংলাদেশ' নামে একটি নতুন বাংলাভাষী রাষ্ট্র উদ্ভবের যাবতীয় সম্ভাবনা।

এই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনই কাজী আবদুল ওদুদকে অনুপ্রাণিত করেছিল বাঙালি মুসলমানদের আইডেনটিটি এবং হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধের স্বরূপ বিশ্লেষণে। এসব বিশ্লেষণে যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা আজও এই একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক সময়েও সমান প্রাসঙ্গিক রয়েছে। যে কারণে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে এসব বিষয়ে আবদুল ওদুদের বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধগুলির গুরুত্ব এখনও এতটুকুও ম্লান হয়নি। উপরন্তু সত্যিকারের বুদ্ধির মুক্তি আমরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই আজও অর্জন করতে পেরেছি কিনা সে প্রশ্ন বারবার আত্মজিজ্ঞাসার আকারে উত্থাপন না করে উপায় থাকছে না। এরকম সংশয়ের কারণ, জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় ইত্যাদির প্রশ্নে আজও ভুল বোঝাবুঝি বাড়ছে বই কমছে না। এমনকী নিজেদের ধর্মবিশ্বাস নিয়েও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্থান-কাল-পাত্রের উপযোগী হয়ে ওঠার মতো স্বচ্ছ নয়। অথচ বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানরা যাতে এ ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে না থাকে সেজন্য আবদুল ওদুদ নিজের মুক্ত বুদ্ধির আলোয় হজরত মোহম্মদ এবং কোরানশরিফের নব মূল্যায়ন করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের প্রভাবে হিন্দুদেরও যাবতীয় বিভ্রান্তি কেটে যাবে। কিন্তু বিভ্রান্তি কাটার বদলে বাড়ছে দেখে আবদুল ওদুদের মুক্তি বুদ্ধিদীপ্ত নিবন্ধগুলির শরণ নেওয়ার প্রয়োজন আবার নতুন করে অনুভূত হচ্ছে।

নজরুল প্রসঙ্গে

আবদুর রউফ

হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাঙালি সত্তা কীরকম অমিত তেজের অধিকারী হতে পারে, প্রাণশক্তির কী বিপুল জোয়ার তা থেকে উৎসারিত হয়ে বাঙালি চিত্তের দুকূল ভাসিয়ে দিতে পারে, কবি নজরুল ইসলামের ভেতর দিয়ে একবারই তা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, বাঙালির হিন্দু-মুসলিম মিলিত সত্তা তার যৌবনকে একবারই প্রত্যক্ষ করেছিল। যে মূর্ত প্রতীকের মাধ্যমে সেটা তারা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিল তাঁরই নাম কবি নজরুল ইসলাম।

যৌবনের স্বাভাবিক নিয়মে বাংলাভাষার ব্যবহার হয়ে উঠেছিল অনেক বেশি স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ। আরবি-ফারসি শব্দের যদৃচ্ছ ব্যবহারে এই সাবলীলতা বিঘ্নিত হয়নি মোটেই। বরং তার ধারণ ক্ষমতা এবং আত্মসাৎ করার ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল অনেক বেশি পরিমাণে। নজরুলের কবিতা একই সঙ্গে সংস্কৃত তোটক ছন্দ এবং আরবি মোতাকেরিম ছন্দকে হজম করে ফেলেছিল অবলীলাক্রমে। হিন্দু এবং মুসলমান ঐতিহ্যের অনুসৃতিকে পাশাপাশি ব্যবহার করায় ভাবের প্রকাশ বাধাতো পায়ইনি বরং আরও বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। একই সঙ্গে হিন্দু জাত্যাভিমান এবং মুসলিম জাত্যাভিমান নিয়ে গৌরবান্বিত বোধ করতে বাঙালির কোনও অসুবিধে হয়নি। কারণ সবকিছুকেই দেশজ সংস্কৃতির অবয়বে আত্মসাৎ করে ফেলার ফলে যাবতীয় অতীত গৌরবকে বাঙালি তার নিজস্ব গৌরব বলে গ্রহণ করতে কখনও

কুণ্ঠিত হয়নি। ইসলামি ঐতিহ্যের জয়গান গাওয়া সত্ত্বেও নজরুল তাই অনন্য দেশপ্রেমী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণাস্থল হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তাঁর কবিতা কণ্ঠে ধারণ করে বাংলার বিপ্লবীরা, স্বাধীনতা সংগ্রামীরা 'ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান' গাহিতে পেরেছিলেন।

বাঙালির হিন্দু-মুসলিম মিলিত সত্তার এই যৌবন কিন্তু স্থায়ী হয়নি। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী এবং ইসলামি বিশুদ্ধতাপন্থীদের দ্বারা বাঙালি ঐতিহ্যবিরোধী ভূমিকার প্রাবল্য ঘটায় বঙ্গজননীর এই দুই সন্তানের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। এই বিচ্ছেদের ছিদ্রপথেই এসেছিল জরা। নজরুল বাকশক্তি রহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালি চিত্তও জরাগ্রস্ত হয়েছিল। যে জরার হাত থেকে আজও আমরা মুক্তি পেয়েছি কিনা সে সংশয় থেকেই যায়। কিন্তু এ অন্য অলোচনা।

উনিশ শতকে সাহিত্যেতিহাসচর্চা

আশরাফ হোসেন

উনিশ শতকে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির মনে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে। দেশীয় ধ্যান-ধারণাকে জানতে এঁরা উৎসুক হন। ফলে স্বদেশের পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস জন্মলাভ করে। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচক হিসাবে আমরা যাঁর নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করি তিনি হলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষিত যুবক কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-৭৩)। On Bengali Poetry এবং On Bengali Works and Writers নামে দুটি বিশেষ সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখেন ১৮২৯ ও ১৮৩০ সালে। লর্ড সাহেবের 'লিটারারি গেজেট'-এ প্রকাশ পায় প্রবন্ধ দুটি। উনিশ শতকে বাঙালির সাহিত্য-ইতিহাসচর্চার প্রথম পদক্ষেপ প্রবন্ধ দুটি।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটির মর্ম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকায়' ৬.২.৩০-এ প্রকাশিত হয়। সেখান থেকে আমরা জানতে পারি যে কেরির বাইবেলের অনুবাদ-এ কাশীপ্রসাদ তীব্র আপত্তি তোলেন। তিনি মনে করেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা কেউই বাংলা গদ্যরীতি যথাযথরূপে রপ্ত করতে পারেন নি। তা এদেশের মানুষের উপলব্ধির সহায়ক নয়। তিনি মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের 'রাজাবলি'-র ভাষায় অনেক প্রসাদগুণ দেখেছেন। কিন্তু 'রাজাবলি'র অনেক অমূলক তথ্য কাশীপ্রসাদকে পীড়া দিয়েছে।

কাশীপ্রসাদ বাংলা গদ্যের অন্বয়-প্রত্যয় ও শব্দভান্ডার যথেষ্ট পরিমাণেই আয়ত্ত করেছিলেন বলে মনে হয়। হরপ্রসাদ রায় 'পুরুষপরীক্ষা'র ভাষার সঙ্গে 'রাজাবলি'র তুলনা করে বলেন যে পুরুষপরীক্ষার ভাষা-ই উন্নত। বাংলা গদ্যের উন্নতির ক্রমান্বয়টি কাশীপ্রসাদ লক্ষ করেছেন। তাই রামমোহনের গদ্য রচনার তিনি প্রশংসা করেন। রাজা রামমোহন রায়ের গদ্য রচনাকে কাশীপ্রসাদ 'নিরাবলি' মনে করেছেন। প্রাথমিক পর্বের গদ্যের প্রকৃতি নির্ণয় ও মূল্যায়নে তিনি যথেষ্ট বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

এরপর কাশীপ্রসাদ দৃষ্টি ফিরিয়েছেন মধ্যযুগের সাহিত্যে। তিনি প্রথমে কৃত্তিবাসের রামায়ণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ষোড়শ শতক রামায়ণের রচনাকাল বলে তিনি স্থির করেন। ঐ সময় কৃত্তিবাসের চেয়ে 'উত্তম পদ্যরচক' কেউ ছিলেন না বলে তিনি মনে করেন। রামায়ণের জনপ্রিয়তায় কাশীপ্রসাদ মুগ্ধ। তিনি রামায়ণে কতকগুলি দোষের উল্লেখ করে বলেন যে তা লিপিকারের দোষ। সর্বোপরি তিনি মনে করেন ' ঐ তরজমা অতি রসাল।'

মহাভারতের প্রসঙ্গে তিনি বলেন ' পদ্যরচকদের মধ্যে কাশীদাস নামক শূদ্র পদ্যরচক হইল, তিনি মহাভারতের কয়েক পর্ব বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যেতে রচনা করিয়া 'পান্ডববিজয়' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।' কাশীপ্রসাদ মনে করেন সমগ্র মহাভারত কাশীরাম দাসের অনুবাদ নয়। এই অনুমান অমূলক নয়—

' আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশী দাস গেলা স্বর্গপুর।।

অতঃপর কাশীপ্রসাদ মনে করেন কবিকঙ্কণ উপাধিতে খ্যাত এক ব্রাহ্মণ (গোবিন্দানন্দ) চণ্ডীর স্তবাদী নিয়ে চণ্ডীকাব্য প্রকাশ করেন। তিনি মুকুন্দরামকে ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রসাদলব্ধ ছিলেন বলে মনে করেন। তিনি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের উল্লেখ করেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যটি কাশীপ্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বিদ্যাসুন্দরের কয়েক পংক্তির অনুবাদ করে তার কাব্য সৌন্দর্য তুলে ধরেন। তবে আদিরস ঘটিত কথার দ্বারা তাহাতে কলঙ্ক আছে বলে তিনি জানান।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কাশীপ্রসাদ পুস্তক সমালোচনার ঢঙে সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার সূত্রপাত করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে সাহিত্য-ইতিহাস-চর্চার এই ধারাটি বেগবতী না হয়ে যথার্থ উত্তরসুরীর অভাবে তা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

কবি ঈশ্বরগুপ্তের প্রচেষ্টায় এই শাখাটি আবার নতুন মাত্রা পায়। ১৮৫৩-৫৫-র মধ্যে সংবাদ প্রভাকরে 'কবি ও কবিওয়ালা'দের জীবনচরিত প্রকাশ করে ঈশ্বরগুপ্ত একটি বিশেষ যুগকে ধরে রেখেছেন। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, রাম বসু, নিত্যানন্দ বৈরাগী, রাসু-নৃসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস প্রমুখ কবির জীবনেতিহাস সংগ্রহে প্রথম ব্রতী হন। ঈশ্বরগুপ্তের কীর্তির কথা স্মরণ করে রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, ' Iswar Chandra Gupta, the first great poet of this century was the first writer who attempted to publish biographical accounts of the previous writers, (Literature of Bengal -ARCYDAE - 1977)'

এইভাবে জাতির নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে শিক্ষিত বাঙালি মনঃসংযোগ করেন। এ প্রসঙ্গে আমরা যাঁর নাম উল্লেখ করতে পারি তিনি হলেন জাতীয়তাবাদী কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৫৯ সালের 'এডুকেশন গেজেটে'র পাঁচটি সংখ্যায় 'বঙ্গবিদ্যার আদ্য বিবরণ' প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যায় তিনি বাংলা ভাষার উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে সিদ্ধান্তগুলি নিতান্ত প্রাথমিক পর্যায়ের। প্রবন্ধে দ্বিতীয় সংখ্যায় আলোচনা করেছেন কৃত্তিবাস,মুকুন্দরাম, কাশীরাম ও ভারতচন্দ্রকে নিয়ে। কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয়ে তিনি বলেন যে উনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক পূর্ববর্তী। প্রবন্ধের তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান নিয়ে আলোচিত । তিনি জানান যে আঠারো বছরে এখান থেকে এগারোটি বাংলা পুস্তক প্রকাশিত হয়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধের পঞ্চম সংখ্যায় স্কুল বুক সোসাইটির অবদানের কথা আলোচিত হয়।

উনিশ শতকের অর্ধাংশ বিগত। বাঙালির ইতিহাস জিজ্ঞাসু মন সাহিত্যেতিহাসের নানা আবিষ্কার করেছে। সাময়িকপত্র 'মিত্র প্রকাশ'এর সম্পাদক কবি হরিশচন্দ্র মিত্র ১৮৬৬ সালে 'কবি কলাপ' (১ম খণ্ড) নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এখানে ঈশ্বরগুপ্তের অনুবর্তন হয়েছে। কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কন, নন্দকুমার চক্রবর্তী, কাশীরাম দাস এবং রামপ্রসাদ সেন — এই পাঁচজন কবির জীবন চরিত 'উত্তম প্রণালী'তে লিপিবদ্ধ হয়।

'কবি-কলাপ'-এর অনুবর্তন দেখা যায় হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবি-চরিত'-এর। পুস্তকটি ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এতে সাতজন কবির জীবনচরিত আলোচিত হয়। কবি-চরিতের উপক্রমণিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এখানে লেখক বাংলা ভাষার উৎপত্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজের কথা আলোচনা করেছেন হরিমোহন। তাছাড়া কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ , ভারতচন্দ্র, মদনমোহন তর্কালংকার এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত— এই সাতজন কবির জীবনচরিত আলোচিত হয়। হরিমোহন এই কবিদের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন— 'স্বভাবে বর্ণনে যেমন কবিকঙ্কন, পরমার্থ কালী বিষয়ে যেমন কবিরঞ্জন, আদিরসে যেমন গুণাকর উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন, হাস্যরসে ঈশ্বরগুপ্ত তেমন অদ্বিতীয় ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন ।'

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭১-এ Calcutta Review-এ তিনি Bengali Literature নামে একটি অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখেন।

সাহিত্যেতিহাসচর্চা ক্ষেত্রে এবার যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' প্রণয়ন করেন। তাঁর ভাষায়, ' বহু অনুসন্ধান দ্বারা এই ক্ষুদ্রপুস্তকে বঙ্গভাষার ইতিহাস-ঘটিত কয়েকটি কথা লিখিত হইল।' বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি প্রায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পুস্তক হলো রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩)। দীনেশচন্দ্র সেনের পূর্বে এত তথ্যঘটিত পুস্তক রচনার প্রয়াস কেউ দেখাতে পারেন নি।

এরপর সাহিত্যেতিহাসের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো রমেশচন্দ্র দত্তের The Literature of Bengal, পুস্তকটি ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে লেখকের ছদ্মনামে (ARCYDAE) প্রকাশিত । বঙ্গের সাহিত্য যে কত সমৃদ্ধ তা বিশ্ববাসীকে অবগত করানোই লেখকের উদ্দেশ্য।

১৮৭৮-এ প্রকাশিত হয় রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'। পুস্তকটির যাবতীয় তথ্য রামগতি ন্যায়রত্নের বই থেকে নেওয়া। তবে রাজনারায়ণ বসুর পাণ্ডিত্য ও মনীষা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এদিক থেকে এটি বঙ্কিমচন্দ্রের Bengali Literature -এর সঙ্গে তুলনীয় ।

১৮৮০-তে প্রকাশিত হয় গঙ্গাচরণ সরকারের ' বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্য' । গঙ্গাচরণ যাবতীয় তথ্য রামগতির কাছ থেকে নিলেও সিদ্ধান্তগুলি একান্ত নিজস্ব। কোথাও কোথাও রামগতির সঙ্গে একমত হতে পারেন নি।

১২৮৮ (১৮৮১) বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য'। ২৪ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি একজন সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যকে দেখেছেন।

১২৯২ বঙ্গাব্দে (১৮৮৫ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয় কৈলাসচন্দ্র ঘোষের 'বাঙ্গালা সাহিত্য' । কৈলাসচন্দ্র রমেশচন্দ্রের মতো দেশ-কাল-পাত্রকে সাহিত্যের মধ্যে দেখার চেষ্টা করেন। উনিশ শতকে সাহিত্যেতিহাসচর্চার উজ্জ্বলতম নিদর্শন দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে এই আকর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ' এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য বলিয়া এতবড়ো একটা ব্যাপার আছে তাহা আমরা জানিতাম না।'

১৮২৯-৩০ খ্রীস্টাব্দে কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ কেরী অনূদিত বাইবেলের সমালোচনায় যে

সাহিত্য-ইতিহাস-চর্চার সূত্রপাত করেন, পরবর্তীকালে বিভিন্ন লেখক তাতে নানাভাবে নানা উপাদানের সমাবেশ ঘটান। দীনেশচন্দ্র সেন স্বীয় প্রতিভাবলে এবং শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করে তাকে দেশে বিদেশে সম্মানীয় করে তোলেন।

প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্যের রূপাঙ্গিক

আশিসকুমার দে

১ 'প্রাগাধুনিক' বিশ্লেষণটির যাথার্থবিচার।

২ আধুনিক-পূর্ব যুগের সাহিত্যের রূপাঙ্গিক সম্পর্কে নীরব শীতল উপেক্ষার দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে অগ্রজদের আলোচনায়। ভাষা, আঙ্গিক সম্পর্কে একটা সাধারণ কাঠামো বা কাব্যপ্রথাকে স্থির (Static) বলে ধরা হয়েছে। বিষয়ভূমি, কবিভাবনা সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ পেলেও তার প্রকাশলক্ষণগুলি অবহেলিত থেকে গেছে। রূপাঙ্গিক নিয়ে একটা অসচেতন মনোভাবই এমন দৃষ্টিকোণ গড়ে তুলেছে।

৩ বিষয় চিরকালই অসীম, মৌল মনোবৃত্তির বাইরে তার পদচারণা নেই। বিপরীতে, ঐ বিষয় কিভাবে, কিরূপে প্রকাশ করছে নিজেকে সেটা জানাই সবচেয়ে জরুরি বিষয়। প্রেম, ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি যুগে যুগে একই বিষয়রূপে থেকেছে। এগুলির রূপদানে লেখকেরা কতটা আলাদা ভঙ্গি নিয়েছেন, তার পরিচয় নিয়ে প্রশ্নাকুল হতে হয়।

৪ ধর্মীয় বাতাবরণের আড়ালে কবির শিল্পপ্রক্রিয়ার সন্ধান তাকে বিচিত্র পথে নিয়ে গেছে। তাই ধর্মের গণ্ডি থেকে বা দেবতার নামে চিহ্নিত মধ্যযুগের কাব্যের ধারাগুলির মধ্যে কবির স্বাতন্ত্র্য সবসময়েই বিসর্জিত হয় নি। একদিকে ছিল যুগের কাব্যপ্রথা (Poetic convention of the age) যাকে একটা আদর্শ বলতে পারি, অন্যদিকে আছে সেই প্রথা থেকে সরে যাবার, নিজের ব্যক্তিগত উচ্চারণকে খুঁজে নেবার প্রাণপণ প্রয়াস (একে বলতে পারি deviance from the norm)। কবিসমাজে এই প্রথা বনাম ব্যক্তির সংঘর্ষ, বিচ্ছেদ ও সংশ্লেষ পরিচয় জানতে হবে। হয়তো তা গভীরভাবে সমাজমনের সঙ্গে ব্যক্তিমনের সংগ্রাম।

৫ এসব পরিচয় নিলে প্রাগাধুনিক কাব্যের প্রথানুগত্য, সমরূপতার (homogenity) ভুল পরিচয়টি একালের পাঠকের কাছে স্পষ্ট হবে। সে অনুভব করবে জীবন ও শিল্পের সংগ্রাম, কবিসমাজের মধ্যে একক কণ্ঠস্বরের ইতিহাস। দেখা যাবে যে 'ধ্রুপদী ও রোমান্টিকতা' অনাধুনিক ও আধুনিক কোনো কালপর্বে নেই, আছে কবির প্রকাশব্যাকুলতার মৌল লক্ষণের মধ্যে।

৬ মনে হতে পারে যে আমরা রূপাঙ্গিককে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করছি। তা নয়। বরং বিষয় প্রকাশে যে রূপ, যে আঙ্গিক তারা গ্রহণ করেছিলেন, তার অন্বয় সম্পর্কের কথাই ভাবছি। আমাদের মতে বিষয় ও রূপ সবসময়েই নিজেদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করবে। কেউ পরস্পরের থেকে ন্যূন হবে না। কিন্তু একই বিষয় যে বহু রূপের মাঝে মুক্তি চায়, তা ভুললে

চলবে না। কাজেই প্রাগাধুনিক বাংলা কাব্যের বিষয়ের রূপাঙ্গিক নিয়ে আরও আলোচনা, সমালোচনা, প্রশ্ন, উপ-প্রশ্নগুলি এক নতুন সমালোচনার পত্তন করবে। এই নিবন্ধটি সেই পত্তনেরই একটি বিশেষ উদ্যোগ বলে মনে করা যেতে পারে।

চেতনাপ্রবাহ : অন্তঃশীলা থেকে জাগরী

কার্তিক লাহিড়ী

'অন্তঃশীলা' ও 'একদা'র কয়েক পাতা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ বোঝা যায় ধূর্জটিপ্রসাদ ও গোপাল হালদার গতানুগতিক পন্থায় উপন্যাস লেখেন নি। হয়তো একদা-র প্রথম দু-পাতায় লেখকের উপস্থিতি অত্যন্ত প্রকট বলে প্রথমেই একদা-র নতুনত্ব অনুধাবন করা কষ্ট হয়। কিন্তু যেই 'আধঘুমে অমিত লেপটা টানিয়া লইতে গেল'— এই বাক্যে এসে উপস্থিত হই, বুঝতে পারি লেখক এবার তাঁর সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শীর ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়িয়ে পাঠকদের সোজাসুজি অমিতের মানসিক অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে চান। অন্তঃশীলা-য় অবশ্য ধূর্জটিপ্রসাদ প্রায় প্রথম থেকে খগেনবাবুর আন্তর স্বভাব চিত্রনে মনোযোগী ছিলেন। এবং উভয়ে যেভাবে খগেনবাবু ও অমিতের মানসিক অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে চেষ্টা করেন তা নিশ্চয়ই প্রচলিত প্রথাসম্মত নয়।

খগেনবাবু এবং অমিতের অভিজ্ঞতাসমূহ তাদেরই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত করার জন্য উভয় ঔপন্যাসিককে স্বাভাবিকভাবে নায়কদের স্মৃতির সাহায্য নিতে হয়েছে— স্মৃতির দৌলতে অনুষঙ্গ, অনুষঙ্গের মাধ্যমে আবার স্মৃতি-রোমন্থন বিস্তারিত হয় :

১. 'তাহা ছাড়া এই শীত ··· লেপ যে ছাড়িতে ইচ্ছা যায় না। অমিতের মনে পড়িল, সুনীলের লেপ নাই। ···' (একদা)। লেপের কথা থেকে 'রাগে'র কথা, সেই 'রাগ' কিভাবে ইন্দ্রাণী অমিত-কে দেয়, আর 'রাগ'-টা কেমন ক'রে সুনীলের কাছে পৌঁছয় ও তা থেকে সুনীলের বর্তমান আশ্রয়ে আসার ঘটনা অতি সংক্ষেপে হলেও বিবৃত হয় অমিতের মাধ্যমেই।

২. 'তাঁরও মাথা খারাপ হবে না কি! না, তাঁর কেন হবে? তিনি তিলমাত্র দোষ করেন নি। সাবিত্রীর স্বভাব ছিল তাই, সন্দেহ আর সন্দেহ। ···' (অন্তঃশীলা)। সেই সূত্রে আসে মাসিমা, তারপর রমলার কথা এবং সাবিত্রী, মাসিমা ও রমলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খগেনবাবুর অভিমত।

স্মৃতি ও অনুষঙ্গের সমান্তরালে কখন-বা যুগপৎ সেই মুহূর্তে পাত্রদের মানসিক অবস্থার চিন্তাভাবনার বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে উভয় ঔপন্যাসিকই নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও হয়তো সেই রীতি ব্যবহার করেন, যা ব্যাপকভাবে আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে প্রযুক্ত হয়েছে। স্মৃতি, অনুষঙ্গ বা বর্তমান মুহূর্তের বর্ণনাকালে কোনো কোনো সময় লেখকের অনধিকার বা অনাহূত প্রবেশ ঘটলেও, সেই সব বিবরণের সঙ্গে ঔপন্যাসিক-প্রদত্ত বিবরণের প্রভেদ আকাশ-পাতালের। আর এই দুই কৌশল গৃহীত হয় বলে ধূর্জটিপ্রসাদ ও গোপাল হালদার যে নায়ক নির্বাচিত করেন তারা রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মতো সাধারণ বা অর্বাচীন মানুষ নয়; খগেনবাবু ও অমিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রতিভূ না হলেও বুদ্ধিজীবী ও আত্মসচেতন নিঃসন্দেহে। এই দুই আত্মসচেতন বুদ্ধিজীবীর স্ব-গণ্ডি অতিক্রমের কাহিনী অন্তঃশীলা ও একদা।

আপন গণ্ডি অতিক্রমের কাহিনী হলেও উভয় উপন্যাসে অথচ চরিত্রায়ণের উপর আদৌ গুরুত্ব আরোপ হয় নি। উপন্যাস শেষ ক'রে আমরা বুঝি যে খগেনবাবু ও অমিত তাদের এ-তাবৎ জীবনধারার অন্তঃসারশূন্যতা হৃদয়ঙ্গম করেছে— একজন ইনটেলেকচুয়ালিজমের অসার্থকতা, অন্যজন সন্ত্রাসবাদের অসম্পূর্ণতা ও রোমান্টিকতা সম্পর্কে সচেতন হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের মনোভঙ্গির আমূল বদল হয়েছে এমন কথা বলা যায় না অবশ্য। আসলে এখানে প্রচলিত উপন্যাসের চরিত্রায়ণ, চরিত্রের ক্রম-বিকাশ ও পরিণতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল না, উভয়ের অনুভব ও আবেগ সঠিক ধরাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। না হলে খগেনবাবু ও অমিতকে অন্য চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত করে আঁকা চলত, তাতে নায়কদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা তার বিকাশ পাঠকের নজর এড়াতো না।

এই স্থির চরিত্রায়ণের জন্য আবার অন্তঃশীলা ও একদা-কে গতানুগতিক উপন্যাস থেকে আলাদা করা যায় তথাকথিত কাহিনী বা প্লটের অনুপস্থিতির জন্য। যদিও উভয় উপন্যাসে কাহিনী-বৃত্তের একটি রূপরেখা টানা সম্ভব নয়, তবু সে কাহিনী-বৃত্তকে ঘটনা-প্রধান চরিত্র-প্রধান উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে এক ক'রে দেখা চলে না। আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে প্লট বা চরিত্রচিত্রণ মুখ্য নয়। একজন ব্যক্তির মানস-চেতনার মানচিত্র আঁকাই তার লক্ষ্য। সেজন্য এই জাতীয় উপন্যাসকে এক হিসেবে চেতনা-ভ্রমণ বলা চলে,— 'সত্যকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে , হয়তো কোনো সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীট্‌সের negative capability থাকবে ; তবে স্রোতে যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে, একটা ঘটনা ঘটুক, অমনি , খড়কুটো যেমন স্রোতে ভেসে যায়, ঘটনাটি তেমনি বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। অন্তঃশীলা গতির ইতিহাসই হলো pure নভেল, কারণ সেটি সাত্ত্বিক মনের পরিচয়। জীবনে নাটকীয় ঘটনা ঘটে না, অতি সাধারণ, তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাকে নিয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, কখনও আসে জোয়ার, কখনও ভাটা, কখনও বা বান ডাকে, বন্যা আসে, চোখ খুলে দেখলে সেই স্রোতে কত ঘূর্ণী , কোথায় ঢেউ, কোথাও বা গর্ত, এই ত' জীবন।' [অন্তঃশীলা,(১৩৪২) পৃ-১৫৭-৫৮]।

খগেনবাবুর উক্তিতে শুদ্ধ উপন্যাসের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, অতি সংক্ষেপে হলেও আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাই। চিন্তাস্রোতের ঠিক প্রতিচ্ছবি নয়, ' এরই বিচার ও মূল্য নির্ধারণই আর্টিস্টের কাজ —অভিজ্ঞতা নয়, অভিজ্ঞতার তাৎপর্য গ্রহণ ও প্রকাশ' যে সৎ ঔপন্যাসিকের কর্মের অন্তভূত তা প্রুস্ত-জয়েস প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের রচনাবলিতে লক্ষিত হয়। ঐ সব উপন্যাস আপাত স্মৃতি-রোমন্থন সংবিৎ-প্রবাহের প্রতিফলনের অন্তরালে কাজ ক'রে চলে ঔপন্যাসিকের সদাজাগ্রত অন্বেষা ও জিজ্ঞাসা। এমন কি আত্মজিজ্ঞাসা সেখানে লীন হয়ে যায় সমাজ-বিশ্লেষণের গৌণ অথচ অমোঘ পরিপ্রেক্ষিতে। সেখানে লেখকের সমাজচেতনা আত্ম-চেতনায় এতই ওতপ্রোত জড়িত থাকে যে তাদের বিশ্লিষ্ট করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা অন্তঃশীলা ও একদায় ব্যবহৃত রীতিকে আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে ব্যবহৃত রীতির সমগোত্রীয় বলে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। 'জাগরী' উপন্যাসে পুরোপুরি এই রীতি ব্যবহৃত না হলেও আমরা ঐ রীতিকে প্রথাসিদ্ধ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি না। 'জাগরী'র রীতিও আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক ।

বাংলা প্রবন্ধ (১৯০১-১৯৪৭)

কল্যাণীশঙ্কর ঘটক

বাংলা 'প্রবন্ধ' শব্দটি ইংরেজি Essay শব্দের সমার্থক প্রতিশব্দ। কিন্তু ইংরেজিতে যাকে Essay বলে তার সঠিক প্রতিশব্দ বোধকরি বাংলায় নেই। কারণ বাংলায় ব্যবহৃত সন্দর্ভ, প্রবন্ধ,রচনা, সমালোচনা প্রভৃতি সংস্কৃতমূল শব্দগুলির দ্বারা Essay শব্দের গুণ-অর্থ ও মাত্রাগত ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ করা যায় না। আবার ফরাসী প্রাবন্ধিক Michael Do Montaigne-উদ্ভাবিত মননশীল ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রকাশের অভিনব শিল্পরূপ 'The Essai' (1588)-এর হাতধরে ইংরেজি Essay- ও উন্মেষ-ক্রমবিকাশ-কেন্দ্রিত বিবর্তনের ধারায় স্থানু হয়ে বসে নেই। ভাব ও বিষয়বস্তু-নির্ভর যুক্তি-বুদ্ধিগ্রাহ্য মননশীল রচনারূপে বিস্তার ও বৈচিত্র্যে তার অগ্রগতি হয়েছে ত্বরান্বিত। ফ্রান্সিস্ বেকন, আব্রাহাম কাউলে , স্যামুয়েল জনসন, অলিভার গোল্ডস্মিথ, চার্লস্ ল্যাম্ব, ডি কুইন্সি, লুই স্টিভেনসন, থোরেউ ওয়ালডেন, ইমারসন, সঁতেবভ, থিয়োফাইল গতিয়ের, আনাতোল ফ্রান্স, জেমস্ থারবার, ডরোথি পারকার, টি.এস. এলিয়ট প্রভৃতি ফরাসী- ইঙ্গ ও মার্কিনী বিদগ্ধ প্রাবন্ধিকগণের প্রয়াসে সমগ্র বিশ্বে আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আজ প্রবন্ধের স্থান-অপরিহার্য ও মর্যাদাপূর্ণ ।আজকের দুনিয়ায় প্রবন্ধ-মাধ্যমটি প্রকৃতার্থেই 'A playful kind of literature' (Dorothy Parker) হয়ে উঠেছে।

বাংলা প্রবন্ধের উন্মেষ বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ ধারার সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত এবং তা অবশ্যই ইংরেজি প্রবন্ধের গঠনশৈলী তথা রূপবন্ধের প্রভাবে উজ্জীবিত। বিষয়বস্তু কিম্বা ভাববস্তু-নির্ভর, তথ্য-তত্ত্ববহুল, যুক্তিগ্রাহ্য মননশীল রচনা তথা সমালোচনাকে বোঝানোর জন্য আধুনিক বাংলায় 'প্রবন্ধ' পদটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২)-শীর্ষক আলোচনায়।অন্যদিকে 'সংগ্রহ' ও 'সন্দর্ভ' শব্দের প্রথম ব্যবহার পাই মনীসী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) ও 'রহস্য সন্দর্ভ' (১৮৫৩) গ্রন্থদ্বয়ে। প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ'(১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) , 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৪) ও 'বিবিধপ্রবন্ধ' প্রবন্ধ শব্দের ব্যবহারকে কুণ্ঠাহীন ও অনায়াসলভ্য করে তুলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রবন্ধপুস্তক' (১৮৭৯) ও 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৭৭ , ১৮৯২) গ্রন্থদ্বয়ে এবং তাঁর অনুগামী প্রাবন্ধিকগণের অনেকের রচনাতেই [দ্র. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'নানা প্রবন্ধ' (১৮৫৫) এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধমন্ধলা (১৯২০)] 'প্রবন্ধ' শব্দটি একটি শিষ্টমাত্রা লাভ করেছে। অবশ্য বঙ্কিম-শিষ্য অনেক প্রাবন্ধিক 'প্রবন্ধ' স্থলে 'সমালোচনা', 'আলোচনা' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। যেমন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অদ্বৈত মঙ্গলের সমালোচনা'(১৮৯৬) ও 'সমালোচনামালা' (১৮৫৫) , যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'সমাজ সমালোচনা' (১৮৭৪) , অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'আলোচনা' (১৮৮২) প্রভৃতি। অতঃপর সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী'তে প্রবন্ধ পদটি গভীর অর্থদ্যোতক মহিমালাভ করে এবং চিরকালের জন্য বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অবশ্য পাশাপাশি 'সমালোচনা' ,'আলোচনা' প্রভৃতি পদের ধারাও অব্যাহত থাকে বিশেষত সাহিত্যগ্রন্থ সমীক্ষা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে। এই প্রেক্ষিতে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ উজ্জীবনী আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভারতপথিক রামমোহন রায়

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে রামমোহনের জন্ম। আর তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৩৩ এ। তাঁর জন্মের পর ২২৫ বছর পেরিয়ে গেছে। আমরা এখন বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে, একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করতে আর বেশি দেরি নেই। আজও কেন রামমোহন রায়ের চিন্তা, মতধারা ও কর্ম এত অর্থবহ — এটাই আমরা এখন বিচার করব।

❑ রামমোহনের মৃত্যু-শতবার্ষিকীতে সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দুমুসলমান খ্রীস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়।'

তাঁর যুগের ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও কুৎসিত লোকাচার কৈশোরেই রামমোহনের মনকে গভীরভাবে পীড়িত করে এবং তার প্রতিকারে পৃথিবীর সমস্ত প্রধান ধর্মের মূল সত্য অনুসন্ধানে রামমোহন প্রবৃত্ত হ'ন। বাংলা, সংস্কৃত, ফরাসী, আরবি, লাতিন, গ্রীক ও হিব্রুভাষাতে সুপণ্ডিত রামমোহন কৈশোরেই অধ্যয়ন করেন বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, কোরাণ, বাইবেল ও অন্যান্য মূলধর্মগ্রন্থ। ১৬ বছর বয়সে, যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তিনি চলে যান তিব্বতে, লামাদের কাছে অধ্যয়ন করেন বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ।

কোরাণ ও সুফী ধর্মপ্রচারকদের লেখা পড়ে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে রামমোহন একেশ্বরবাদের সপক্ষে তাঁর মতামত প্রথম প্রকাশ করেন ফারসি ভাষাতেই। ১৮০৪-০৫ খ্রীস্টাব্দে রামমোহনের প্রথম রচনা 'তুহ্ফাতুল্ মুওহ্হিদীন' অর্থাৎ একেশ্বরবাদীদের জন্য উপহার— পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয় মুর্শিদাবাদ থেকে। সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই পুস্তকটি রচিত — এই পুস্তিকা রচনার সমকাল পর্যন্ত রামমোহন ইংরেজি ভাষা ভালো করে জানতেন না।

রামমোহন যে ব্রাহ্ম-সভা প্রতিষ্ঠা করলেন, তার মূল ইচ্ছাপত্রে লেখা ছিল যে এখানে তাঁরাই সমবেত হতে পারবেন যাঁরা একেশ্বরবাদে ও বিশ্বমানবের সৌভ্রাত্রে বিশ্বাসী। ১৮৩১-এ ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে রামমোহন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেন যে পৃথিবীর সকল মানুষ এক মহাজাতিরই অংশ। তাই প্রয়োজন সব দেশের মানুষদের মধ্যে বাধামুক্ত মত বিনিময়ের সুযোগ ও ব্যবস্থা।

❑ রামমোহন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে অন্ধবিশ্বাস, মূঢ়তা ও লোকাচারের বিরুদ্ধে লড়তে হলে, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে যে একেশ্বরবাদের ও সর্বমানবের মিলনের সপক্ষে তা প্রমাণ করতে হবে আমাদের মূল শাস্ত্রেরই সাহায্যে। তাই ১৮১৫ থেকে ১৮১৭-র মধ্যে তিনি মাতৃভাষা বাংলাতে অনুবাদ করলেন বেদান্ত ও পাঁচটি প্রধান উপনিষদকে এবং বাংলায় ছেপে তাদের তিনি প্রকাশ করলেন, যাতে সব ধর্মেরই মূল কথা এক— এই মতধারা দেশের ব্যাপকতম মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে যাবার ভিত্তি রচিত হলো।

খ্রীস্টান পাদ্রিদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রামমোহন তিনটি প্রবন্ধ লিখলেন— Appeals to the Christian Public তাতে তিনি দেখালেন যে যীশু খ্রীস্টের মূল কথা হচ্ছে যে ঈশ্বর সব মানুষকেই সমান চোখে দেখেন। সব ধর্মেরই মূল কথা তাই। তাঁর এই বিশ্বমানবতাবাদী মতামত ভারতবন্ধু পাদ্রি অ্যাডামকে চিরদিনের মতো তাঁর বন্ধুতে পরিণত করল।

❑ সতীদাহ ও অন্যান্য কুৎসিত লোকাচারের বিরুদ্ধে রামমোহনের বিরামহীন অভিযান।

❒ রামমোহন ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মিরাৎ-উল-আকবরের প্রথম সংখ্যায় এপ্রিল ১৮২২। ঐ বছরেই ইংরেজ সরকার কর্তৃক সংবাদপত্রের কন্ঠরোধ । ১৮২৩ এর ১৭ মার্চ তার বিরুদ্ধে রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখের প্রতিবাদ ও মিরাৎউল আকবর বন্ধ করার সিদ্ধান্ত।

❒ ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করে নবাবী আমলের প্রশংসায় রামমোহন লিখছেন ' মুসলমান শাসকদের আমলে হিন্দুরা মুসলমান প্রজার সমান রাজনৈতিক সুযোগ পেতেন।'

❒ নারীমুক্তি ও রামমোহন।

❒ রামমোহনের প্রগতিবাদ ও আন্তজাতিক চিন্তা

— নেপল্‌সের গণবিদ্রোহ সমাজের বিরুদ্ধে(১১ আগস্ট, ১৮২১)

— দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে (ডিসেম্বর ১৮২৩)

— ১৮২০ স্পেনে গণবিপ্লব— তার সংবিধান রচনাকারীদের রামমোহনকে অভিবাদন

— ১৮৩০ এর ফরাসী বিপ্লবকে অভিনন্দন।

— ইংলন্ডে সংস্কার আন্দোলনকে সমর্থন।

❒ ১৯৯৮ তে যখন নতুন করে ভারতে ধর্মান্ধতা মাথা তুলছে, তখন দুইশত বছর আগে রামমোহনের চিন্তা ও প্রগতিশীল কাজকর্ম আমাদের অভিভূত করে। তাই রবীন্দ্রনাথ সঠিক ভাবেই বলেছেন যে রামমোহন চিরকালের মতোই আধুনিক।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

১৯১৪ থেকে ১৯৩৯ — দুটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা বৎসরের অন্তর্বর্তী কালের বাংলা কথাসাহিত্যে যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাতের ছবি নেই । তেমন কিছু নিশ্চয় প্রত্যাশিতও নয়, কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতের মাটিতে সংঘটিত হয় নি, যেমন অন্তত আংশিকভাবে হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে । তবু আমাদের আলোচ্য পর্বে যুদ্ধরত ব্রিটিশের উপনিবেশ এই ভারতবর্ষ যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত ছিল না । ১৯১৪ সাল থেকে বাংলা সাহিত্যে ; বিশেষত কথা সাহিত্যে, যুদ্ধের সেই পরোক্ষ প্রভাব, এবং আরো কিছু স্বতন্ত্র প্রবণতা চোখে পড়ে ।

আলোচ্য পঁচিশ বছরের গল্প উপন্যাসের প্রকাশ বহু বিচিত্র চিন্তা চেতনার তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে । এর ফলে এই পর্বের কথাসাহিত্য হয়ে উঠেছে সমকালীন দেশকাল তথা জীবনের যথার্থ দর্পণ । এখানে আলোচ্য পর্বের বিশেষ কয়েকটি প্রবণতা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে:

(ক) 'সবুজপত্র' — এর আবির্ভাব । এর- বিভিন্নরচনার মধ্য দিয়ে আধুনিক মনন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গুরুত্ব পেল । সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুন পক্ষের যেন ইঙ্গিত মিলল ।

(খ) কথাসাহিত্যে সেই নতুন পথ খুলে দিলেন রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্র'-এ ও 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হলো চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে ও যোগাযোগ । বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি থেকে অনেকখানি সরে এসে সমাজের

ওপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে পূর্বোক্ত উপন্যাসসমূহে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে যুক্ত হলো ব্যক্তির আত্ম-অন্বেষণ, 'সার্চ ফর আইডেনটিটি'। এর মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার নতুন মাত্রা যুক্ত হলো।

(গ) এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শরৎচন্দ্রের রচনাতেও প্রতিফলিত—বিশেষ করে নারীর ; — পতিতা ও বিধবার মধ্যেও মানবিক ব্যক্তি চেতনার স্পর্শ। — তাদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত। কিন্তু শরৎচন্দ্র সমাজকে অস্বীকার করেন নি, বিদ্রোহও করতে চান নি।

(ঘ) তবু একথা অবশ্য স্বীকার্য, শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যেও বাস্তব জীবনের মাটির স্পর্শ অনুভব করা যায় নিশ্চিতভাবে। এধরনের সাধারণ নরনারীর জীবন—বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে তেমন মেলে না। তাঁর চরিত্রগুলি মননশীল, অনেকাংশে অভিজাত।

(ঙ) শরৎচন্দ্রের এই বাস্তবতার লক্ষণ অন্যভাবে ফুটে উঠল 'কল্লোল'-এ (১৯২৩-২৯)। — কিছুটা রবীন্দ্র-বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। — কল্লোলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বাস্তবতাকে তাঁরা রচনায় দুটো দিক থেকে আনতে চাইলেন —

(১) দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষের চিত্রাঙ্কণ

(২) অবচেতনা তথা দেহচেতনার নিঃসংকোচ প্রতিফলন, এর মূলে মার্কস ও ফ্রয়েডের প্রভাব। শুধু তাই নয়, বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবও সক্রিয় — হামসুন বোয়ার, লরেন্স, গোর্কি প্রমুখের। কল্লোলের লেখকদের রচনায় নিজস্ব অভিজ্ঞতার যোগ অল্পই। আর সেকারণেই এঁদের দৃষ্টিতে অতিরেক, উগ্রতা— এও এক ধরনের রোমান্টিকতা —' inverted romanticism' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— দারিদ্র্যের আস্ফালন ও লালসার অসংযম। — তবু 'কল্লোল'-এর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। আধুনিকতার পথে এদের পদক্ষেপ খুব দৃঢ় হয়তো নয়। তবু এগিয়ে যাবার ইচ্ছায় আন্তরিকতা আছে।

(চ) প্রসঙ্গত বলা চলে, যৌন মনস্তত্ত্বের জটিল রহস্যের নিরাসক্ত অথচ একান্ত বাস্তব চিত্রাঙ্কণে জগদীশ গুপ্ত ও পরে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সাফল্য প্রশ্নাতীত।

(ছ) কল্লোলপন্থীদের রচনায় জীবন—অভিজ্ঞতার অভাব তথা আংশিক কৃত্রিমতার বিপরীত এক প্রবাহ দেখা দিল তিরিশের দশকে। মৃত্তিকাস্পর্শী জীবনের সহজ বাস্তবতার সজীব ঘ্রাণ পাওয়া গেল তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের রচনায়। স্মরণীয় চৈতালী ঘূর্ণি, কালিন্দী, পথের পাঁচালী এবং আরণ্যক ইত্যাদি উপন্যাস ও বিভিন্ন ছোটোগল্প। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' গ্রামজীবনের অর্থনৈতিক দুর্গতি ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার মেলবন্ধনের দিক থেকে স্মরণীয় সৃষ্টি।

(জ) উপন্যাসে মননধর্মী জীবনদৃষ্টি প্রতিফলনের দিক থেকে ধূর্জটিপ্রসাদের ' অন্তঃশীলা ' অন্নদাশঙ্করের এপিক-তুল্য 'সত্যাসত্য' ও গোপাল হালদারের 'একদা' বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। আলোচ্যপর্বের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ যে আত্ম- অন্বেষণ-সমষ্টি পূর্বোক্ত তিনটি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র যথাক্রমে খগেনবাবু, বাদল ও অমিত -এর মধ্য দিয়ে তীক্ষ্ণরূপ পেয়েছে। আলোচ্য অর্থে যুদ্ধোত্তর দ্বিধা সংশয় ও জিজ্ঞাসার অস্থিরতায় ওই সব চরিত্র বিভ্রান্ত। কিন্তু তবু একান্ত নেতিবাচক হতাশা ও বিষণ্ণতার চেতনাই শেষ কথা নয় — বিশেষত 'সত্যাসত্য'-এর সুধী ও 'একদা'-র অমিতের মনে মানব প্রত্যয়ের অনুভব পাঠককে প্রাণিত করে উজ্জীবনের আশায়। প্রসঙ্গত বলা চলে, 'একদা-'র সমকালেই প্রকাশিত তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতাতেও স্বদেশপ্রেম তথা রাজনৈতিক ভাবাদর্শের চিত্রাঙ্কণের সঙ্গে অস্তিবাচক জীবনবোধের প্রশংসনীয় প্রকাশ ঘটেছিল।

আলোচ্য পর্বের পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে ও উত্তরপর্বে নানা নিদারুণ বিপর্যয় ও বিষণ্ণতার গাঢ়তর অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে রচিত কথাসাহিত্যে সেই প্রত্যয়ী জীবনবোধ ও মূল্যচেতনার আলো আরো স্তিমিত হয়ে এসেছে।

বরাক উপত্যকা থেকে

গায়ত্রী নাথচৌধুরী

আসামের সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবে বিগত শতাব্দীর শেষে বৃহত্তর বঙ্গের যে অংশটি জুড়ে দেওয়া হয়েছিল সে অংশের মানুষ মূলত বাঙালি ।সুপ্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতির পুরোনো অংশীদার এবং উত্তরাধিকারী।এই ভূখণ্ডের মূল ভাষা বাংলা, লোককথনে তার ব্রাত্য রূপ প্রচলিত।বরাক উপত্যকা নামটি আমরা স্বাধীনতার কাছ থেকেই পেয়েছি। স্বাধীনতার পূর্বে বরাক উপত্যকার কিছু অংশ সহ আসামের কিছু অংশ নিয়ে যে বৃহত্তর কাছাড় রাজ্য ছিল তার নাম ছিল হিড়িম্বা রাজ্য।ষোড়শ শতকের শেষভাগে এই রাজ্যের রাজা ছিলেন তাম্রধ্বজ।তাঁর রানী চন্দ্রপ্রভার প্রভাবে কাছাড়ের হিড়িম্বা রাজ্যের রাজভাষা হয় বাংলা। বাংলা ভাষায় কাব্য সাহিত্যে চর্চার ধারা এই বরাক উপত্যকায় যার চেষ্টা ও অনুপ্রেরণায় প্রথম আরম্ভ হয়েছিল তিনি রাণী চন্দ্রপ্রভা। শিলচর মহিলা কলেজের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. কৃষ্ণা দত্ত তাঁর 'বরাক উপত্যকার স্মরণীয়া বরণীয়া মহিলা' গ্রন্থে রানী চন্দ্রপ্রভার কথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন— এই মহীয়সী মহিলা বাংলাভাষা সাহিত্য প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন । বর্মণ রাজাদের মাতৃভাষা বাংলা নয় তবু তাহারা বাংলা সাহিত্য চর্চার অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিলেন।

গবেষক অধ্যাপক ড. বিশ্বতোষ চৌধুরী তাঁর 'বরাক উপত্যকায় বাংলা কথাসাহিত্য 'প্রবন্ধে লিখেছেন ১৭৩০ খ্রীস্টাব্দে কবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি রাজা সুরদর্প নারায়ণের রাজত্বকালে রাজমাতা চন্দ্রপ্রভার আদেশে বাংলা পয়ার ছন্দে অনুবাদ করেন 'নারদীয় রসামৃত' । বাচস্পতি মহাশয়ের কাব্য থেকেই আমরা জানতে পারি তিনি চন্দ্রপ্রভা দেবীর আজ্ঞায় এই অনুবাদে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

' নারাদি পুরাণ পষ্ঠ করিতে পয়ারে
দেবী চন্দ্রপ্রভা আজ্ঞা দীলত আমারে। '

এর দীর্ঘদিন পর যে মহিলা সাহিত্যিকের উল্লেখ আমরা পাই তিনি হলেন কাছাড়ের তথা আসামের প্রথম মহিলা কবি কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরানী। তাঁর সম্পর্কে ড. কৃষ্ণা দত্তের লেখায় পাওয়া যায় 'কৃষ্ণপ্রিয়ার জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। তিনি কাছাড় তথা আসামের প্রথম মহিলা কবি।··· ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে তার প্রথম গ্রন্থ 'নারীমঙ্গল' প্রকাশিত হয়'।

কাছাড় তথা আসাম থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা মহিলা মাসিক পত্রিকার নাম 'বিজয়িনী'। এই পত্রিকার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে শ্যামানন্দ চৌধুরী লিখেছেন— বিজয়িনী বরাক উপত্যকার মহিলা সমাজের প্রথম মুদ্রিত মুখপত্র। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। পত্রিকাটির সম্পাদিকা ছিলেন বিশিষ্ট জননেতা অরুণকুমার চন্দের সহধর্মিনী শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ। শিলচর নারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) 'বিজয়িনী' প্রকাশিত হয়।এই পত্রিকা প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নারী জাতির মধ্যে সার্বিক চেতনা জাগিয়ে তোলা।কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিজয়িনী'র নামকরণ

করেছিলেন। মহিলা সমাজের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে নামকরণের জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি পত্রিকাটির নামকরণ করে একটি আশীর্বাণীও লিখে দেন :

'হে বিধাতা
আমারে রেখো না বাক্যহীনা
রক্তে মোর বাজে রুদ্রবীণা'

এই আশীর্বাণীটি প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হতো। বিজয়িনীর গুণগত মান অনুধাবন করতে গেলে পত্রিকাটির বিভিন্ন সংখ্যার সূচীপত্রের দিকে নজর দিতে হবে। কবিতা, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, বিশেষ সংবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে বিজয়িনীর অবয়ব অলংকৃত করা হতো। প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু ছিল মূলত ধর্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও পুরাণ। এ ছাড়া ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পৌরাণিক প্রভাব', 'বেদের কথা' ইত্যাদি মননশীল প্রবন্ধ। 'সরস্বতী', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।' (শারদীয়া 'গণ আরশি' ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ)

অনুমান করা যায় মহিলা মাসিক পত্রিকাই মহিলাদের স্বাধীনতাপূর্ব বরাক উপত্যকার আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছিল। এই পত্রিকায় সম্পাদিকা জ্যোৎস্না চন্দ, বরাক উপত্যকার সাহিত্য চর্চার ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের পত্নী মালতী শ্যাম, রায়সাহেব দীননাথ দাসের কন্যা অনিমা দাস প্রমুখ মহিলারা নানাধরনের লেখা লিখতেন বলে জানা যায়। নানা ধরনের তথ্য ভিত্তিক প্রবন্ধ এবং ছোটো ছোটো কবিতা বা পদ্য, দু'একটি গল্প এ পর্যায়ে লেখা হয়েছিল। শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্যা শ্রীমতী রানী চন্দের আত্মীয় ছিলেন, যিনি রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চা জগতের একটি সুপরিচিত নাম, কিছুকাল পূর্বে যিনি লোকান্তরিতা হয়েছেন। নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম ও মালতী শ্যামের কন্যা রুচিরা শ্যাম আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের এক পরিচিত নাম।

এর পরবর্তী কালে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ এসে লাগে বরাক উপত্যকায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ অঞ্চলের সামাজিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। তরুণ প্রজন্ম স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার হয়ে ওঠেন। স্বাভাবিকভাবেই এ সময় সাহিত্য চর্চার অবকাশ সংকুচিত হয়ে ওঠে।

এর মধ্যেও বিস্মৃতির অতল থেকে খুঁজে পাওয়া যায় একটি নাম হেনা ব্যানার্জী। তিনি লাঠি-খেলা, ছোরা-চর্চার সঙ্গে-সঙ্গে নাট্যচর্চায়ও আগ্রহী ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি কিছু ছোটোগল্পও লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর মেয়ে অরুন্ধতী চন্দ নাটক গল্প ইত্যাদি লিখেছেন। বর্তমানে তাঁর পুত্রবধূ বিজয়া কর (চন্দ) ছোটোগল্প লিখছেন।

বরাক উপত্যকার মহিলা সাহিত্যিক ও গল্পকারদের স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ের রচনার বিশেষ কোনো আলোচনার অবকাশ নেই যদিও তবু এ কথা অস্বীকার করা যায় না সাহিত্য রচনার পটভূমি তৈরি হয়েছিল সেই সুদূর অতীতেই। সেই সময়কার মহিলা লেখকদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় সাহিত্য চর্চার যে চারাগাছটি রোপিত হয়েছিল তাই-ই বর্তমানে শাখা প্রশাখা মেলে মহীরুহ হবার প্রত্যাশায় দিন গুনছে। আজ বরাক উপত্যকার মহিলারা গল্প, কবিতা নাটকই শুধু লিখছেন না তারা মাসিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করে যাচ্ছেন নিখুঁতভাবে। মহুয়া চৌধুরী, ছবি গুপ্তা, শিবানী ভট্টাচার্য, নিবেদিতা চৌধুরী, কৃষ্ণা চৌধুরী, দিপালী দত্তচৌধুরী প্রমুখ অনেকেই গল্প-কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও যুক্ত আছেন। অন্ধকার দূর করার জন্য প্রদীপ জ্বালতে হয়। কিন্তু তারও আগে থেকে শুরু সলতে পাকানোর কাজ। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের মহিলা সাহিত্যিকরা সেই সলতে পাকানোর কাজ সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করে গেছেন। তার ফলশ্রুতিস্বরূপ আজ আমরা বরাক উপত্যকায় মহিলা সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্যলাভ করছি।

প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বের আধুনিক কবিতার ছন্দ

চৈতন্য বিশ্বাস

আধুনিক সাহিত্যের অনেকগুলি শাখার মধ্যে কাব্যশাখাটি অন্যতম। প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে এই শাখাটিই মানুষের সাহিত্যরসের পিপাসা মিটিয়ে এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে একদিকে যেমন যুগোপযোগী বহু সাহিত্য শাখার উদ্ভব ঘটেছে, তেমনি কাব্যশাখাটিরও পরিবর্তন ঘটেছে বিস্তর, যেমন উপকরণে , তেমনি উপস্থাপনায় । ঈশ্বর গুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে পরিবর্তন, মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, তা পুরাতনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি; কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বাংলা কবিতার বিষয়ে এবং রূপাঙ্গিকে পরিবর্তন এতটাই এল যে মূলস্রোতের সঙ্গে তাকে আর মেলানো সহজ হলো না। এই পরিবর্তিত কবিতাকেই আমরা আধুনিক কবিতা নামে চিহ্নিত করেছি। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র অন্যতম সংকলক আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর সংকলনের ভূমিকায় আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ - পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তি প্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।'

গদ্য ভাষায় কবিতা লিখলে কবিতার জাত যায় না। তবে সে গদ্যে ছন্দের দোলাটুকু থাকা চাই। আধুনিক কবিতার অন্যতম গবেষক দীপ্তি ত্রিপাঠী আধুনিক কবিতার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করতে গিয়ে যে বারোটি লক্ষণের কথা বলেছেন, তার মধ্যে দু'টি এখানে উদ্ধৃত করছি : এক. 'বাকরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ। ··· গদ্য, পদ্য ও কথ্য ভাষার ব্যবধান বিলোপের চেষ্টা' দুই. ' গদ্য ছন্দের ব্যবহার।' এই গদ্যছন্দে ছন্দের নিয়ম থাকে না, অথচ ভঙ্গিটুকু থাকে। ধ্বনিগত স্পন্দনকে আড়াল করে ভাবগত স্পন্দনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় এই গদ্যছন্দে। তাই রবীন্দ্রনাথ একে 'ভাবের ছন্দ' বলেছেন। ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ছন্দ পরিক্রমা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৯) এই ছন্দ সম্পর্কে বলেছেন, ' গদ্য কবিতার ভাষায় ভাব বিন্যাসের অনুযায়ী পরিমিত ধ্বনিবিন্যাস থাকে না বটে, কিন্তু তাতে ভাব স্পন্দন অনুযায়ী একপ্রকার অনতিপ্রচ্ছন্ন বা অনতিস্ফুট ধ্বনিস্পন্দন অনুভূত হয় ; তাই গদ্য কবিতার ভাষাকে বলা যায় স্পন্দমান গদ্য (rhythmic prose) ।'

রবীন্দ্রনাথ এই স্পন্দমান গদ্য বা গদ্যছন্দকে ব্যবহার করে শেষ জীবনে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। সেসব কবিতার আবেদন পাঠকের কাছে কম নয়। তাঁর গদ্যছন্দে লেখা বিখ্যাত কবিতা 'আমি' —

' আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হ'য়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্ব'লে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, 'সুন্দর'—
সুন্দর হলো সে।' . . .

— এ কবিতায় ছন্দ নেই ভাবাই যায় না! এরকম গদ্যছন্দের কবিতা রবীন্দ্রকাব্যে বহু আছে।

রবীন্দ্রসমসাময়িক আধুনিক কবিদের অনেকেই এই রকম স্পন্দমান গদ্যে কবিতা লিখেছেন। আবার কেউ কেউ তা পারেন নি; অথবা সচেতন ভাবেই এই পথ বর্জন করে নিরেট গদ্যে কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এঁদের কবিতার দৌরাত্ম্যেই যে সেকালের পাঠক আধুনিক কবিতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। বিষয় দুর্বোধ্য বা জটিল হলেও ভাষা ও ছন্দ-মাধুর্যের দ্বারা পাঠককে টানবার সম্ভাবনা যেটুকু ছিল, তা এই গদ্যপন্থী কবিরা নষ্ট করেছেন।

আধুনিক কবিদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়, তার মধ্যে একটি হলো এই যে, আধুনিক কবিরা নিজেদের অর্জিত বিদ্যা, অবলম্বিত মতাদর্শ ও ব্যক্তিগত আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কবিতা লিখে গিয়েছেন, পাঠকদের সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করেন নি। তাই যা তাঁরা লিখেছেন তা' সমস্তই সাধারণ পাঠকের আস্বাদনের বিষয় হয়ে ওঠে নি। সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও এই সব কবিতাকে ভালোবাসতে পারেন নি। সমমতাদর্শে বিশ্বাসী এবং এই জাতীয় কবিতার চর্চাকারী মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ হয়তো এই সব কবিতার প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে থাকবেন।

সূচনা লগ্নে যাঁরা আধুনিক কবিতাচর্চায় মগ্ন হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, অথবা ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে খুবই সচেতন। তাই, পাশ্চাত্য সাহিত্যের আধুনিকতার গতি প্রকৃতিকে অনুসরণ করে যে ধরনের কবিতা তাঁরা লিখলেন, তার মর্ম উপলব্ধি করা ইংরেজি না-জানা বা ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়হীন পাঠকের পক্ষে সম্ভব হবে কেন? অদীক্ষিত পাঠকদের কাছে তাই গদ্য কবিতার কোনও আকর্ষণ ছিল না।

ছন্দকে অবলম্বন করলে যে কবিতার আধুনিকতা ক্ষুণ্ণ হয়, বা তার ভাব ঘনত্ব হারায়, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বরং দক্ষ কবি ছন্দের বাঁধা পথেই যুগোপযোগী জটিল ভাবকে সহজে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন। সমর সেনের কবিতা: 'তুমি যেখানেই যাও, /কোনো চকিত মুহূর্তের নিঃশব্দতায়/ হঠাৎ শুনতে পাবে/ মৃত্যুর গম্ভীর, অবিরাম পদক্ষেপ।/ আর , আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে?/ তুমি যেখানেই যাও/ আকাশের মহাশূন্য হ'তে জুপিটারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি/ লেডার শুভ্র বুকে পড়বে।' জানিনা এ কবিতার ভাব কত সহজে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু দিনেশ দাসের কবিতা : ··· 'নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি/ তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে?/ চাঁদের শতক আজ নহে তো/ এ যুগের চাঁদ হ'লো কাস্তে! / ইস্পাতে কামানেতে দুনিয়া / কাল যারা করেছিল পূর্ণ, কামানে-কামানে ঠোকাঠুকিতে/ আজ তারা চূর্ণবিচূর্ণ। ···' — এর ভাব যে সহজেই বোঝা যায় এবং এ-ও যে সার্থক আধুনিক কবিতা তা' স্বীকার করতেই হবে ।জীবনানন্দ দাশ , সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত আধুনিক কবিদের শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিতাগুলি তো নিয়মিত ছন্দেই লেখা। বড়োজোর পদবিন্যাসে বা চরণ রচনায় তাঁরা কিছু বৈচিত্র্য এনেছেন। সেখানে, রীতির ক্ষেত্রে মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত বা দলবৃত্ত রীতির কোনও একটিকে অবলম্বন করেছেন।

কিন্তু ঐ পর্বের সকল আধুনিক কবিই সেটা করতে চান নি। অথবা করতে পারেন নি।

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যাঁরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ব'লে অহংকার করি, যাঁরা গদ্য কবিতার অনুকূলে বক্তব্য রাখি, কালেভদ্রে দু'টি-একটি গদ্য কবিতা লিখিও , তাঁরাও মনে-প্রাণে গদ্য কবিতাকে পছন্দ করি কি? বলতে দ্বিধা নেই , প্রাক্-স্বাধীনতা-পর্বের কাব্য-চর্চায় যাঁরা ছন্দকে বর্জন করেছিলেন, তাঁদের দু-একজন বাদে সকলেই তখনকার এবং এখনকার বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে বর্জিত ।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যপাঠের ভূমিকা

চিত্তরঞ্জন লাহা

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য লোকায়ত জীবনের কাব্য। এ কাব্যে কৃষ্ণের পৌরাণিক প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু পৌরাণিক আভিজাত্য নেই। রাধাও অনভিজাত এবং কাব্যে আদিরসের ভিয়ান যেমন গাঢ় তেমনি কটু। তবু এ কাব্যের ভূখন্ড থেকে পুরাণ সর্বাংশে বহিষ্কৃত নয়। পৌরাণিক চালচিত্রে অপৌরাণিক কাব্য-প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন কবি।

কাব্যের প্রারম্ভে পুরাণের প্রভাব সর্বাধিক অনুভূত। জন্মখন্ডটি ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের ছায়ায় রচিত। তবে কৃষ্ণবধের নিমিত্ত কংস কর্তৃক গোকুলে যমলার্জুন প্রেরণের সংবাদ। (' তার কাছে যমল আর্জুন পাঠাইল') পুরাণ কর্তৃক সমর্থিত নয়। তাছাড়া জন্মখন্ডে কৃষ্ণ বলরামের জন্মকাহিনী যে পরিমাণে পৌরাণিক, রাধার জন্মকথা সেই পরিমাণেই অপৌরাণিক। ভাগবতের 'অনয়ারাধিত নূনং ভগবান হরিরীশ্বর' শ্লোকে রাধার অস্তিত্ব তর্কাতীত নয়। বিষ্ণুপুরাণ বা হরিবংশে রাধার সাক্ষাৎ পাই না। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার উল্লেখ পাই, কিন্তু সেখানে তাঁর বংশপরিচয় সম্পূর্ণ পৃথক। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে রাধা বৃষভানুর মহিষী কলাবতীর কন্যা। পদ্মপুরাণের মতে রাধার মাতা কীর্তিকা। বড়ু চণ্ডীদাসের মতে রাধার জন্ম সাগরের ঘরে, পদুমার উদরে (' তে-কারণে পদুমা উদরে। উপজিলা সাগরের ঘরে')। রাধার এই বংশ পরিচয় সম্পূর্ণ অপৌরাণিক। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পুরাণের প্রসূতি-আগারে এ কাব্যের নায়ক জন্মগ্রহণ করলেও এ কাব্যের নায়িকার জন্মভূমি নিজস্ব কল্পনাভূমি।

বৃন্দাবন খণ্ডে রাসের বর্ণনা ভাগবতের রাসলীলাকে অনিবার্যরূপেই স্মরণ করায়। তবে এখানেও সময়ের পার্থক্যটুকু লক্ষণীয়। ভাগবতে রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছে শারদোৎফুল্ল রজনীতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছে বসন্তকালের দিবাভাগে। শরৎ রজনীর স্নিগ্ধ রাসে বসন্ত দিনের প্রগলভ উন্মাদনার সঞ্চার করার জন্যই এই কালাতিক্রমণ কিনা কে জানে। স্বয়ং জয়দেবও বাসন্তী রজনীকেই রাস উৎসবের উপযুক্ত লগ্ন বলে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর গীতগোবিন্দ কাব্যে।

যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ ব্যাপার বা যমুনাখণ্ড অন্তর্গত কালীয়দমন খন্ডে কালীয়দমন বৃত্তান্তটি অবশ্যই পৌরাণিক, তবে এখানেও পুরাণের ঘটনাক্রম বিপর্যস্ত। ভাগবতে কালীয়দমন ও বস্ত্রহরণের পরে রাস-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নায়ক অতখানি ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। এ কাব্যের প্রথমেই রাস, তারপর কালীয়দমন এবং সর্বশেষে বস্ত্রহরণ। বলরামের 'দশাবতার স্তবে'ও অবতার সমূহের পারম্পর্যে পুরাণের সঙ্গে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বরাহ পুরাণে কৃষ্ণের পর বুদ্ধ ও কল্কী অবতারের কথা বলা হয়েছে।

মৎস্য ঃ কূর্মোবরাহশ্চ নরসিংহোহথ বামনঃ।
বামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধ ঃ কল্কী চ তে দশ।।

বলরাম কিন্তু বুদ্ধএবং কল্কীর পরে, অর্থাৎ সর্বশেষে কৃষ্ণ অবতারের কথা উল্লেখ করেছেন।

ভাগবতে গোপীরা কৃষ্ণলাভের জন্য কাত্যায়নী পূজা করেছিলেন। 'রাধা বিরহে' দেখি যে বড়াইও রাধাকে কৃষ্ণ লাভের জন্য চণ্ডীপূজার উপদেশ প্রদান করেছেন।

'বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা করি মানিআঁ
তবেঁ তারে পাইবে দরশনে।'

কিন্তু রাধাবিরহে যেভাবে মথুরাগমন করেছেন তার সঙ্গে ভাগবতের বর্ণনার মিল নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় রাধাকে পরিত্যাগ করে মথুরায় প্রস্থান করেছেন; ভাগবতে অক্রুর এসে কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

পুরাণ শুধু যে এই কাব্যের কাহিনীর কাঠামোতে অল্পবিস্তর রিপুকর্ম করেছে তাই নয়, এই কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের উক্তিপ্রত্যুক্তিতেও পুরাণ প্রসঙ্গ বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে। এ ব্যাপারে বড়ু চণ্ডীদাসের পুরাণজ্ঞান ও পুরাণ-প্রীতি সপ্তদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা কবি দৌলৎ কাজীর সঙ্গে উপমিত হবার দাবি রাখে। ষোড়শ শতাব্দীর কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তীও তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে পুরাণপ্রীতির নিদর্শন দিয়েছেন, অশিক্ষিতা ব্যাধকন্যার মুখেও পুরাণের কথা পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গেই উচ্চারিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী কবিমাত্রেই প্রাচীন পুরাণ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে বড়ু চণ্ডীদাসের পারদর্শিতাও প্রশংসার যোগ্য। রাধাকৃষ্ণের রসকলহে উভয়েই পৌরাণিক প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছে নিজ নিজ বক্তব্যের সমর্থনে। অগম্যাগমনে আসক্ত কৃষ্ণ পুরাণের দোহাই দিয়েছে। রাধা কৃষ্ণের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে ঐ একই পুরাণের প্রসঙ্গ তুলে।

অবশ্য স্বীকার্য যে, এই কাব্যে কবি রাধা ও কৃষ্ণের যে গোত্র পরিচয় প্রদান করেছেন তাতে তাদের মুখে এইরূপ কথা কিছুটা প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধা মুখে কৃষ্ণ পুরাণের কথা যতই বলুক বা কৃষ্ণ নিজ পৌরাণিক আভিজাত্য প্রতিষ্ঠায় যতখানি প্রয়াসই করুক না কেন তাদের আচরণগুলি যে পুরাণসম্মত নয় সে কথা প্রমাণ করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের বেশ কিছু ছত্রের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ পরিদৃষ্ট হয়। গীতগোবিন্দের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাদৃশ্যও প্রকট। ড. সুকুমার সেনের ভাষায় ' জয়দেবের কাব্যে যেমন গানগুলি শ্লোকের দ্বারা কাহিনীশৃঙ্খলে গাঁথা এবং বারো সর্গে বাঁধা বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যেও তেমনি গানগুলি ছোটো ছোটো শ্লোক-মালিকায় সংযুক্ত এবং কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত।' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবন-খণ্ডে ও বিরহ (খণ্ডে) গীতগোবিন্দের বহু পদের ভাবানুবাদ (এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ) পরিলক্ষিত হয়।

আদিমধ্যযুগের সুস্পষ্ট নিদর্শনটি প্রসঙ্গে এই সব কথা মনে রেখে আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যপাঠের বিস্তারিত প্রেক্ষাপট রচনায় ব্রতী হব।

ব্রিটিশ শাসনকালীন বাংলা সাহিত্য : সাময়িক পত্রের ভূমিকা

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

১. সাময়িক পত্রের প্রকৃতি : Periodical — একটা সময়সীমা জুড়ে এদের অস্তিত্ব— এই সময়সীমা নির্ধারিত হয় পত্রিকার আয়ুষ্কালের সীমানা দিয়ে— অর্থ-সামর্থ্য, লোকবল, দক্ষ office work নির্ধারণ করে এই আয়ুষ্কালকে— প্রকৃতিগতভাবে এই সমসাময়িকত্বের জন্যই সাহিত্যের এক এক আবর্ত

বা আলোড়ন ক্রিয়ার সঙ্গে এদের সম্পর্ক বেশি।
— পত্রিকা পাক্ষিক-মাসিক-ত্রৈমাসিক-ষান্মাসিক হবে তা নির্ভর করে কোন্‌টায় সব দিক বজায় করে Calculation ঠিক থাকবে তার হিসাব-নিকাসের ওপর।

২. সাময়িকপত্র কিভাবে সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রণ করে:

ক. সংযোগসাধন করে— ব্যক্তি নিজ সামর্থ্যে এই কাজ দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে না।
পত্রিকা তার প্রাতিষ্ঠানিক সত্তা ও machinary দিয়ে এ কাজ সাফল্যের সঙ্গে করতে পারে।— সংযোগসাধন নতুন কালধর্ম গড়ে ওঠার পথে অন্যতম বৈপ্লবিক কাজ।

খ. পৃষ্ঠপোষকতার কাজ— নবীন লেখকদের রচনা প্রকাশ করে তাকে আশ্রয় দেয়, লালন করে ও Campaign এর সাহায্যে তাকে পরিণত লেখক হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

গ. Common literary programme তৈরি— ঐক্যমতের পটভূমি রচনা করে ঘোষিত বা অঘোষিত আদর্শের অনুকূলে— কেন্দ্রীয় যুগন্ধরের ব্যক্তিচ্ছটা ছাড়াও সমমতানুসারী লেখকদের নৈপুণ্য ও পত্রিকার শক্তি ও গুণবত্তা বিচারের একটা Criteria.

ঘ. গ.এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে motivation করা— সাহিত্য-শিল্পের স্বার্থ ছাড়াও গোষ্ঠী-পত্রিকার অন্য motivation থাকতে পারে। ১. গোষ্ঠী ভাবনার পক্ষে। ২. জাতীয়তার অভিমুখে ,৩. ধর্মীয় ভাবোন্মাদনার স্বার্থে , ৪. প্রাতিষ্ঠানিকতার পক্ষে বা বিপক্ষে।

ঙ. সাহিত্য ও সমালোচনার inter-action কে চাঙ্গা রাখা। এই যোগ্যতায় সাধারণ পত্রিকা research journal এর মর্যাদা পায়।

৩. ইতিহাসের গতিক্রম ও নির্বাচিত সাময়িকপত্রের ভূমিকা :

সংবাদপ্রভাকর— বিবিধার্থ সংগ্রহ— বঙ্গদর্শন— তত্ত্ববোধিনী— ভারতী,সাধনা,প্রবাসী, বিচিত্রা— সবুজ পত্র— আর্যদর্শন, নারায়ণ, সচিত্রশিশির— কল্লোল, শনিবারের চিঠি— পরিচয়,অগ্রণী, অরণি (মোট ৯টি স্তর বিভাজন)

৪. প্রধান প্রধান দিকনির্দেশক পত্রিকা :

বঙ্গদর্শন— সবুজপত্র— পরিচয়

৫. বিশ্লেষণ (অপ্রধান পত্রিকা)

সংবাদ প্রভাকর : ১. নবীন লেখকদের জায়গা করে দিয়ে প্রথম লেখক বলয় তৈরির চেষ্টা ২. ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সমকালীন জীবনপ্রবাহ নিয়ে কটাক্ষপাত— আধুনিক সাহিত্যের উপাদান বিষয়ে দিক্-নির্দেশ।

বিবিধার্থ সংগ্রহ : সাহিত্য পত্রিকার মান অর্জনের প্রয়াস—'বুক রিভিউ' পন্থার প্রবর্তন, যা থেকে সমালোচনা শাস্ত্রের সংগঠিত হওয়ার পথ পাওয়া।

তত্ত্ববোধিনী : ১.যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ সাহিত্যের বনিয়াদ রচনা ২. নীতিশাস্ত্র ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সূত্রপাত, যার ফলশ্রুতি উত্তরকালের রামেন্দ্রসুন্দর— জগদীশচন্দ্র— জগদানন্দ রায় ৩. ধর্মমূলক আলোচনার অভিঘাতে হিন্দুত্বের inter-action এবং পুনরুজ্জীবনবাদের অভিমুখিতা।

ভারতী-সাধনা-প্রবাসী-বিচিত্রা: ১. রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রস্ফুটনের সহায়ক, পরে বিচরণক্ষেত্র। ২. minor কবি-কথাসাহিত্যিকদের প্রকাশক্ষেত্র— বিষয়গত বহুদর্শিতা ৩. ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কর্মের প্রমাণবাহী।

আর্যদর্শন—নারায়ণ - সচিত্র শিশির : রবীন্দ্রবিরোধিতার ক্ষেত্র।

কল্লোল-শনিবারের চিঠি ১. আধুনিক সাহিত্যের চর তৈরি ২. য়ুরোপীয় সাহিত্যের গ্রাহকত্ব - নব সাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান ৩. নবীন সাহিত্যিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং common programme এর দিকে যাবার প্রয়াস ৪. বড়ো ব্যক্তিত্বের তালিম ছেড়ে গুচ্ছ-সৃষ্টির দিকে ঝোঁক।

৬. মুখ্য পত্রিকা — বঙ্গদর্শন : ১. পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য পত্রিকার আত্মপ্রকাশ - সৃজনশীল রচনা, Serious প্রবন্ধ, ফিচার, বুক রিভিউ ইত্যাদি, ২. সংঘচেতনার সূচনা, ৩. Schooling - জাতীয়তার সম্প্রচার - ইতিহাস চর্চা, য়ুরোপীয় দর্শনের অনুশীলন, নব্য হিন্দুত্বের প্রচার, ৪. রুচি ও শিল্প-স্পৃহার সংগঠন, ৫. প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিল, উচ্চাঙ্গ-সাংবাদিকতার মডেল পাওয়া গেল।

সবুজপত্র : ১. গতানুগতিকতায় আঘাত, ২. নবীনদের নিয়ে আন্দোলন, ৩. এলোমেলো রচনার বদলে রুচিশীল-সংযত-বুদ্ধিদীপ্ত রচনার জন্য অনুশীলন, ৪. Identification এর দাবি (স্বাতন্ত্র্যের শিক্ষা)

৫. রবীন্দ্র ভাবনায় modification আনা, ৬. রবীন্দ্রনাথেরই দ্বিতীয় Platform বিবেচনায় বিরোধীদের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠা।

পরিচয় : ১. সংঘচেতনা (বামপন্থী ও জাতীয়তাবাদীরা মিলে) থেকে উদ্ভূত হলো common programme যা সাহিত্যের ধরন-ধারণ বদলে দিল, ২. কমিউনিস্ট চিন্তাবিদরা সংহত হলেন, ৩. নিজেদের মধ্যে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে শিল্প তর্ক করলো বামমার্গীয় সাহিত্য চিন্তা।

বিভূতিভূষণের 'আহ্বান'

জয়ন্তকুমার হালদার

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে নতুনতর পথে যাত্রা করে নতুন ধরনের ছোটোগল্প লেখা শুরু হয় কল্লোল, কালিকলম ও প্রগতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে।

বাংলা ছোটোগল্পের পালাবদলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে বিশ্বযুদ্ধ ঔপনিবেশিক শাসন এবং রবীন্দ্রসমকালে বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদ, বিশ্বযুদ্ধের কারণে যুবসমাজের বেকারত্ব। আর্থিকসঙ্কট, মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা কল্লোল সমকালীন লেখকদের বিদ্রোহী করে তুলেছিল, আর অনুবাদের সূত্রে গৃহীত হ'লো মার্কসীয় চিন্তাভাবনা, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, প্রেম যৌনতা ও মনস্তত্ত্বের ব্যবহার। ধীরে ধীরে ছোটোগল্পের বিষয় ও রূপ বদল হতে শুরু করল।

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের গল্পে প্রকাশ পেয়েছে নগরচেতনা, অবশ্য শৈলজানন্দ ছাড়া মূলত যাঁরা কল্লোলীয় লেখক তাঁরা নগর জীবনের চিত্রকর।

কল্লোল যুগের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকরা নিম্নবিত্ত মানুষদের নিয়ে গল্পলেখা শুরু করলেন। এঁদের গল্পে ফুটে উঠল বস্তি জীবন, কয়লা কুঠির জীবন এবং ফুটপাতবাসীর জীবন।

কল্লোলের কালে আবির্ভূত হয়েও বিভূতিভূষণ কল্লোলের লেখক নন, তিনি গ্রাম জীবনের শিল্পী। বিভূতিভূষণ সম্পর্কে বলা হয় যে কালের ও সমাজের প্রধান লক্ষণ তাঁর লেখায় ফুটে ওঠেনি। একালের দুটি যুগলক্ষণ তাঁর গল্পে নেই, শ্রমিক-ধনিক সংঘাত, আর সর্বজনীন অসন্তোষ। সন্দেহ নেই যে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন গল্প লেখকরা হয়েছেন প্রগতিপন্থী, রবীন্দ্রভাবনা থেকে সরে এসেছেন, সে ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোল ভাবনামুক্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক।

একান্ত পরিচিত বাস্তব বিষয় ও চরিত্র প্রকৃতি-সংস্পর্শে বিভূতিভূষণের গল্পে এক অসামান্যতা লাভ করেছে। এখানেই তিনি আধুনিক লেখক। সাধারণের মধ্যেই তিনি দেখেছেন সৌম্য, শাশ্বত পরিপূর্ণ জীবন, সে জীবনে প্রকৃতি ও নিয়তি, অন্ধ ঝড় ও অমোঘ কার্যকারণের লীলা যেমন আছে তেমনি অলৌকিক অধ্যাত্ম বিশ্বাসের ক্রিয়াও আছে। বিভূতিভূষণের গল্পের আধুনিকতা সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী

বলেছেন—' এমন একটি নূতন উপাদান তাঁহার রচনায় আছে, জলে যে ভাবে ছায়া মিশ্রিত হইয়া থাকে সেইভাবে আছে। যাহা রবীন্দ্রপূর্ব যুগে গার্হস্থ্য উপন্যাসে ছিল না, সেটি প্রকৃতি । এটি রবীন্দ্রপূর্ব যুগে অভাবিত ছিল। এটি জীবনের একটি নূতন সূত্র, আমাদের দেশে তো বটেই, পাশ্চাত্য দেশেও। প্রকৃতিকে জীবনের নূতন উপাদান রূপে গ্রহণ ও স্বীকার নূতন যুগের লক্ষণ, সে নূতন যুগ এখনও পুরাতন হয় নাই। পশ্চিমের হাত হইতে রবীন্দ্রনাথ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, রবীন্দ্রোত্তর কথাশিল্পীগণের মধ্যে বিভূতিভূষণ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন, এখানেই বিভূতিবাবুর রচনায় নূতনত্ব ও দেশ কালের চিহ্ন। এই উপাদানটিই সবচেয়ে আধুনিক, শ্রমিক-ধনিক সংঘাত বা সর্বজনীন অসন্তোষের চেয়েও অনেক বেশি আধুনিক। প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে নূতন সাহিত্যের এখানেই প্রভেদ।'

মানুষ , প্রকৃতি,ঈশ্বর-তিনে মিলে গড়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের সাহিত্যলোক। দিনলিপিতে তিনি বলেছেন —

' জগতে অসংখ্য আনন্দের ভান্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা, ফুলপাখি, উদার মাঠঘাট, সময়, নক্ষত্র, জ্যোৎস্নারাত্রি, অস্তসূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর আলোকময়ী উদার শূন্য-এসব থেকে এমন বিপুল আনন্দ অন্তরের উদার মহিমা প্রাণে আসতে পারে সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট অসীম, শান্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান পৌছায় না, জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায়— শতবর্ষ হলেও পায় না। সাহিত্যকারের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা সর্বসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়া। ' (স্মৃতির রেখা)

আরও বলেছেন, ' দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষ না দেখলুম তবে কি দেখতে বেরিয়েছি? চিরযৌবন নিসর্গ সুন্দরী সবকালে সবদেশেই মন ভুলায়, মন ভুলায় তার শ্যামল বনাঞ্চল বনময় ফুলসজ্জা, মধুমঞ্জরীর সৌরভ ভরা তার অঙ্গের সুবাস।

তাকে সবস্থানে পাওয়া যায়না সে রূপে, কিন্তু মানুষ জায়গাতেই আছে। প্রত্যেকের মধ্যেই একটা অদ্ভুত জগৎ, দেখতে জানলেই সে জগৎটা ধরা দেয়, তাই দেখতেই পথে বার হওয়া। মানুষের বিভিন্নরূপ দেখবার আমার চিরকাল আগ্রহ, · · · দেখতে চেয়েছিলুম বলেই বোধ হয় কত রকমের মানুষই না ঈশ্বর দেখালেন জীবনে।

মানুষকে জেনে চিনে লাভই হয়েছে, ক্ষতি হয়নি মানুষের অন্তর রহস্যময় বিরাট বিশ্ব, এর সীমা নেই শেষ নেই। ' (অভিযাত্রিক)

আমাদের বস্তুময় পৃথিবীর নিতান্ত সাধারণ গাছপালা, ফলমূল, ধুলামাটির উপকরণ নিয়ে আপন চৈতন্যের অলৌকিক শক্তিতে মাধুর্যমন্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন তাঁর গল্প উপন্যাস। শিল্পীর চেতনায় বস্তুকে ছাড়িয়ে যাওয়া এবং সৃষ্টির মধ্যে বিষয়াতীতের এই স্বপ্ন স্বাদুতার স্বভাবগুণেই 'কল্লোলের কালে'র গল্প সাহিত্যে বিভূতিভূষণ রোমান্টিক নামে অভিহিত। বস্তুত বিভূতিভূষণ অসামান্য মানবতাবাদী ও জীবনরসিক গল্পকার। দৃষ্টান্তরূপে তাঁর 'আহ্বান' গল্পটি প্রণিধানযোগ্য।

শহুরে গ্রাম্য, হিন্দু মুসলমান, ধনী নির্ধন, ভদ্রলোক চাষালোক— সমস্ত বিভেদের প্রাচীর ভেঙে এক মহামিলনক্ষেত্রে মিলেছে জমিরকরাতীর বুড়িবৌ আর শিক্ষিত হিন্দু নায়ক। 'অ মোর গোপাল', এই আহ্বানে ধ্বনিত হয়েছে মহামিলন সঙ্গীত। আমাদের মন গভীর স্নেহে প্লাবিত হয়ে যায়। শিক্ষিত নাগরিক মনের বিরক্তিকে ছাপিয়ে উঠেছে বুড়ির প্রতি নায়কের এক অপরূপ ভালোবাসা। মুসলমান বুড়ির স্নেহে অভিষিক্ত হয়েছে হিন্দু যুবক। ধর্ম সমাজ শ্রেণীগত সব বিভেদ ব্যবধানকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে মানুষে মানুষে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক, জয়ী হয়েছে মাতৃত্বের মহিমা। বিভূতিভূষণ

মাতৃস্নেহের ধারায় অভিষিক্ত এই গল্প রচনা করেছেন এবং গল্পটি ভারতীয় কথাসাহিত্যে স্মরণীয় গল্প রূপে বিবেচিত হবার যোগ্য।

কথকতার ভঙ্গিতে সহজ সরল ভাবে গল্প রচনা করাই হলো তাঁর গল্প সাহিত্যের সাধারণ শৈলী। তাঁর গল্পের গঠন নৈপুণ্য, ঘটনা বিন্যাস, প্লট পরিকল্পনা, কাহিনী ও চরিত্র সংহতি সব সময় পাঠকের চোখে পড়ে না। অথচ তাঁর গল্পে গূঢ় ব্যঞ্জনা, গভীর তাৎপর্য সৃষ্টির ঘাটতি নেই। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় গল্পের প্রসাধনে তিনি কিছুটা উদাসীন। আসলকথা গল্পের বহিরঙ্গ মন্ডনে যত্নবান না হয়ে অন্তরঙ্গ উৎকর্ষ সাধনের দিকেই লক্ষ দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাটকে লোকজীবন ও লোকাভিনয়ের প্রভাব

জনার্দন গোস্বামী

সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই রবীন্দ্রপ্রতিভা নতুন দিগন্তের অভিসারী। তাঁর সর্বগ্রাসী প্রতিভা কেবল নব নব পর্যায়ে 'চলার বেগে পায়ের তলায়' রাস্তা জাগিয়ে তুলেই ক্ষান্ত হয়নি, একই সঙ্গে আত্ম-ঐতিহ্য আবিষ্কারেও ব্রতী হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভিত্তির পোক্ত বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়েই বর্থবিস্তৃত ও অভ্রভেদী অট্টালিকার পরিকল্পনা করতে হয়। তাই আপন জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অনুসন্ধানে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। তারই ফলশ্রুতি বাঙালির লোকায়ত জীবনসাধনার দিকে তাঁর আবিষ্কারকের তন্ন দৃষ্টি, বিশ্লেষকের অনুসন্ধিৎসা এবং মূল্যায়নের নতুন বীক্ষণ।

অবশ্য এসব সর্বাংশে নতুন কথা নয়। উনিশ শতকীয় নবজাগৃতি মানবতাবাদকে কেন্দ্রে রেখে এদেশে যে মৌলিক চিন্তার দ্বার উদঘাটন করেছিল, চিন্তা-যুক্তি-তর্ক বিচার ও মূল্যায়নের যে নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেছিল তারই ধারা অনুসরণ করে পুরাতনের পুনর্মূল্যায়নের একটা সচেতন প্রয়াস অলক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছিল। এই প্রয়াসের বাস্তব রূপায়ণ তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যে ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে, নাটকেও ব্যতিক্রম নয়। জাতীয় সংস্কৃতির শিকড়ের সন্ধানে তাঁর চেতনাকে তিনি বাংলার লোকায়ত জীবন-চর্চার তৃণমূল স্তরে গ্রোথিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর নাট্যধারায় এই জীবন-চেতনা, তাঁর প্রভাব এবং রূপ-রীতি অলক্ষ্যে ফল্গুধারার মতো তাকে যে পুষ্ট করে তুলেছিল, তার অনুসন্ধান অবশ্যই প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের নাটক আমাদের আলোচ্য নয়। গতানুগতিকতার বৃত্তে পদচারণা এক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তার আভাস দিতে পারেনি। কিন্তু শারদোৎসব (১৯০৮) থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনা নতুন পথের দিশারী হলো। এই ধারায় মধ্যবর্তী কয়েকটি নাটক বাদ দিলে কালের যাত্রা (১৯৩২) পর্যন্ত নাট্যরচনায় সমালোচকেরা ইউরোপীয় 'সিম্বলিক' নাটকের প্রভাব সম্পর্কে দীর্ঘকাল উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর নাটক রচনার পূর্বেই উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপে রূপক ও সাংকেতিক নাটক রচনার আন্দোলন আছড়ে পড়েছিল এবং সংগত কারণেই তার ঢেউ এদেশীয় বুদ্ধিজীবী এবং মসীজীবীদের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। এক্ষেত্রে হয়তো তার পরোক্ষ কোনো প্রভাব নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে থেকেও যেতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের রূপক সাংকেতিকতায় অরূপ ও অতীন্দ্রিয়কে যুগপৎ রূপময় ও অনুভববেদ্য করে তোলার ঐতিহ্যগত ধারার সঙ্গে তার অপরিচিত থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। আবার সাম্প্রতিক কালে কেউ কেউ জার্মান

'একসপ্রেশনিষ্ট' নাটকের সঙ্গেই এদের নানাবিধ মিল খুঁজে পেয়েছেন। এই দুটো প্রত্যয়ের মধ্যেই আংশিক সত্যতা আছে। কিন্তু ঐ সব বিদেশী প্রভাবকে যতটা বড়ো করে দেখা হয়েছে তা ঠিক কি না-এর পুনর্বিচার হওয়া প্রয়োজন।

প্রকৃত বিচারে রবীন্দ্রনাথের নাটকই এদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাটক। আমাদের প্রথাগত নাট্যসাহিত্য গড়ে ওঠার যুগে অভিজাত সংস্কৃত নাটক এবং ইংরেজি এলিজাবেথীয় নাটকের আদর্শ নিয়ে বেশ কিছু টানাপোড়েন ছিল। কালের বিচারে শেষ পর্যন্ত জয় হলো ইংরেজি নাট্যাদর্শের। অবশ্য এই পর্বের আরও একটা উল্লেখযোগ্য দিক ছিল।

গিরিশচন্দ্র এবং আরও কেউ কেউ ভক্তিরস, গান এই সব আমদানী করে নাটকে একটা দেশী ভাবের মোড়ক আনতে চেয়েছিলেন। সেটা যেন অনেকটা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার মতো। কারণ দেশি ভাব মানে পুরোনো কিছু নয়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশও বদলাচ্ছে পুরোনো থেকে নতুনের দিকে। এই পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের মনেও সম্ভবত নাট্যাঙ্গিক ও বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। তিনি 'রাজা ও রানী'তে শেক্সপীয়রীয় গঠনরীতির ট্র্যাজিডিকেই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু এখানেই তিনি থেমে থাকতে চাইলেন না। তাঁর মনে অতৃপ্তি ছিল প্রথম থেকেই। কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য পর্যায়ের রচনা প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪) -এ তাঁর এ অতৃপ্তির প্রাথমিক নিদর্শন মেলে।

'শারদোৎসব' থেকেই তিনি সচেতনভাবে নাটকে দেশীয়ভাব ও দেশীয়রীতি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর এ প্রয়োগ ভাবনা কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় রীতি, যেমন — 'সিম্বলিজম্' বা 'এক্সপ্রেশনিজম-এর সঙ্গে বিরোধ করে নয় বরং কখনো কিছুটা গ্রহণ করে, কখনো কিছুটা বর্জন করে। দেশীয়ভাব ও রূপকে তিনি কাঁচামালের মতো বাইরে থেকে তাঁর নাটকের সঙ্গে জুড়ে দেননি। বরং ওদের আত্মসাৎ করে একটা স্বকীয় রীতির সৃষ্টি করেছেন।

রীতির দিক থেকে লক্ষণীয় যে কেবল বাংলাদেশের প্রথাগত পুরোনো যাত্রা নয়, অখণ্ড বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত রস-উপভোগের যাবতীয় দৃশ্য-কাব্যের ধারাকে তাঁর পরিকল্পিত নাট্যরীতির সঙ্গে যুক্ত করে নাট্য-প্রযুক্তির নতুন রূপ আস্বাদন করতে চাইলেন। মনে রাখতে হবে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির ফসল কেবল অভিজাত জীবন থেকে আদৃত নয়, বরং লোকায়ত জীবন-চর্যার দিকেই শিল্পী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি প্রসারিত ছিল। তাই বহুরূপী, লেটোর দল, কথকতা, ভাসান বয়াণী, অষ্টমঙ্গলা, পদাবলী পালাকীর্তন, কবি ও তর্জার আসর, গ্রামে গ্রামে গৈরিকে ভূষিত বাউলের নেচে গান করা— এই রকম সুপ্রচুর ও বিচিত্র আয়োজনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল যে অভিনয় রীতি —রবীন্দ্রনাথ তাঁর মর্মভেদ করে আপনার নাট্যরীতিকে গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাটকে আরও একটা নতুন দিক জনতার ভূমিকা। পূর্বাপর অনেক নাটকেই এদের উপস্থিতি আছে। এরা একদিকে যেমন 'প্রসেনিয়াম' ভেঙেছে, মঞ্চ ও দর্শককে ঘনিষ্ঠ নৈকট্য দিয়েছে, তেমনি এরা জনজীবনের একান্ত সরল, বাস্তব ও বহমান রূপটিকে তার বহুল বৈচিত্র্যে প্রকাশ করেছে। যদি তত্ত্ববিস্তারের মোহে ঘুরে না দাঁড়াই তাহলে দেখতে পাব রবীন্দ্রনাটকে বাঙালি সাধারণ মানুষের জীবনের মনের ও উৎসব আয়োজনের অজস্র অন্তরঙ্গ ছবি ধরা পড়েছে।

গ্রামকেন্দ্রিক জনজীবনে 'মিথ' এবং 'রিচুয়াল' এর উত্তরাধিকার সূত্রে একটা গভীরতর প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকের মূল বিষয়ে এবং প্রাসঙ্গিক নানা পরিস্থিতি ও বিবরণে, বাঙালির 'মিথ' ও 'রিচুয়াল', একটা গভীর আভ্যন্তর স্তর (Deep-structure) সৃষ্টি করে আছে। বাইরের অলংকৃত রূপ ভেদ করে এসবের অনুসন্ধান করা যেতে পারে। 'রক্তকরবী' নাটকের জালে বাঁধা রাজা, 'রথের

রশি'-তে 'রথ-যাত্রায় রশি টানা' প্রভৃতি বহু প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্র নাট্যের এই আভ্যন্তর চরিত্র-প্রকৃতির সন্ধান করা যেতে পারে ।

বিদ্যাসাগরের প্রভাবতী সম্ভাষণ : একটি সমীক্ষা

তাপস ভট্টাচার্য

বিদ্যাসাগরের তাবৎ রচনার প্রেক্ষিতে প্রভাবতী সম্ভাষণের একটি বড়ো ভূমিকা থেকে গেছে, কারণ বিদ্যাসাগরের রচনায় শিল্প ও জীবনের সহজ বিনিময়যোগ্যতা একটি গ্রহণীয় বিষয় । তাঁর প্রভাবতী সম্ভাষণের উৎস শুধু প্রভাবতীর অতর্কিত মৃত্যুর বেদনা নয়, এর মূল তাঁর বাঙালি চেতনার গভীরে । বিদ্যাসাগর যদি রামপ্রসাদ হতেন তাহলে 'পৃথিবীতে কেহ ভালো তো বাসে না, এ পৃথিবী ভালোবাসিতে জানে না' বলে বিষণ্ণ ও মধুর গান বাঁধতেন আর তাঁর সামনে বালিকা কন্যার রূপ নিয়ে জগজ্জননীর বেড়া বাঁধার দৃশ্যটি উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠত । এখানে বিদ্যাসাগরের ঈষৎ আপত্তি থাকায় বরং রবীন্দ্রকাব্যের সেই শিশুকন্যার মতো হৃদয়ের দ্বারপ্রান্তে বসিয়ে, যেতে নাহি দিব, তবু যেতে দিতে হয়-এর অমোঘ টানা পোড়েনে ছিন্ন দীর্ণ হতে তিনি হয়তো বেশি ভালোবাসতেন । 'যদি তাহা বিস্মৃত হইতে পারি তাহা হইলে আমার মতো পামর ও পাষণ্ড ভূমণ্ডলে নাই ।'

প্রভাবতী সম্ভাষণের এই শপথ একটি স্নেহসিক্ত হৃদয়ের তাৎক্ষণিক প্রতিশ্রুতি মাত্র নয়, এ উচ্চারণ মন্ত্রের মতো তাঁর নাভিকেন্দ্র থেকে উঠে আসা । এ ভাবেই অভিজ্ঞতা আর কল্পনার গঙ্গাযমুনা তাঁর সারস্বত উল্লেখে প্রায় মিলে মিশে যায় । প্রভাবতী সম্ভাষণ থেকে উদ্ধৃত উচ্চারণটির সমান্তরাল একটি উল্লেখ বিদ্যাসাগরচরিতে এই রকম : ' আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন । আমার বোধ হয় সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে । যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্নপামর ভূমণ্ডলে নাই ।' স্নেহের ছায়াপড়া করুণায় মেদুর একটি মূর্তি বিদ্যাসাগরের চেতনায় সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে ।

মৃত্যুর পাশাপাশি এ রচনায় জীবনকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছেন বিদ্যাসাগর । প্রভাবতী রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তান আর এই রাজকৃষ্ণের বারো নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতেই বিদ্যাসাগর প্রথম বিধবা বিবাহ সম্ভব করে তোলেন । এই তথ্যটি বিদ্যাসাগরের জীবন ও রচনাকে একই সূত্রে ধরে রাখে । প্রথম বিধবা-বিয়ের পাত্রী কালীমতীর বয়স সে দিন ছিল মাত্র দশ, আর প্রভাবতীর তিন । ধারাবাহিক বয়সের দিক থেকে না হলেও বুদ্ধিপ্রধান বয়সের দিক থেকে তিন আর দশের ব্যবধান বেশি নয়, কারণ বাংলাদেশে মাত্র আটবছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে মানুষ সেদিন যে কোনো মূল্যে গৌরীদানের পুণ্য অর্জনে উন্মুখ আবার সে মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি । আর এজন্যই উঠে আসে অস্বস্তিদায়ক পাকা পাকা কথাগুলি প্রভাবতীর মুখে । তার শাশুড়ির নাম ভাগ্যবতী, শ্বশুরবাড়ি কেষ্টনগর, স্বামীর নাম গোবর্ধন, ছেলের নাম নদে, আর তার স্বামী এসে তাকে চারটি পয়সা ও সিকি পয়সার শাক দিয়ে গেছে — কুলীন বাঙালি সমাজের প্রাসঙ্গিকতায় প্রভাবতীর এই অমৃতভাষণ বিষিয়ে ওঠে । কিন্তু বিষিয়ে ওঠে না যখন এই নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে প্রভাবতীর পরিচয় গাঢ় হয়ে ওঠে — বিদ্যাসাগর তা দেখেন ।

বোধোদয়-এ বিদ্যাসাগর শিশুদের শিখিয়েছিলেন যে শিশুরা অজ্ঞ, শিক্ষা না দিলে তারা কিছুই জানতে পারে না। কিন্তু এ শিক্ষা শুধু পাঠশালা থেকে নয়, বিস্তীর্ণ ও ব্যাপ্ত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেও নেওয়া হোক — এই যেন তাঁর ইচ্ছা ছিল। তাই আখ্যানমঞ্জরীর পাঠক শিশুকে বিদ্যাসাগর হাত ধরে জীবন নামের এক জটিল ও গহন অরণ্যানীর মধ্যে নিয়ে যান। বিদ্যাসাগরের সৃষ্টির পৃথিবী ভাষানির্ভর বন্ধনে অন্তিম দৃঢ়তা পায় প্রভাবতীর কথকতায়। এরূপ অবস্থায় ওই সহৃদয়তা নিয়ে বিদ্যাসাগর প্রভাবতীর কাছে গিয়েছিলেন। বেথুন সাহেব যেমন গিয়েছিলেন তাঁর বাঙালি শিশু ছাত্রীর কাছে। বাঙালি মেয়েদের মধ্যে চন্দ্রমুখী বসু প্রথম এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বিদ্যাসাগর তাঁকে সহৃদয়তায় শেক্সপীয়র উপহার দিয়েছিলেন, আর প্রভাবতীর মুখে ভালোবাসার কথা ফুটলে তিনি যে স্নেহে তার মুখ চুম্বন করেন সে দু'টি ভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিশেষ নেই।

এ সেই মহান বিনষ্টির সময়, যখন পৃথিবীতে অদ্ভুত অন্ধকার নেমে আসে। রামের রাজ্যাভিষেক নিয়ে বিদ্যাসাগরের দক্ষিণ হাত যখন সহৃদয় গদ্য লেখে, তখন অন্য হাত বর্জন করে তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তানকে। সীতা যখন কান্নায় ভেঙে পড়ে আশ্রমপরিবেশকে দীর্ণ করে তখন পত্নী দীনময়ী দেবীকে বিদ্যাসাগরের লিখতে বাধে না : 'এক্ষণে তোমার নিকটে এ জন্মের মতো বিদায় লইতেছি।' কার্মাগাড় থেকে লেখা একটি চিঠিতে বিদ্যাসাগর এই পটভূমিকে এ ভাবে দেখেছেন : 'সাংসারিক বিষয়ে আমার মতো হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি। কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি সে বিষয়ে কোনো অংশে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না, এই প্রবীণ কথা কোনোক্রমেই অযথা নহে। সংসারী লোক যে সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের একজনেরও অন্তঃকরণে যে, আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাই, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। এরূপ অবস্থায় সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া ক্লেশভোগ করা নিরবচ্ছিন্ন মুর্খতার কর্ম। যে সমস্ত কারণে আমার মনে এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে আর তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক।' এই ভ্রান্তিবিলাসের মধ্যে থেকে বিদ্যাসাগর উইল পাল্টান : ' আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমাকৃত পূর্বান সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল।'

বিদ্যাসাগরের জীবনে প্রভাবতীও তেমনি এক অন্তিম বিনিয়োগ; জড়িয়ে থাকা বাধা ছাড়িয়ে যেতে গেলে যে ব্যথা বাজে, সেই মন খারাপ নিয়ে প্রভাবতী সম্ভাষণ তাঁকে বেঁধে ফেলে বাড়ি ফেরার পিছুটান। জ্ঞানতাপস ফাউস্টের জীবনে যেমন, তেমনি বাঙালি মনীষার এ এক অদ্ভুত বিধিলিপি।

প্রভাবতী সম্ভাষণ একটি চাবিকাঠি যা দিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবনকে সমগ্র-রচনাকর্মের দৃঢ়বদ্ধতাকে উদ্‌ঘাটিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা : তুলনামূলক আলোচনার সমস্যাপট

তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

বিষয়বস্তু, মতামত, সংস্কৃতি ও পরম্পরার সাদৃশ্য বা আদানপ্রদান বাদ দিয়ে কেবল তুলনীয় দু'টি কাব্যাংশের আলোচনায় তুলনামূলক সাহিত্যের আগ্রহ নেই। সাহিত্যপাঠে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বপথের পথিক ছিলেন, অনুবাদও করেছেন অনেক। কিন্তু দু-একটি বিচ্ছিন্ন পংক্তি বা স্তবক নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা বা অভিঘাতের জটিল প্রশ্নের অবতারণা ভুল হবে।

ইংরেজি কবিতার কোন্ যুগের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন্ যুগের কবিতার আদানপ্রদানের আলোচনা আমাদের অনুসন্ধানকে সমধিক ফলপ্রসূ করতে পারে? 'সাহিত্য-রচনায় কারো বা চিত্তবৃত্তিতে কল্পনার কর্তৃত্ব, কারো বা মননের। আরো একটা প্রবর্তনা আছে, তাকে বলা যেতে পারে লোকহিতৈষা, তাতে শ্রেয়োবুদ্ধির ফসল চাষ হয়। আমার নিজের লেখা নিজে বিচার করতে সম্মতি যদি দাও তাহলে বলতে হয় আমার লেখায় প্রধানত কল্পনা আর শ্রেয়োবুদ্ধি এই দুটোরই চালনা।' (চিঠিপত্র, ১১ পৃ- ২৫৯)। এই ধরনের উক্তি স্বভাবতই রোমান্টিক যুগের ইংরেজি কবিতার দিকে রবীন্দ্র-পাঠককে চালিত করে।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কোনো এক ধরনের কবিতা লেখেন নি, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কবিতা লিখেছিলেন। এমন কোনো কবিতা কি লিখেছিলেন, যেখানে কল্পনা ও মননের এই ভেদ (টি এস এলিয়ট যাকে বলেছেন 'dissociation of sensibility') নেই? রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে (২৫ এপ্রিল ১৯৩৯) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আকাশপ্রদীপ - এর কবিতাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এক ভাগে 'বধূ', 'শ্যামা', 'বঞ্চিত' বা 'কাঁচা আম'। অন্য ভাগে 'যাত্রাপত্র', 'ধ্বনি', 'বেজি', 'যাত্রা', বা 'ঢাকিরা ঢাক বাজায়'। স্পষ্টত, এই দু'টি শ্রেণী দু'টি ভিন্ন পরম্পরার সঙ্গে, দু'টি ভিন্ন রচনারীতির সঙ্গে যুক্ত। এর উৎস কি ইংরেজি কবিতার দু'টি ভিন্ন যুগে (এলিজাবিথান ও রোমান্টিক) খোঁজা সম্ভব?

'কালিন্দী'র তিন নারী

তপনকুমার পান্ডে

চিত্রকল্পের ব্যবহার কবিতায় যত প্রসিদ্ধ, উপন্যাসে তত নয়। তথাপি কোনো কোনো ঔপন্যাসিক কখনও কখনও এমন অসাধারণ চিত্রকল্পের সৃষ্টি করেন, যার ফলে উপন্যাসের শিল্পগুণ কাব্যিক ব্যঞ্জনার যোগে আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। চিত্রকল্পে চিত্র থাকেই, তার সঙ্গে উপরন্তু যুক্ত হয় 'কবি কল্পনা সামগ্রিকতা ও আত্যন্তিকতা।' (ড. শ্যামল ঘোষ)। চিত্রকল্প বা 'ইমেজ' কবি মনের অন্তস্থল আবিষ্কারে সাহায্য করে। কখনো কখনো এমন ঘটে, একটি বা দু'টি চিত্রকল্প ধ'রেই সমগ্র কবিতা বা উপন্যাসের সম্পূর্ণ গভীরে প্রবেশ করা যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কালিন্দী' উপন্যাসে এমনই কিছু অসামান্য চিত্রকল্পের ব্যবহার ঘটিয়েছেন, যেগুলির আলোকেই আমরা উপন্যাসটির রহস্যান্ধকার ভেদ করতে চেষ্টা করব।

প্রসঙ্গত চিত্রকল্পের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য -এর উল্লেখ করা যেতে পারে, যেগুলি H.M.Williams তাঁর Six Ages of English Poetry গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

(১) Vivid Picture বা চিত্রধর্মিতা।
(২) Sense Impression বা ইন্দ্রিয়বেদ্যতা।
(৩) Metaphore বা রূপকতত্ত্ব।
(৪) Simik বা সাদৃশ্যধর্মিতা (উপমাদি অলংকার)।

আমাদের আলোচ্য চিত্রকল্পগুলিতে এ বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন থাকবে, তেমনি এগুলিকে ছাপিয়ে উপন্যাসের মূল বক্ষ্যমাণ বিষয়ের দিকেও তা ইঙ্গিত করবে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় 'কালিন্দী' উপন্যাসে চিত্রকল্পের আলোকে তিন নারী। আর এ চিত্রকল্পগুলি মূলত পৌরাণিক রূপকল্প (Myth) এবং প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের (Nature Image)-এক মিশ্রিত সংবেদন। 'কালিন্দী' উপন্যাসটিতে যে নারী-ত্রয়ীকে আমরা কাহিনীর আদ্যন্ত প্রবল কর্তৃত্বের সঙ্গে বিরাজ করতে দেখি তারা কালিন্দী, কালিন্দীর চরভূমি এবং কাহিনীর কিছুটা নায়িকাস্থানীয়া সারী। এদের মধ্যে কালিন্দী এবং চরভূমি জড় চরিত্র, কিন্তু জড় হলেও উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে, কাহিনীর পরিণাম নির্ধারণে এদের ভূমিকা মানবী সারী অপেক্ষা কম নয়। সঙ্গতকারণেই খুব সচেতনভাবে লেখক নদী ও চরের রূপ বর্ণনায় বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। উপন্যাসটির মূল বিষয়ই হলো মানবসভ্যতার ক্রমিক বিবর্তন। সামন্ততন্ত্র এবং কৃষি সভ্যতার অবসান এবং বণিক তথা যন্ত্রযুগের সূচনা। যুগের এ পটপরিবর্তনটুকু ধরতে লেখক অত্যন্ত সতর্কভাবে কিছু প্রকৃত চিত্রের অবতারণা করেছেন। নদীরূপ ও তার নামতত্ত্বের দু'একটি ছবি তুলে ধরা যেতে পারে— (১) ' রায়হাট গ্রামের প্রান্তেই ব্রাহ্মণী নদী — ব্রাহ্মণীর স্থানীয় নাম কালিন্দী, লোকে বলে কালী। ' (২) ' কালী জিভ চাটিছে রাক্ষসীর মতো।' প্রজারা বন্যাপ্লাবিত কালিন্দী সম্পর্কে বলেছে। (৩)' কালিন্দী যেন ঠিক বালিকার মতো খেলাঘর পাতিয়াছে ওইখানে।' লেখকের সমীকরণ প্রথম বর্ণনায় লেখক নদীটির প্রথম পরিচয় দিয়েছিলেন, 'ব্রাহ্মণী' বলে, কিন্তু পরক্ষণেই বলেছেন, 'কালিন্দী' এবং এই নামটি আরও সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যবহ করে তুলেছেন প্রজাদের মুখ দিয়ে 'কালী' বলিয়ে। লক্ষণীয় সমগ্র উপন্যাসে লেখক কিন্তু ব্রাহ্মণী নামে নদীটির পরিচয় দিলেও নামটি আর ব্যবহার করলেন না, বরং উপন্যাসের নামকরণ করলেন 'কালিন্দী' ।এবং কালিন্দীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বারবার 'কালী'র প্রসঙ্গে চলে এসেছে। এই 'কালিন্দী' নামকরণ এবং তার রূপাঙ্কনের পশ্চাতে লেখকের Mythological প্রজ্ঞাটি লক্ষ্য করবার মতো। 'কালিন্দী' রঙ্গলালের ভাষায় যমের ভগ্নী, মৃত্যুর সঙ্গে যার সম্পর্ক জড়িত । মৃত্যু অর্থেই বিনাশ বা ভাঙা। আবার 'কালী' পৌরাণিক মহাপ্রকৃতি , যাঁর তাণ্ডবনৃত্যে একপারে ধ্বংস অপর পারে সৃষ্টি দ্যোতিত হয়। উপন্যাসে 'কালিন্দী' নদীটি যেন নির্মম নিয়তি। নির্বিকার চিত্তে একপাড় ভেঙে অপর পাড়ে চরভূমি তৈরি করেছে। (আবার সাঁওতাল তথা প্রাচীনজমিদারদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়ে বণিকপ্রভু তথা যন্ত্রায়ণের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছে।) এই ভাঙা গড়ার খেলায় এই প্রাকৃত চরিত্রটি এতই উদাসীন, যে লেখকের মনে হয়েছে 'কালিন্দী যেন ঠিক বালিকার মতো খেলাঘর পাতিয়াছে।' কালিন্দীর সৃষ্ট এই চরভূমিকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসে দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠেছে, যুগের পালাবদল ঘটেছে।

ভাঙাগড়ার খেলা নিয়ে কালিন্দীর এই প্রলয়ঙ্করী রূপের পাশাপাশি আরও একটি রহস্যময়ী রূপ লক্ষ করা যেতে পারে। রূপটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী অপূর্ব আলেখ্য— ' আকাশে শুক্লা সপ্তমীর আধখানা চাঁদ কালিন্দীর ক্ষীণ স্রোতের মধ্যে এক অপরূপ খেলা খেলিতেছে। দূরে ও পাশে কালিন্দী যেন একখানা রূপার পাত। সম্মুখেই পায়ের কাছে চাঁদ কালিন্দীর স্রোতের তলে ছেঁড়া একখানি চাঁদমালার মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া লম্বা হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। সাদা সাদা টি-ট্রিঙ পাখি জলস্রোতের ওপারে বালির ওপর ছুটিয়া বেড়াইতেছে। দূর আকাশে একটা উড়িয়া চলিয়াছে আর ডাকিতেছে হট্টি-টি হট্টি-টি। নদীর বালুগর্ভের উপর শূন্যতল স্বচ্ছ কুয়াশার ন্যায় জ্যোৎস্নায় মোহগ্রস্তের মতো স্থির নিস্পন্দ। ' লক্ষণীয় কালিন্দীর এ রূপের মধ্যে ভয়ঙ্করী কালীমূর্তির কোনো ছাপ ফুটে ওঠেনি বরং এক মোহসঞ্চারী অপরূপ 'মোহিনী' মূর্তিতে কালিন্দী চিত্রিত । তবে এ 'মোহিনী' রূপ সৌন্দর্যে আবিষ্ট করলেও পরিশেষে কিন্তু সর্বনাশের অতলেই টেনে নিয়ে যায়। এ অপরূপ মাধুরীর মধ্যে অকস্মাৎ একটি 'হট্টি-টি' চীৎকার

উপন্যাসে ভাবী বিপদের সঙ্কেত দিয়ে যায়। কারণ, আমরা দেখতে পাই, উপন্যাসে যখন চরভূমির কন্টকনামা নিয়ে প্রজাদের কয়েকজনের সঙ্গে নায়ক অহীন্দ্রের তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে, তখনই অহীন্দ্র 'কালিন্দী'র ওই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রূপে মুগ্ধ হয়ে তার তীরে গিয়ে বসেছে। সেখানে বসে সে হয়তো মাটির কাছের মানুষ পরিশ্রমী সাঁওতাল প্রজাদের মধ্যে জমিবন্টনের, তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন, দেখেছিল। কিন্তু তারই মধ্যে 'হট্টি-টি' পাখি দেখে গিয়ে অমঙ্গলের বার্তা ঘোষণা করেছে। এই রকম দ্বৈত সত্তাময়ী প্রকৃতি চরিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্করের বিশিষ্টতা। বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর উপন্যাসেও জড় প্রকৃতির দৌরাত্ম্যের কথা বারবার এসেছে। তারাশঙ্করের কালিন্দীর এ 'মোহিনীমূর্তি' আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় কীট্স এর বিখ্যাত কবিতা La Bella Dame Mercy র নিষ্ঠুরা সুন্দরীকে, অথবা— রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিখ্যাত কলি— 'তুমি হৃদয় পূর্ণ করা ওগো তুমি সর্বনেশে'। তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রকৃতি তাই জড় হয়েও নিছক জড় নয়। তার রূপ আবিষ্টও করে, আবার সর্বনাশও করে। তাকে বিশ্বাস করা যায় না। আচরণে তারা এতটাই প্রাকৃত, এতটাই রহস্যময়ী।

শুধু কালিন্দীরই নয়, তারই আত্মজা চরভূমিটিরও একই প্রকৃতি। স্বপ্ন দেখানো এবং স্বপ্ন ভঙ্গকরাই তার কাজ। চরভূমিটির চিত্রেও তার ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে।

কালিন্দী উপন্যাসে প্রকৃতিকে খুবই সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছেন তারাশঙ্কর। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত চমৎকার এক সঙ্গতিসূত্র বজায় রেখেছেন— কি চিত্রকল্পের দিক থেকে, কি ঘটনা পারম্পর্যের দিক থেকে। এ উপন্যাসে এই ত্রি-প্রকৃতির সমীকরণটি এই রূপ দাঁড়িয়েছে শেষ অবধি— কালিন্দী - কালী-চরভূমি-সারী-কালী উপন্যাসটির প্রকৃতচেতনার আরম্ভে কালী এবং শেষ দিকেও কালী অর্থাৎ প্রকৃতি ও মহাপ্রকৃতি চেতনায় সংমিশ্রণ ঘটেছে, তেমনি এই মহাপ্রকৃতির তাত্ত্বিক দিকটিও (সৃজন/প্রলয়) এ উপন্যাসে সুপ্রযুক্ত। এসব দিক বিবেচনা করে বলতে পারি — 'কালিন্দী'র ঔপন্যাসিক শুধুমাত্র 'কবি'র কবি নন,ছবিরও কবি।

রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্য : নবনির্মিতি

তৃপ্তি পালচৌধুরী

কবীনাং কবিতমঃ (ঋগ্বেদ) রবীন্দ্রনাথ জীবনের বঙ্গভূমির কবি, 'আদিকর্মিক'। উপলব্ধি ও হৃদয়সংযোগের রসায়নে বারে বারে জগৎ ও জীবনকে তিনি উজ্জ্বলতর ও বিচিত্রতর করিয়া দিয়াছেন। তার বিচিত্রমুখী রচনাসম্ভারের উৎসমূলে যে দৃষ্টি তাহা কবির দৃষ্টি। সৃজনছন্দের আনন্দেই ঐতিহ্যাশ্রয়ী রবীন্দ্রমানস ডুব দিয়াছিল প্রাচীন ভারতীয় রসসাহিত্যের গভীরে। বহুশাখা ও সুবিস্তৃত সেই সাহিত্যের অন্যতম বৌদ্ধসাহিত্য। বর্ত্তমানের ব্যবধানে অতীত যুগের বৌদ্ধ কাহিনী তাঁর কল্পলোককে সঞ্জীবিত ও মহিমান্বিত করিয়াছে। মৈত্রী করুণায় পূর্ণ অনিন্দ্যসুন্দর বুদ্ধজীবন বিংশশতাব্দীর সমানধর্মা কবির অপরিসীম বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। তাই বৌদ্ধধর্মের মহান জীবনাদর্শ, বৌদ্ধ ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল, আত্মোৎসর্গপূত অধ্যায় সমূহ বুদ্ধের প্রতি ভক্তির একাগ্রতার উদহারণগুলি ও বুদ্ধমহিমা তাঁহার কাব্যের বিষয়রূপে তাঁহার কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই

রবীন্দ্রপ্রতিভাস্পর্শে অবদানসাহিত্যের স্বল্পাদৃত আখ্যানসমূহ সৃষ্টিবৈচিত্র্যে অনুপম রূপ লাভ করিয়াছে। কবির বীক্ষণ দিয়া তিনি এই গল্পগুলির ভিতর নতুন তাৎপর্য ও সৌন্দর্যের বর্ণবিভাস সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই প্রেক্ষাপটে কবির 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের কথা কাব্যের কয়েকটি কবিতা উল্লেখ্য। অবদানের উত্তরাধিকারে আস্থস্থ কবির উক্তি — 'এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে সৃষ্টি প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ কথা ও কাহিনীর গল্পধারা উৎসের মতো নানা শাখায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল '। কথা ও কাহিনীতে কবির প্রেমাতুর কল্পনা, বরণীয় বিষয়গৌরব, দেশের ঐতিহ্যকীর্তির উদাত্তপ্রশস্তি ও দৃঢ় ও দ্রুতগামী আখ্যানবস্তুর সংযোগে এক নতুন ওজস্বিতা পৌরুষদৃপ্ত রসাবেদন লাভ করিয়াছে। কবিত্বের উজ্জ্বল আলোক প্রক্ষেপে গল্প বিনির্মিত হইয়াছে কাব্যরচনায়। কারণ 'বিনির্মাণের লক্ষ্য গভীরতর তাৎপর্য বা অভিধা অন্বেষণের লক্ষ্যে ভিন্নতা বা বৈচিত্র্যের অন্বেষণেই নির্মাণকে নতুনরূপে নির্মাণ করা।'

১৩০৪ হইতে ১৩০৬ সালের মধ্যে রচিত কিছু কবিতা লইয়া ১৩০৬-এর ১ মাঘ কথা কাব্যখানি প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠায় মূল্যায়িত এই কাহিনীগুলিকে কবি বোধ ও বুদ্ধির মধ্যদিয়া শিল্পরস ও রূপে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। অবদান কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে কবি যে সকল আখ্যান-কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা হইল :

উৎস	রচনা
অবদান শতক	১। শ্রেষ্ঠভিক্ষা ২। পূজারিণী ৩। মূল্যপ্রাপ্তি
মহবস্ত্বাবদান	৪। মস্তকবিক্রয় ৫। পরিশোধ
বোদিসত্ত্বাবদান কল্পলতা	৬। অভিসার
কল্পদ্রুমাবদান	৭। নগরলক্ষ্মী
দিব্যাবদান	৮। সামান্যক্ষতি

নাট্যসংঘাতের ইঙ্গিতবাহী পূজারিণী কবিতায় মূলানুসরণ সামান্যই আছে। গল্পকথা ও কবিতার তাৎপর্যগত স্বাতন্ত্র্য-সচেতন কবি আখ্যানভাগকে বিশেষত অমার্জিত অংশবিশেষকে পরিহার করিয়া মৌলিক সৃজন-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। মহারাজ বিম্বিসারের অন্তঃপুরচারিণী শ্রীমতী নামে সে দাসীর অপূর্ব-আত্মদানে কবিকল্পনা রঞ্জিত হইয়াছে। বর্ণনার মহিমায় গাম্ভীর্য, জীবনাদর্শের প্রতি শ্রীমতীর অবিচল নিষ্ঠা কবির শব্দনির্বাচনে ও ছন্দধ্বনির গৌরবমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। কবি পূজারিণীতে তাঁর মানসকন্যা শ্রীমতীর রূপায়ণে বর্তমান দীনতার গ্লানি হইতে আত্মমুক্তির পথ খুঁজিতে চাহিয়াছেন। শ্রীমতীর সঙ্গে সঙ্গে রাজমহিষীর কণ্ঠে দৃপ্ত রাজাদেশের উচ্চারণ, প্রসাধনরতা রাজবধূর মানস-উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা- কেহ পাছে শোনে, এবং রাজকন্যার সহানুভূতি স্বতন্ত্র মহিমায় প্রকাশ পাইয়াছে। মূল কাহিনীর রাজান্তঃপুরিকা, বুদ্ধোপাসিকাকে কবি তাঁহার কবিতায় পূজারিণীর ভূমিকা দিয়াছেন। বর্ণনার মধ্যে মধ্যে আকস্মিক আলোকসম্পাতের মতোই ঘটনার চমক সৃষ্টি কবিতাটিকে নাট্য কাব্যের আভায় রঞ্জিত করিয়াছে। ঐতিহাসিক সত্যকে প্রকাশ্যে আনিয়া কাব্য-প্রতিমাকে আহত করার পরিবর্তে কবি দুই একটি শব্দে সত্যকে আভাসিত করিয়াছেন মাত্র। আবার প্রথম স্তবকে কাহিনীর হুবহু অনুসরণে ও ধ্বনিপ্রধান ছন্দের অপূর্ব সুষমায় কবিত্বের উজ্জ্বল আলোক-প্রক্ষেপে কাব্য রসবৎ হইয়া উঠিয়াছে।

মানব জীবনের সার্থকতা যে সত্যান্বেষণে — এই উপলব্ধি অভিসারে সৌন্দর্য মাধুর্য ও কল্পনাপ্রাবল্যে

রূপলাভ করিয়াছে। কবিতার ব্যক্তিপুরুষ উপগুপ্ত চিরযৌবনের প্রতীক। অবদানের অপরাধী পাপী, বাসবদত্তা কবির সহানুভূতির স্নিগ্ধধারায় পূর্বাপর রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আমরা দেখি রমণীর ভূষণ নয়নে জড়িত লজ্জায়। গতিবেগের মধ্যে ছবি ফুটাইয়া তোলা অশ্বারোহী সৈন্যের বর্শাফলকবিদ্ধ আলোক-রশ্মির মতোই 'কথা'র এই অভিসার কবিতাটির চলন। রূপোপজীবিনী নারীর প্রতি সকরুণ অনুভূতিতে রূপমণ্ডিত উপগুপ্তের সাথে পরবর্তী কালের গোরার জীবনধর্ম একই বৃত্তে তাল মিলাইয়া চলিয়াছে। মূল কাহিনীর বিশ্বস্ত অনুসরণ থাকিলেও উপস্থাপনাতেই কবি বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। মূলের গন্ধবণিক ভিক্ষুকে কবিতায় বুদ্ধ উপাসক সন্ন্যাসী রূপে বর্ণনা করিয়া কবি প্রথমেই তাঁর দৃষ্টির পার্থক্যকে সূচিত করিয়াছেন উপমার দীপ্ত বয়ানে, বাক্ প্রতিমায় সন্ন্যাসীর শান্ত পবিত্রভাবটি সুপরিস্ফুট। প্রেম এবং আকস্মিকতার চকিত-চমক ও নবনির্মিতির দাবিদার অভিসারিকা, এই ব্যঞ্জনাগর্ভ শব্দ-নির্বাচনেই নায়িকা এইখানে প্রেমের গর্বে-সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মূলের সংরাগের উত্তাপ-উদ্দামতাকে নির্মম, কলুষমুক্ত কারুণ্যে রঞ্জিত করিয়াছে কবি প্রতিভার উজ্জ্বল আলোক-প্রক্ষেপ। নায়িকার পরিবর্তে সন্ন্যাসী নায়কের অভিসার যাত্রাকে স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল করিয়াছেন কবি। তাই সর্বভূষিতা নারীর মতোই সর্বাঙ্গসুন্দর এই কবিতাটির চলন। এই চলমান কবিতাসুন্দরীর পায়ে ছন্দনূপুর উহার মনের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছে ও উহার অঙ্গ-বিচ্ছুরিত দেহলাবণ্য আত্মার সূক্ষ্মতর সৌন্দর্য—শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রতিস্পর্শী হইয়াছে।

শ্যামাজাতকের কামাসিক্ত ব্যর্থ প্রণয়ের হাহাকার পরিশোধে আসিয়া সমস্তাত্ত্বিক প্রেমের অভিজ্ঞান হইয়া উঠিয়াছে। এই সচেতন মৌলিকতার পরিশোধে প্রেম ইন্দ্রিয়জ সত্তাকে স্বীকার করিয়া ও ত্যাগ-প্রতীক্ষা সমুজ্জ্বল নিকষিত-হেম হইয়া উঠিয়াছে। জননান্তর সৌহৃদ স্থিত প্রেমের ছায়াতে কবি কল্পনায় অবদানের জন্য শ্যামা পাঠকের সহানুভূতি-ধন্যা হইয়াছে। অখণ্ড জীবনস্রোতে খণ্ড খণ্ড সংঘাতময় ঘটনাসংকেতে কবিতাটি সার্থক কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। উত্তীয়ের আত্ম-বিসর্জনে ঘটনার গতিপথ আবর্তিত হইয়া মানসিক ভাবনা-বিড়ম্বিত শ্যামার মানসদ্বন্দ্বের সূত্রপাত। ক্রান্তদর্শী কবির চেতনায় সমাজ, পরিবেশ ও সময় প্রতিফলিত হয়। তাই উনিশ শতকের ভোগবাদী সমাজের নীতিহীনতার সঙ্গে ইউরোপের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দ্বান্দিক রহস্য রহিয়াছে পরিশোধের অন্তর্চেতনায়। যে শ্যামার প্রেমাগ্নিতে বহ্নি-সুখ-বিবিক্ষু হয় পুরুষ, কবির কাব্যে সেই প্রেম পঙ্কজ হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রেমঋণ শোধ করিতেই শ্যামার অন্তহীন তপস্যায় পরিশোধ শিরোনামটি ইঙ্গিতবহ হইয়া উঠিয়াছে। রোমান্টিক, নাটকীয় উপাদান-বহুল এই আখ্যানকাব্যে অতীত জীবনসমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কবি যেন বর্তমান জীবন-জিজ্ঞাসাকেই চিহ্নিত করিতে চাহিয়াছেন। অতীত ও বর্তমান কল্পনাজগতের মধ্যে চিরকালীন মানুষের যে অনুভূতি আচ্ছন্ন থাকে কবি অনুসন্ধান করিয়াছেন পরিশোধে তাহাই। কবিতাতে কবির অনন্য বাক্-প্রতিমা উপযোগী আবহসৃষ্টিতে সার্থক রূপ লাভ করিয়াছে। শৃঙ্খলিত বজ্রসেনের সুন্দর দেহকান্তিতে মুগ্ধা শ্যামার প্রেমাভিব্যক্তির বাক্ সৌন্দর্য, মৌন-মুখর মধ্যাহ্নের সুন্দর বর্ণনা, পক্কশস্যগন্ধহরা মধ্যাহ্নের বায় ঘোমটাখসা নায়িকার অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী দর্শনে নায়কের তৃপ্ত দৃষ্টি ও তৃষাতুর মনের বর্ণনায় কবি অনবদ্য।

অতীত ঐতিহ্যে অবগাহন করিলেও মানবীয় কবিমন মানব মহিমার উপলব্ধির মধ্যেই পরিপূর্ণ। তাই 'বুদ্ধদেবের মহাজীবন পাঠে' বারংবার কবির মনুষ্যত্বে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। উনবিংশ শতকের নবজাগরণের যুগে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি যে প্রকাশোন্মুখ ভূমিকার অবকাশ রাখে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বহু রচনায় তা আভাসিত করিয়াছেন। কথা'র কবিতাগুলিতে তারই প্রথম প্রকাশ। বৌদ্ধধর্মের

অলৌকিকতাবর্জিত, সুকুমার মানবিক বৃত্তির সঙ্গে ভারসাম্যের ফলে আদিকর্মিক এই কাব্যস্রষ্টা জীবনরসে সমুজ্জ্বল অবদান কাহিনীকে কবিত্বের আলোক প্রক্ষেপে গাঁথাকাব্য বা ব্যালাডে নবরূপ দিয়াছেন। উৎস হইতে কাব্য তাৎপর্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া বর্তমান যুগপরিবেশের প্রেক্ষিতে স্থাপন করিলেও কথা কাব্যের ব্যালাডগুলি অসীম তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়া ধরা দেয়। কবি রবীন্দ্রনাথ — 'সকল প্রসঙ্গেই বিশ্বব্যাপ্তি প্রত্যাশী, নির্বিশেষ মানবতার পিয়াসী, তার দেশ কাল যুগ নিরবচ্ছিন্ন সংযোগে আন্তর্জাতিকতামুখী। ঐতিহ্যপ্রবণতা ও আশাবাদের, ভাবসম্পদের উত্তরাধিকার হিসাবেই রবীন্দ্রকাব্যে আসিয়াছে। 'কথা' কাব্যে ইহারই প্রকাশ। কবির অন্তহীন জীবন-জিজ্ঞাসা ও অনুভূতিই যেমন তাঁহাকে করিয়াছে আধুনিকতম বিশ্ববাসীর প্রতিনিধিজ্ঞাপক তাঁর সাহিত্যও তেমনি বিচিত্র উৎসমূলক হইয়া ও নবনির্মিতির তথা সাহিত্যের তত্ত্ববিশেষের পরিভাষায় রচনা (plural Text) হইয়া উঠিয়াছে। রচনারই এক অপূর্ব উদাহরণ কবি বিনির্মিত 'কথা' কাব্যখানি।

রাজসভার সাহিত্য

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা :

প্রাগাধুনিক সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতা। এ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক অভিমত। সভাকবিদের রাজস্তুতি—রাজনৈতিক উত্থানপতনের সঙ্গে কবিদের ভাগ্যের উত্থান পতন—রাজসভার কবিদের জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা— সভাকবিদের রাজপারিতোষিক লাভের দৃষ্টান্ত— ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের সভাকবি পঞ্চক, রানী ভিক্টোরিয়ার সভাকবি টেনিসন—বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কালিদাস এবং হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের সভাকবি বাণভট্টর তুলনা।

।। কেন্দ্রীয় রাজসভা।। (**Central Court**)

গৌড়ের পাল রাজা ও সেনরাজাদের সভাকবিবর্গ— পালরাজাদের রাজপৃষ্ঠপোষকতা— সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার সভাকবি পঞ্চক — উমাপতি, গোবর্ধন, শরণ, ধোয়ী, জয়দেব। সেন রাজসভার ধর্মীয় পরিবেশ ও জয়দেবের গীতগোবিন্দে তার প্রতিফলন। শৃঙ্গার শ্লোকরচনায় সমকালীন সভাকবিদের সঙ্গে জয়দেবের যোগ— রাজসভার নৃত্য গীত পরিবেশন ও গীতগোবিন্দে তার নিদর্শন। গৌড়ের মুসলমানী যুগ— সুলতানী পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা অনুবাদ চর্চা— রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের কাছ থেকে মালাধর বসুর গুণরাজ খাঁ উপাধি লাভ— কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে পারিতোষিক লাভ— গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের আমলে রাজপৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত অনুবাদ— বাংলা কাব্যে হোসেন শাহ প্রশস্তি।

।। প্রত্যন্ত রাজসভা।। (**Border Court**)

ক. মিথিলা : বৃহৎবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তের অন্তর্গত মিথিলার কামেশ্বর রাজবংশ : শিবসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যাপতির পদরচনা, বিদ্যাপতির রাজ-নামাঙ্কিত পদ, বিদ্যাপতির শাস্ত্রচর্চা ও শৃঙ্গার রস চর্চায় একাধিক রাজপৃষ্ঠপোষকতা, বিদ্যাপতির যুদ্ধকাব্য রচনায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, বিদ্যাপতির কাব্যে সভাকবির রুচি ও রীতি।

খ. কামতা : বঙ্গের উত্তর প্রান্তবর্তী রাজ্য কামতা বা কুচবিহার। মিথিলা, ত্রিপুরা ও আরাকানের সঙ্গে কামতার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ— কামতা রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা— কুচবিহারের রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপক পুরাণ চর্চা।

গ. ত্রিপুরা : বঙ্গের পূর্ব প্রান্তবর্তী ত্রিপুরার রাজভাষা বাংলা— বাংলা ভাষায় ত্রিপুরার রাজবংশকীর্তি কাহিনী রচনা রাজমালায় ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস— ত্রিপুরার রাজাদের বাংলা সাহিত্য চর্চা— রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজপরিবারের বন্ধুত্ব— কবির রাজপ্রশস্তি।

ঘ. আরাকান : বঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তবর্তী সীমান্তরাজ্য আরাকান— গৌড়বঙ্গের সঙ্গে আরাকানের রাজনৈতিক যোগ-বর্মী মুসলমান আরাকানরাজ থিরি থু ধুম্মার আমলে সভাকবিরূপে দৌলতকাজীর লোরচন্দ্রাণী রচনা— পরবর্তী আরাকানরাজ থদো মিন্তার ও চন্দ্র সুধর্মার আমলে আলাওলের কাব্য রচনা-দৌলত কাজী ও আলাওলের রচনায় রাজসভার উপযোগী প্রেম ও যুদ্ধের রোমান্স বর্ণনা — দৌলত ও আলাওলের রাজস্তুতি ও মন্ত্রী প্রশস্তি।

বঙ্গের আভ্যন্তরীণ রাজসভা

ক. ।। বিষ্ণুপুর রাজসভার সাহিত্য।।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের পরিচয়— বীর হাম্বীরের বৈষ্ণবধর্মগ্রহণ— বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণব মন্দির প্রতিষ্ঠা — বিষ্ণুপুর রাজসভায় বৈষ্ণব পুরাণচর্চা-শঙ্কর কবিচন্দ্রের কাব্য রচনা-বিষ্ণুপুর রাজাদের পদরচনা ও সঙ্গীত চর্চা।

খ. ।। কৃষ্ণনগর রাজসভা।।

কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা সভাপণ্ডিতবর্গ— ভারতচন্দ্রের আগমন—রাজসভার কবিরূপে ভারতচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা— অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার পিছনে রাজস্বপ্ন ও কবিস্বপ্নের যুগ্ম প্রেরণা— অন্নদামঙ্গলের সঙ্গে বিদ্যাসুন্দর পালাযোজনার মধ্যে গূঢ় রাজঅভিসন্ধি— ভারতচন্দ্রের রাজসভাবর্ণন ও রাজপ্রশস্তি— ভবানন্দসহ মানসিংহ পালার মধ্যে ভারতচন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণনা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টি— ভারতচন্দ্রের কাব্যে ভোগবাদী ও আলঙ্কারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজসভার বৈদগ্ধ্য।

গ. ।। বর্ধমান রাজসভা।।

বর্ধমান রাজবংশের ইতিহাস— সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা কবিতায় রাজস্তুতি— তেজচাঁদের আমলে রাজসভায় শাক্ত কবি কমলাকান্তের আগমন— বর্ধমানরাজ মহতাব চাঁদের শাক্ত পদ— মহতাব চাঁদের বিদ্যোৎসাহ ও তাঁর রাজসভায় রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ— মহতাব চাঁদের দুই সভাকবি রমাপতি ভট্টাচার্য ও প্যারীচাঁদ কবিচন্দ্রের কাব্য সঙ্গীত রচনা।

সভাকাব্যের ধারা :

১। ইতিহাসাশ্রিত রাজন্যচরিত রচনা। রামচরিত— চিত্র চম্পূ

২। ক্ল্যাসিক্‌স ও পুরাণ চর্চা । রামায়ণ, মহাভারত অনুবাদ

৩। রোমান্স চর্চা। পবনদূত— বিদ্যাসুন্দর

৪। গীতিচর্চা। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী, লৌকিক প্রণয় গীত।

রবীন্দ্রনাথের লোকায়ত মানসের অনুসন্ধান

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

লিখিত সাহিত্যের মহান সৃষ্টিগুলির মধ্যে লোকায়ত শেকড়ের সন্ধান চলছে বহুকাল ধরে। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতির প্রাজ্ঞ গবেষকগণ মনে করেন, কোনো প্রতিভাবান মহৎ স্রষ্টাই লোক-ঐতিহ্যের প্রাণময় বিষয়সমূহকে কখনই উপেক্ষা করতে পারেন না। বিশেষ করে, কথাসাহিত্য এবং যেসব কাব্যে কাহিনীর বিষয় রয়েছে সেইসব সাহিত্যিক ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির উপাদান সহজলভ্য হয়।

এতকাল এইসব সাহিত্যের মধ্যে লোকসাংস্কৃতিক উপাদান অনুসন্ধানের চিরাচরিত প্রথা অনুসরণ করা হতো। কিন্তু ইদানীং লোকসংস্কৃতির দু'টি পদ্ধতি প্রয়োগের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অবশ্য আমাদের দেশে এই গবেষণা এখনও একেবারেই ব্যাপক নয়। লোকসংস্কৃতির উপাদান অনুসন্ধানের প্রথাগত পদ্ধতিতে মহান স্রষ্টার অন্তরের ও ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়না। কিভাবে পারিপার্শ্বিক জনগোষ্ঠী, ঐতিহ্যলালিত মানসিকতা ও মনন 'উচ্চতর' সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় তার সন্ধান প্রথাগত গবেষণায় সম্ভব নয়। সাহিত্যিক কোনোভাবেই সচেতনভাবে লোকসংস্কৃতির উপাদান গ্রহণ করেন না,— এই মানসিক ও মানবিক সেতুবন্ধনের পরিচয় পাওয়া যাবে অন্য দু'টি পদ্ধতিতে। সচেতনভাবে উপাদান ব্যবহৃত হলে তা আরোপিত ভাবনা বলে বিবেচিত হয়। এই দুই পদ্ধতির সাহায্যে আরোপিত ভাবনারও হদিস মিলবে।

প্রথম পদ্ধতিটি হলো লোকসংস্কৃতির রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির অন্তর্গত। অ্যালান ডানডেস্ লোকসংস্কৃতি-বিশ্লেষণের পথ ধরে ভ্লাদিমির প্রপ ও ক্লদ লেভি-স্ট্রসের তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করে 'মোটিফেম' নামে একটি নতুন সূত্রের আবিষ্কার করেন। এই সূত্রের অনুষঙ্গে তিনি দু'টি মোটিফেমের সন্ধান পেলেন। Lack and Liquidition of Lack : L , LL.অভাববোধ ও অভাববোধ থেকে অভাব-দূরীকরণ। লোকসংস্কৃতির সমস্ত আঙ্গিকের মধ্যে এই দুই মানসিকতার সন্ধান পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'প্রথম পূজা' কবিতায় আমরা এই পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করতে পারি ?

১. প্রথম পূজা : অভাববোধ

ক. কিরাত আজ অস্পৃশ্য, এ মন্দিরে তার প্রবেশপথ লুপ্ত

খ. চিনতে পারে নিজেদেরই মনের আকল্প, বহু দূরের থেকে প্রণাম করে

গ. কী হবে মন্দিরসংস্কারে যদি মলিন হয় দেবতার অঙ্গমহিমা

ঘ. আঙুলের স্পর্শ দিয়ে পাথরের সঙ্গে কথা কয়

২. প্রথম পূজা : অভাবপূরণ

ক. মাধব খুলে ফেললে চোখের বাঁধন

খ. একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে,
দুই চোখে বইল জলের ধারা।
এক হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা
দেবতার সঙ্গে ভক্তের ।

ব্রাত্য শিল্পীর যন্ত্রণা ও মানবিক ক্ষুধা যে অভাব সৃষ্টি করেছিল, দেবতার মূর্তিকে দেখে তা পূরণ হলো।

অন্য যে পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা হয় তা মোটিফ সূচি। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে অ্যান্টি আর্নে ও স্টিথ টমসনের পরিশ্রমী গবেষণায় মোটিফ সূচির প্রাথমিক রূপ পাওয়া যায় এবং পাঁচের দশকে তা পূর্ণতা পায়। লৌকিক ঐতিহ্যের প্রাণকে খুঁজে পাওয়া যায় এই পদ্ধতির মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থ 'সে' গল্পের মধ্যে আমরা মোটিফ সূচির অনুসন্ধান করতে পারি। 'সে' গ্রন্থের কয়েকটি মোটিফের উল্লেখ রয়েছে যেসব বাক্যে তা উদ্ধৃত করছি।

১. বিধাতা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন।

২. গড়ে উঠল কত রাজপুত্তুর, মন্ত্রীর পুত্তুর, সুয়োরানী, দুয়োরানী, মৎস্যনারীর উপাখ্যান।

৩. এক যে ছিল রাজা।

৪. সে মানুষ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না।

৫. তার পরে বুঝে নেবেন চিত্রগুপ্ত।

৬. বীরাঙ্গনা ভারি খুশি।

৭. আর রাজকন্যা যার চুল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, যার হাসিতে মাণিক, চোখের জলে মুক্তো।

৮. দৈত্যপুরীর ব্যাঙের ছাতার মতো।

৯. সেই গাছই হবে কল্পতরু।

১০. তাঁর তপস্বিনী কনেকে বর দিতে এলেন।

এই ধরনের প্রায় দেড়শ মোটিফের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে 'সে' গ্রন্থে।

মোটিফের সূচি অনুযায়ী সেগুলি হবে এইরকম :

১. এ ১২৪.৭ গণেশ

২. এ ৪৬২ . ১ রূপের দেবী

৩. এ ৬৬১ স্বর্গ

৪. বি ৪১.২ পক্ষিরাজ ঘোড়া

৫. বি ২৪০.৫ বাঘ

৬. ই ৫৭৮ ভূত

৭. এফ ৫৫৫ আশ্চর্য চুল

৮. এন ১০১ নিষ্ঠুর নিয়তি

৯. পি ২৫৫ রাজপুত্র

১০. এক্‌স্ ১৫০৩ সেই দেশ যেখানে অসম্ভব যত কান্ড ঘটে।

লিখিত চিরায়ত সাহিত্যে লৌকিক মানসের সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে লোকসংস্কৃতির এই দু'টি পদ্ধতির প্রয়োগে।

উত্তর আধুনিকতা : ওদের আর আমাদের

দীপেন্দু চক্রবর্তী

পাশ্চাত্যে উত্তর- আধুনিকতা বলতে শুধু শিল্পসাহিত্যের একটি বিশেষ তত্ত্ব বোঝায় না, বোঝায় একটি বিশেষ বিশ্ব-বীক্ষাকেও। আধুনিকতার কালিক সমাপ্তিতেই উত্তর-আধুনিকতার সূচনা এমন মনে করারও কারণ নেই। যেহেতু এখনও আধুনিকতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। অনেকে মনে করেন আধুনিকতা ও উত্তর- আধুনিকতা অনেক ক্ষেত্রেই সমান্তরাল অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। তবে এটা আবশ্যই বলা সম্ভব, আধুনিকতার মৃত্যু পরোয়ানাই উত্তর- আধুনিকতা বা post- modernism। আধুনিকতা বা modernism ছিল বাস্তবতা বিরোধী ব্যক্তি চেতনার চূড়ান্ত পরিণতি, কিন্তু উনিশ শতকীয় যুক্তিবাদ ও জ্ঞানচর্চার (enlightenment) কাঠামোর মধ্যেই ছিল তার প্রতিবাদ। নগরসভ্যতার অবধারিত বিচ্ছিন্নতা বোধে পীড়িত ছিলেন 'আধুনিকতাবাদী' শিল্পী- সাহিত্যিকেরা। প্রথাগত শিল্প-কাঠামোর ভাঙন তাঁদের অভীষ্ট হলেও তাঁদের অসংহত শিল্প- ভাষার মধ্যেও প্রচ্ছন্ন ছিল সংহতির আকাঙ্ক্ষা, বাস্তবের (the real) সান্নিধ্য। উত্তর আধুনিকতা যুক্তি ও প্রগতির (Kant, Hegel, Marx) তথাকথিত ইতিবৃত্তের (Grand Narrative) প্রতি গভীর আস্থাহীনতা থেকে জন্ম নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে post-industrial সমাজ তৈরি হয় তার প্রভাবে সৃষ্টি হয় এই নেতিবাচক নৈরাজ্যবাদী মনোভাব। প্রযুক্তির অমোঘ আঘাতে সনাতন বাস্তববোধ নিঃশেষিত হয়, ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের দাপটে ও বাজারি অর্থনীতির চূড়ান্ত বিকাশে সনাতন মানবতাবাদ বাতিল হয়ে গিয়ে জন্ম নেয় ভোগ্যপণ্যের আধিপত্য, যেখানে ব্যক্তিসত্তাও অবলুপ্ত হয়। অথচ তার জন্য অনুশোচনা নয়। এক অভূতপূর্ব আনন্দদায়ক সম্ভোগই হয়ে ওঠে আজকের সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর ফলে আমাদের সব কিছুই হয়ে ওঠে একধরনের খেলার মতো। জীবনের অর্থহীনতা নিয়ে মজা করার প্ররোচনা থাকে এই খেলায়। তাই parody হয় শিল্পসাহিত্যের প্রধান ভাষা। আবার parody- কে ছাড়িয়ে যায় pastiche, জোড়াতালির ভাষা। যেহেতু ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাই আর বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাই কোনো শিল্পরীতিরই পৃথক অস্তিত্ব আর নেই। এমন কী স্থাপত্যেও উত্তর আধুনিকতা নানান শিল্পরীতির অসংহত অবস্থান ঘটায়। আধুনিকতায় ভাষা সহস্র ভাঙনেও অর্থের বাহক, উত্তর-আধুনিকতায় ভাষা আর বস্তুর প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম নয়। তাই communication এর ধারণাটাই চলে যায়। শুধু শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, চিন্তা- ভাবনা ও ভাষার ক্ষেত্রেও এমন কী ব্যক্তিসত্তার ক্ষেত্রেও আর কেন্দ্রিক কাঠামো বা unifid structure সম্ভব নয়। এখানেই post-modernism এর সঙ্গে post- structuralism এর আত্মীয়তা। Lyofard, Hassau, Baudrillard, এবং Foucault Derrida- র নৈকট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে এভাবেই। উত্তর- আধুনিকতা শেষ বিচারে এক চূড়ান্ত নেতিবাচক, নৈরাশ্যবাদী দর্শন হাজির করে বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে। স্বভাবতই মার্কসবাদের সঙ্গে এই দর্শনের মুখোমুখি সংঘাত অপ্রতিরোধ্য। আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের ধাঁচে উত্তর- আধুনিকতার প্রসার ঘটে নি, যেহেতু আমাদের সমাজ সে-অর্থে post-industrial হয়ে ওঠে নি। পাশ্চাত্যের উত্তর- আধুনিকতা late capitalism -এর প্রতিফলন। আমাদের ধনতন্ত্র এখনও সে পর্যায়ে পৌঁছয় নি। আমাদের নগরসভ্যতা এখনও সেভাবে গ্রামীণ সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নি। তাই শিল্প- সাহিত্যে এখানে আধুনিকতার প্রাধান্য এখনও উল্লেখযোগ্য। তবে কতিপয় লিটল ম্যাগাজিন ও কবি এক ধরনের উত্তর- আধুনিকতার কথা বলছেন

যা অবক্ষয়ী আধুনিকতার সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে এক নব যুগ নব জীবনের নির্দেশ দিতে পারে ।এ ধরনের কর্মসূচীর পশ্চাতে সক্রিয় এক ইতিবাচক প্রগতিশীল ভাবনা । যা পাশ্চাত্যের উত্তর- আধুনিকতার বিপরীত । পাশ্চাত্যের উত্তর- আধুনিক শিল্প-রীতিতে elitism এবং popular art-এর সীমারেখা মুছে গেছে । এখানকার উত্তর- আধুনিক কাব্য এখনও এই সীমারেখা অতিক্রম করার কথা বলে না । Parody or pastiche - এর চাইতেও তাতে বেশি পরিমানে (nostalgia) অতীতকাতরতা ও মানবিক মূল্যবোধের আর্তি চোখে পড়ে । প্রশ্ন উঠতে পারে:এরকম পার্থক্য সত্ত্বেও কেন উত্তর-আধুনিক কথাটার প্রয়োজন আমাদের দেশীয় প্রেক্ষিতে ? মার্কসবাদের সঙ্গে এই দেশীয় উত্তর- আধুনিকতার সংলাপ কীভাবে সম্ভব, এটাও আলোচনার বিষয় । পাশ্চাত্যের উত্তর- আধুনিকতাও আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে একটু একটু করে গ্রাস করছে, এই অবস্থায় আমাদের উত্তর- আধুনিকতার রণ-কৌশল কীরকম হওয়া উচিত? এমন সব প্রশ্নের মুখোমুখি না হলে আমাদের উত্তর- আধুনিকতা হবে নিতান্তই এক কাগুজে লড়াই ।

গ্রন্থতালিকা :

১. A Reader's Guide To Contemporary Literary Theory, Raman Selden, Harvester Wheat sheaf,1989.
২. Contemporary Cultural Theory, Andrew Miller UCL Press, 1994
৩. A Critical and Cultural Theory Reader, ed. Antony Easthope and Kate McGowan, Open University Press.1992
৪. Modern Literary Theory, A Reader, ed. philip Rice & Patricia Wungh, Edward Arnold, 1989
৫. Shadow of Spirit: Post- Modernism And Religion, ed. Philippa Berry & Andrew Warnick, Rontcledge, 1981
৬. The Post - Modern Condition : A Report on Knowledge, M.V.P.,1984
৭. উত্তর - আধুনিকতা কবিতা, আলোচনাচক্র, ১৯৮৯

গণ-নব-সৎ নাট্য আন্দোলন

দর্শনানন্দ চৌধুরী

১. 'শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্পসাহিত্যও দ্বিধাবিভক্ত'-লেনিন

২. ' সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট হলো সামরিক ফ্রন্টের মতোই আরেকটি ফ্রন্ট'-মাও

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতিতে এদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পরিবেশে গড়ে ওঠে ' ফ্যাসী বিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘ' ১৯৪২-এর২৮মার্চ । এর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'প্রগতিলেখক সংঘ' এবং ' লীগ এগেইনষ্ট ফ্যাসিজম এ্যান্ড ওয়ার' যথাক্রমে ১৯৩৬ এবং ১৯৩৭

খ্রীস্টাব্দে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আসন্নকালে স্বৈরতন্ত্রের নখদন্ত বিস্তারে ভাবিত হয়েছেন পৃথিবীর চিন্তাশীলদের সঙ্গে এদেশীয় চিন্তাশীলরাও । এবং পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের ও শিল্পীসাহিত্যিকের গণ-সংগঠনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন । তাঁরা অঙ্গীকার করলেন:

'যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে তাকে আমরা প্রগতিবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি । যা কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ শৃঙ্খলাপটু সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করবো'।

ফ্যাসীবিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘের সাংস্কৃতিক শাখা হিসেবে বাংলায় গণনাট্যসংঘ ১৯৪২ থেকেই গঠিত হয় । এর আগেই গণনাট্যসংঘের প্রথম ইউনিট অনিল ডি' সিলভার সম্পাদকত্বে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে বাঙ্গালোরে প্রতিষ্ঠিত হয় । বোম্বাইয়ে 'জননাট্য' গঠিত হয় ১৯৪০-এই । মানুষের মুক্তিকামী আশা - আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্য চল্লিশের দশকের গোড়াতে এভাবে এইসব সংগঠন গড়ে উঠেছিল ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি, দুর্ভিক্ষ,মন্বন্তর, মড়ক, বন্যা-ঝড়, কালোবাজারি, মুনাফাবাজি- গণনাট্য সংঘকে জনগণের সামনে নিয়ে আসতে উজ্জীবিত করেছে । গানে,নাচে, ছায়ানৃত্যে, ট্যাব্‌লো এবং নাটকে সারাদেশবাসীর মনোবেদনা ও প্রতিরোধের ছবি এরা দেশের নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন ।

শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অত্যাচারীর মুখোশ খুলে দেওয়া, মুনাফাখোর, মজুতদারের লোভ লালসা প্রকাশ করা, অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক অবক্ষয়ের বেদনাময় নগ্নরূপ, এবং এর সঙ্গে মুক্তিকামী মানুষের জীবন-সংগ্রাম,প্রতিরোধ ও বাঁচার লড়াইকে সামনে এনে, মানুষের মুক্তি ও শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের উপস্থিত সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলা —এই ছিল ভারতীয় গণনাট্যসংঘের সকল সাংস্কৃতিক কাজের অনুপ্রেরণা ।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ নাট্য প্রযোজনার যে দায়িত্বে এগিয়ে এলেন তাতে নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র, রূপকল্পনা এবং সবার উপরে একটি বিশেষ ভাবাদর্শ মাথায় রেখে শিল্পের সামাজিক দায়বদ্ধতা— সব মিলিয়ে বাংলা নাট্যধারায় নতুন প্রাণাবেগ সৃষ্টি করল । এবং বাংলা নাট্যধারার নতুন দিক পরিবর্তন ও ভাবনা চিন্তার উন্মেষ ঘটাল । বিপ্লবী নাট্যকার ব্রেখটের মতোই তারা বলতে পারলেন:

'Our audience must not hear only how prometheus was set free, but also train themselves in the pleasure of freeing him.'

অথচ এই সময়কালের চলতি বাংলা নাটকের মধ্যে সেই মানসপরিবর্তন লক্ষ করা গেল না । পরিবর্তিত নতুন জীবনভাবনা থেকে বাংলা নাটক অনেক দূরে পড়ে রইলো । বৃহত্তর জনসমষ্টিকে বাদ দিয়ে আমাদের এতোদিনকার নাট্যধারা প্রবাহিত হয়েছে বলে উনিশ ও বিশশতকের প্রথমাবধি বাংলা নাটক ও নাট্যশালা বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারেনি । সমাজজীবনের বিপর্যয় থেকে উটপাখির মতো মুখ লুকিয়ে সেই গতানুগতিক ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং সামাজিক নাটক অভিনয় করে চলেছে । বাংলা নাটক তখনো আবেগসর্বস্ব জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবপ্রবণতা কিংবা দৈবলীলার ভক্তিভাষ্য নিয়েই মশগুল ছিল । গলিতনীতি, ধর্ম ও দেশাভিমানের তরল আবেগসর্বস্বতার সীমাবদ্ধ গণ্ডিতেই বাংলা নাটকের চর্বিতচর্বণ চলছিল । গণনাট্যসঙ্ঘের নাট্যপ্রচেষ্টা সেখানে নিয়ে এল নতুন প্রাণের জোয়ার । নতুন প্রাণবন্যায় বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ধারায় দিকপরিবর্তনের সূচনা করলো ।

১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পরেই গণনাট্যসঙ্ঘে ভাঙন দেখা দিতে থাকে । রাজনীতিগত, সংগঠনগত এবং ব্যক্তিগত টানাপোড়েনে গণনাট্য সঙ্ঘের পথচলা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল । এরমধ্যে ১৯৪৮ -এই স্বাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেসি সরকারের আমলে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ স্বভাবতই তার স্বতঃস্ফূর্ত কাজকর্ম করে উঠতে পারলনা । শিক্ষা ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব দিয়ে যারা শোরগোল তুলেছিলেন, তারা এবারে গণনাট্যসঙ্ঘের বাইরে গিয়ে নিজেদের নিজস্ব নাট্যদল গড়ে তুলতে লাগলেন । গণনাট্য সঙ্ঘে এদের হাতেখড়ি চলে, এদের নবপ্রতিষ্ঠিত নাট্যদলে গণনাট্যের অনেক সুফল কার্যকরী হলো । শুধুমাত্র রাজনৈতিক চেতনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার শর্তগুলি পাশে সরিয়ে রাখা হলো ।

রাজনীতিযুক্ত অথচ শিল্পসম্মত নাটক করার তাগিদে এই নতুন নাট্যদলগুলি এদেশ-বিদেশের নানা নাটকের সম্ভার সাজিয়ে তুলতে লাগলেন । তাতে 'শিল্পের জন্য শিল্প' — এই বহুপুরানো অভিধা কার্যকর হলো । 'শিল্প মানুষের জন্য' এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্পসাহিত্য শ্রেণীসংগ্রামের ' হাতিয়ার'— এখানে প্রায়শই বিসর্জিত হলো । উল্লসিত ভাববাদী শিবির সেদিন লিখেছিল :

' আচার্য শম্ভু মিত্রের কথা বলছি, যিনি গণনাট্যের রাজনৈতিক নাগপাশ থেকে নাটককে নবনাট্যের মুক্তিতীর্থে এনে পৌঁছে দিয়েছিলেন ।'

এখানে গণনাট্য সঙ্ঘের রাজনৈতিক দায় রইলো না, নাটক করে জেলে যাবার বা প্রাণের ভয় রইলো না । উপরন্তু কংগ্রেসি সরকারের শিরোপা, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও অর্থ জুটলো । এই শুরু হলো নবনাট্য-আন্দোলন । প্রতিক্রিয়ার শিবির হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ।

রাজনৈতিক সচেতনতা হারিয়ে ফেলে, নাট্যশিল্পের দিকে অধিক জোর দিয়ে মোটামুটি জীবনধর্মী নাটক এখানে হলো । তার সবটাই অবশ্য কলকাতায় । তার বাইরে গিয়ে নাটক করার প্রেরণা এদের নেই ।

১৯৬০- এর দশকের পরেই নবনাট্য ধারার দলগুলি ক্রমে গ্রুপথিয়েটার নামে পরিচিত হতে থাকল । এদের নাটকের সংজ্ঞায় এরা কখনো বলল 'ঠিক নাটক', কখনো ঘোষণা করলো অন্য থিয়েটার (মার্কিনী থিয়েটার আন্দোলনের ধাঁচে) কিংবা বলল ' সৎ নাটক' । সততা কার প্রতি তা কখনেই এদের বক্তব্য বা স্যুভেনিরে প্রকাশ পেলনা । স্বভাবতই ধরে নেওয়া যায়, এই সততা মানুষের প্রতি । এদের সংগ্রাম সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে, ভেদবুদ্ধিহীন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশে দেশে সংগ্রামশীল মুক্তিকামী মানুষের লড়ইয়ের সপক্ষে । তা করতে গিয়ে এরা এদেশের ঐতিহ্যাগত নাটক থেকে বিদেশের নানা শ্রেণীর নাটক বাছাই করলেন । নতুন নাট্যকার সৃষ্টি হলো । নাট্য-উপস্থাপনায় আধুনিক নাট্যভাবনা ও শিল্পগত উৎকর্ষ নির্মাণ করা হলো ।

কিন্তু গণনাট্যের রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের মহান ব্রত থেকে দূরে সরে গিয়ে সততার পথ হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন । গণ-নব-সৎ—বাংলা নাট্য আন্দোলনে তিনটি পৃথক স্তর তৈরি করে দিল । তিনটির শ্রেণীগত চরিত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা : নতুন বিশ্লেষণ

নির্মলনারায়ণ গুপ্ত

এ কালে প্রাপ্ত ও প্রকাশিত যে-কোনো প্রাচীন পুঁথির মতোই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত পুঁথিটিও লিপিপ্রমাদ ও ভাষামিশ্রণ এড়াতে পারেনি। এ সত্ত্বেও এ পুঁথির অজ্ঞাত পরিচয় লিপিকর'রা ভাষার প্রাচীন রূপটি বহুলাংশে বজায় রেখেছেন।

মাগধী প্রাকৃত অপভ্রংশজাত ভগিনীস্থানীয়া ভাষাগুলি অসমীয়া-বাংলা-ওড়িয়া-মৈথিলী— চর্যাপদ রচনাকাল থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত তাদের সমরূপতা অনেকাংশে বজায় রেখেছিল। ভাষাগুলির শৈশবকালীন একরূপতা থেকে স্বতন্ত্র হতে কয়েক শতাব্দী লেগেছে। সন্তুলক পাঠে দেখা যায়, ওড়িয়া কবি শারলা দাস, মিথিলার পণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর, অসমীয়া কবি হেম সরস্বতী— চতুর্দশ শতকের এই কবিদের ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষাতেও রক্ষিত।

একই সঙ্গে অসমীয়া-ওড়িয়া-মৈথিলীর সঙ্গে, আবার বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্তের কথ্যবুলির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাগত মিল বড়ু চণ্ডীদাসকে কোনো আঞ্চলিক সীমানায় না হলেও কালসীমায় অবশ্যই চিহ্নিত করে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল সম্পর্কে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. সুকুমার সেনের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। ড. সেনের বক্তব্য অনুসারে কৃকীর ভাষার তথাকথিত 'ব্রজবুলি' ও 'ফারসী' প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা ও বর্ণরত্নাকরে অনুরূপ তাৎপর্য বিশ্লেষণ।

ড. উপেন্দ্রনাথ গোস্বামীর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আরু অসমীয়া ভাষা' প্রবন্ধের বক্তব্যের সন্তুলক পাঠ (অসমীয়া-ওড়িয়া)।

প্রাচীন মৈথিলী ও কৃকীর ভাষাগত সাদৃশ্যের আলোচনা।

কৃকীর ভাষায় অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ সাহা উল্লেখিত 'ঝাড়খণ্ডী উপভাষা'র মিল এবং পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার সঙ্গে সন্তুলক পাঠ।

ঝাড়খণ্ডী উপভাষার তুলনায় পূর্ববাংলার কথ্যভাষার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার বহুতর মিল— সন্তুলক পাঠ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ।

পরিবেশ ও রসায়ন

নিত্যানন্দ সাহা

জীবন ও পরিবেশ অবিচ্ছিন্ন। অবশ্য পরিবেশ বা এনভায়রনমেন্ট (Environment) কথাটি আপেক্ষিক-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক পরিবেশ। সভ্যতার অগ্রগতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়যাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে শিল্পায়ন ও নগরায়ন এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে এবং হচ্ছে। মানুষের তথাকথিত উন্নতি যেমন অব্যাহত, প্রকৃতি দূষণও তেমনি অব্যাহত। বাতাস, জল, মাটি-সর্বত্রই দূষণ। মানুষের লাগামহীন আশা আকাঙ্ক্ষা ও ভোগবাদী

সমাজের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে দূষণের মাত্রা সহনশীলতার সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে। দূষণ রোধে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার নানাবিধ আইন প্রণয়ন করছে, সভা সমিতি, কর্মশালা ও আলোচনাচক্রের আয়োজনও হচ্ছে— উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ সবাই আলোড়িত। ১৯৯২'র রিও বিশ্বসম্মেলন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ— কিন্তু নির্মল বাতাস, সুপেয় জল পেতে হলে এখনও অনেক পথ যেতে হবে। সর্বাগ্রে চাই আপামর জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ-চেতনা— স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে পরিবেশ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি।

আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্র্যই যে সবচেয়ে বড়ো দূষণ— একথা পুরোপুরি মেনে নিয়েও বলা যায় যে পরিবেশ দূষণের যতরকম উৎস জানা গেছে— রসায়ন ঘটিত দূষণ তাদের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক— অন্যদিকে রসায়ন নির্ভর শিল্পই দেশের অগ্রগতির অন্যতম সোপান। ইদানিং পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত যে কোনো আলোচনায় শোনা যায়ঃ

(১) বাতাসে কার্বনমনোঅক্সাইড, নাইট্রোজেন, অক্সাইডস, সালফারডাইঅক্সাইড, ভাসমান কণা, এমনকি সীসার মতো ভারী ধাতুর পরিমাণ বাড়ছে।

(২) শিল্পের বর্জ্যপদার্থের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে জলে পারদ (মারকারী) ও অভাবনীয় সব রাসায়নিক যৌগের উপস্থিতি বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—

(৩) বায়ুমণ্ডলে 'ওজনের' স্তর ক্রমশ হাল্কা হচ্ছে—

(৪) অম্লবৃষ্টি হচ্ছে—

(৫) 'গ্রীনহাউস এফেক্টের' ফলশ্রুতি হিসাবে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে— প্রকারান্তরে তাপমাত্রা ক্রমশ ঊর্ধ্বগতি হয়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে।

পরিবেশ দূষণের উপরোক্ত ঘটনাগুলোর মূলে রসায়ন— আবার প্রতিরোধও রসায়ন। বর্তমান আলোচনার স্বল্পপরিসরে তারই কিছু আলোকপাতের প্রচেষ্টা।

প্রাক্-স্বাধীনতা-পটে গণনাট্য : নবান্ন

নির্মলেন্দু ভৌমিক

১. আধুনিক সমালোচনার দৃষ্টিকোণের বিশেষত্ব হলো— কোনো পূর্বনির্দিষ্ট সমালোচনা-তত্ত্ব দিয়ে সাহিত্য বিচার্য নয়। সেই বিশেষ সাহিত্য-সামগ্রীটিকে বিচার করতে হবে, তারই সংশ্লিষ্ট অনুষঙ্গ ও পটভূমিতে , রচনাটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য ও তার প্রকাশরীতির আলোকে একেই বলা হয়— operational theory of criticism। অর্থাৎ সমালোচনার কোন্ দৃষ্টিকোণটি সেখানে operate করবে,(বা সেই রচনাটি যে বিশেষ দৃষ্টিকোণটি দাবি করছে), সমালোচককে সেই দিক থেকেই তার আলোচনা-বিচার করতে হবে। এজন্যে চাই সমালোচকের স্বচ্ছ দৃষ্টি, উদার রসবোধ এবং নিরাসক্তির বোধ।

২. 'নবান্ন' (প্রথম অভিনয়: ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৪। 'শ্রীরঙ্গম' থিয়েটারে, অধুনা 'বিশ্বরূপা') নাটক বিচারের পূর্বেও এর operational দিকটি স্থির করে নিতে হবে। দেখা যায়, এই নাটকের কয়েকটি বিশিষ্ট দিক আছে, কিন্তু কার্যকালে, বঙ্গীয় সমালোচকগণ এর এক-একটি বিশেষ দিককেই কেবল প্রাধান্য দিয়েছেন; সর্বদিকগুলি সমন্বিত করে এর পূর্ণাঙ্গ operational দিকটি তুলে ধরেন নি। এই নাটকের সেই বিভিন্ন দিকগুলি হলো :

ক. সমকালীন বঙ্গীয়-ভারতীয় রাজনীতি;

খ. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং সমকালীন ১৩৫০-এর মহামন্বন্তর; দুর্ভিক্ষ; যুদ্ধ ও মহামারীর আনুষঙ্গিক পটভূমিকা;

গ. সমকালীন বন্যা ও সাইক্লোন;

ঘ. গণনাট্য ধারার ঐতিহ্য, এবং 'প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ', 'ফ্যাসী বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের উত্তরাধিকার';

ঙ. নাটকটির আভিনায়িক ও মঞ্চগত দিক;

চ. বিশুদ্ধ সাহিত্যকর্মরূপে নাটকটির বিচার।

বঙ্গীয় সমালোচকদের লেখায় এই ক'টি দিকের সমন্বয় ঘটে নি; এক-একজন এক-একটি বিশেষ দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই, বিশুদ্ধ একটি সাহিত্যকর্মরূপে নাটকটির বিচার একেবারেই হয় নি।

এই ক'টি দিকের ওপর সমান গুরুত্ব আরোপণের ফলে ওপরে কথিত operational দিকটি স্বতই ধরা পড়বে।

৩. এইখানেই সর্বাগ্রে বিচার্য, নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য মশাই নিজেই তাঁর রচনাটির মধ্যে এ সমন্বয় কর্মটি কিভাবে করেছেন; কিংবা, করলে তাঁর শিল্প কৌশলটি কী, এবং সে বিষয়ে তাঁর সাফল্যের পরিমাণই বা কী। মনে রাখা প্রয়োজন, এই নাটকের প্রথম অভিনয়কালে সমকালীন নানা ঘটনা এবং বিশেষ ধরনের মঞ্চায়নের ফল রূপে পাঠক-দর্শক-সমালোচক যতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন—বিশুদ্ধ সাহিত্যিক দিকটি সম্পর্কে ততটা নয়। বিজনবাবু এবং শম্ভুবাবুর যৌথ পরিচালনায়, পেশাদারী নাট্য রীতি থেকে বিচ্যুত হওয়া কিংবা, প্রতি দৃশ্যের শেষে 'ফ্যান দাও' বলে আর্তচিৎকার দর্শক-সমালোচকদের অভিভূত ও শিহরিত করে রেখেছিল। অর্থাৎ অভিনয়ের ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই নাটকটিকে প্রদর্শন করেছেন। আজ, অর্ধশতক গত হবার পর, ঠিক ওই রীতিতেই নাটকটিকে পরিবেশন করলে একই effect নাও পাওয়া যেতে পারে। তেমনি আবার সমালোচকগণ গণনাট্যের একটি নিদর্শন রূপেই যেন দেখতে অভ্যস্ত। এখানেই পরিবেশক দল এবং পর্যবেক্ষকের দল— দু'দলই যেন একপেশে হয়ে গেছেন। বিশুদ্ধ সাহিত্যকর্মরূপে নাটকটিকে বিচার করতে গিয়ে অনেকেই এর দোষ-দুর্বলতা লক্ষ করেছেন। এই নাটকের সামগ্রিকতার অভাবকে কেউ কেউ 'এপিসোডিক ' বলে উল্লেখ করে দোষ ঢাকবার চেষ্টা করেছেন।

৪. 'গণনাট্য', 'প্রগতি লেখক সংঘ', 'ফ্যাসীবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ' ১৯৩৬ সনে প্রতিষ্ঠিত 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র নানা স্তরের বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন অনেকেই ছিলেন। তখন তাঁদের সম্মুখে ভারতের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হওয়াটাই প্রধান দিক ছিল। এই জন্যেই ভারতীয় রাজনীতির দুর্বল দিক রূপে সাম্প্রদায়িকতার দিকটি প্রাধান্য পায়। ১৯৪২ এ যে 'ফ্যাসীবিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘে'র আবির্ভাব ঘটে, তাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফ্যাসিস্ত অক্ষশক্তির বদলে ইংরেজদের সন্ত্রাস ভীতিই বড়ো হয়ে ওঠে। ১৯৪৩-এর ২৫ মে গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হলো। প্রথম

বুলেটিনে তিনটি দিকের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হলো: ক. ভারতীয় জনগণের struggle for freedom; খ. ইংরেজের কাছে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার (Economic tartice); গ. একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সম্পর্কে চেতনা (a democratic culture)। দেখা যাচ্ছে — সবই ব্রিটিশ কুশাসনকে মনে রেখে, তার দূরীকরণের জন্যই এগুলির কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে গণনাট্যের এই উদ্দেশ্য অনেকটাই স্বাভাবিক কারণেই, পরিবর্তিত হয়ে গেছে। গণনাট্য কমিউনিস্ট দলভুক্ত হয়ে পড়ল, ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে এই রাজনৈতিক দল বে-আইনী বলে ঘোষিত হলো। গণনাট্যধারা স্তিমিত হয়ে পড়ল। রাজনীতিই হবে গণনাট্যের মূল বক্তব্য, এবং বিশেষ 'ফর্মূলা' অনুযায়ী তা লিখিত হবে— এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে শম্ভুবাবু-বিজনবাবু সকলে গণনাট্যধারা থেকে প্রস্থান করলেন। নবনাট্যধারার সৃষ্টি হলো। 'নবান্ন' নাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে শম্ভুবাবু বারবার নাটকের ছন্দোময় প্রয়োগের কথা বলেছেন; নাট্যরচনার ক্ষেত্রে বিজনবাবুর 'অগোছালোপনা' কে বিরক্তির চোখে দেখেছেন।

৫. যাঁরা রাজনীতি বা বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিকোণ থেকে 'নবান্ন' নাটকটিকে দেখে থাকেন, তাঁদের সদ্য-প্রয়াত সুধী প্রধানের একটি মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই: 'বিজন মার্কসবাদ পড়ে যা করতে পারেন নি— তুলসীবাবু(লাহিড়ী) না পড়ে তাই করেছেন।' অর্থাৎ ওই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিজনবাবু ব্যর্থ। আবার ঠিক একই কারণে রোমাঁ রোলাঁ-র ' The people's Theatre ' বইতে গণনাট্যের যে লক্ষণগুলি নির্দিষ্ট আছে, অন্ধভাবে তাকেই অনুসরণ বা আবিষ্কার করতে গেলে কিছু খন্ডতা-অসম্পূর্ণতার নিদর্শন পাওয়া বিচিত্র নয়।

৬. আমাদের প্রস্তাব: কোনো সাময়িক বা বিশেষ কোনো তাত্ত্বিক দিক থেকে সাহিত্যবিচার করলে একদিন তা ফুরিয়ে যেতে বাধ্য। 'নবান্নে'র প্রথম দৃশ্যে বাঁশ কাটার আওয়াজ কেন পুত্রশোকাতুর প্রধানের হাহাকার হবে না? পঞ্চাননীর 'এগিয়ে যা' কি আমীনপুরের মানুষদের সমবায় আন্দোলনের পথ খুলে দেয়নি! 'নবান্ন' মানে যদি বন্যা-দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের নব-অভিজ্ঞতা হয়, প্রধানের কাঁধে ঝোলানো হাঁড়িটা কি তারই প্রতীক নয়! তার যে নানা আবর্জনা , সে কি তখনকার লোভী মানুষদের মানসিক দিকের প্রতীক নয়! 'নবান্ন' নাটকে বারবার দেখা গেছে, নানা বর্ণের এবং নানা কর্কশ ধ্বনির সমাবেশ ঘটেছে। এই কর্কশ ধ্বনি তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতির ভয়ঙ্করত্বের প্রতীক। 'নবান্ন' উপলক্ষে যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে , আসলে তাই হলো দয়াল মন্ডল কথিত 'প্রতিরোধ', কেননা প্রতিযোগিতা মানেই হলো প্রতিপক্ষকে পরাভূত করবার প্রয়াস। নাটকে বারবার গোষ্ঠীর নেতা প্রধান সমাদ্দারকে নটরাজ শিবের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত করা হয়েছে। নটরাজের জীবনের একদিকে আছে ভাঙন, অন্যদিকে গড়ন। বন্যা-দুর্ভিক্ষ যদি ভাঙন হয়, 'নবান্ন'কে কেন্দ্র করে সমবায় আন্দোলন ও ' গাতায়' খাটা তবে গড়নের দিক। প্রধান শেষে আর ঘরে ফেরেনি, — মেলার জনতার মধ্যে মিশে গেছে।

বাংলা সাহিত্যে শক্তিসাধনার তত্ত্বরূপ

নন্দিতা মিত্র

শাক্ত পদাবলী অষ্টাদশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য কাব্য বৈচিত্র্য সম্পন্ন পদাবলী। একে বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সামগ্রীও বলা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতকের শক্তিসাধক কবিগণ আশ্চর্য সাধনশক্তি বলে 'হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে' ডুব দিয়ে এই রত্ন আহরণ করেছেন। প্রাচীন কাল থেকে এদেশ তন্ত্রপ্রধান মাতৃকাপূজার পীঠস্থান। প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে পৌরাণিক যুগের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগ পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষেই আদ্যাশক্তির কোনো না কোনো প্রকার পূজা-উপাসনা চলে এসেছে। জন্ম লগ্ন থেকেই শাক্ত পদাবলীর অশেষ জনপ্রিয়তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেবল মাত্র সাধক নয়, তৎকালীন রাজা-মহারাজা, জমিদার, সমাজের অভিজাত শ্রেণী, সাধারণ মানুষ সকলেই এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এমনকি এই অসুন্দর রুচি-বিকৃতির যুগে কবিওয়ালা, টপ্পাগায়ক, পাঁচালিকার, যাত্রাওয়ালা জনসাধারণের রসপিপাসা পরিতৃপ্ত করার জন্য শাক্ত সংগীত গান করতেন।

শাক্ত পদাবলী ধর্মাশ্রয়ী হলেও এই গানগুলো জীবনরসাশ্রিত গীতিকবিতা। শৃঙ্গার বা আদিরসের রূপায়ণ হিসাবে বাংলা কাব্য সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর তুলনা হয় না। শুধু শৃঙ্গার নয় সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি রসের প্রকাশ হিসাবেও বৈষ্ণব কবিতা অতুলনীয়। তত্ত্বকে প্রচ্ছন্ন রেখে , নিবিড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব কবিতা এমন একটি অনুপম রসসৌন্দর্যলোকে কামস্পর্শ বিরহিত অনাবিল প্রেমের রাজ্যে উঠে গেছে যার আবেদন শুধু বিশেষ একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী বা গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি।

তুলনায় শাক্ত সংগীতের আবেদন হয়তো এতখানি ব্যাপক নয়। শাক্ত পদাবলীতে তত্ত্বের সুরটি উচ্চগ্রামে বাঁধা। সাধনতন্ত্রীয় ইঙ্গিতগুলি অতিশয় সুস্পষ্ট তত্ত্বকে গোপন রেখে কেবল বিশুদ্ধ কাব্য সৃষ্টির প্রয়াসও এতে নেই।

শক্তি বিষয়ক গানগুলির বর্ণনীয় বিষয় মুখ্যত তিনটি (১) ভগবতীর লীলা। (২) শক্তি তত্ত্ব। (৩) শক্তিসাধনার তত্ত্ব। ভগবতীর লীলামূলক গান আগমনী ও বিজয়া । এগুলিতে পরমেশ্বরীর মানুষীলীলার কাহিনী বিধৃত। আদিম যুগে পরা শক্তি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন — 'আমি মা মেনকার কন্যা হয়ে হিমরাজ গৃহে জন্ম নেবো।' সেই অঙ্গীকার বশে তিনি হলেন হিমরাজ দুহিতা উমা, মা হলেন মেনকা। মমতাময়ী জননী ও কন্যাসন্তানকে আশ্রয় করে যে বাৎসল্যের প্রকাশ ঘটলো, আগমনী ও বিজয়া অধ্যায়ের গানগুলি সেই রসে আদ্যন্ত অভিষিক্ত । 'আগমনী ও বিজয়া'তে সাধনার উচ্চভূমিতে শক্তিশ্বর উমাই জননী, সাধক হলেন ভক্তদল বা কবি সন্তান। বৈষ্ণব পদকর্তার মতো 'লীলাত্মক' হয়ে রাধাকৃষ্ণলীলা দর্শন ও আস্বাদন অথবা কেবল উপাস্যের নামকীর্তন করা শক্তি সাধকের লক্ষ্য নয়। শাক্ততন্ত্রসাধনা শাস্ত্র, বিশেষ প্রণালীতে পূজা, জপ ও যোগ সাধনা করাই শাক্তের উপাসনা। বাণীবিলাস নয়, সিদ্ধিলাভের জন্য ক্রিয়াই তার আচরণীয়। অবশ্য পূজাঅন্তে স্তব স্তুতি আছে।

শক্তি সাধক জগতের মূল পরম-কারণকে মাতৃরূপে কল্পনা করেছেন। তাই শাক্ত পদাবলীর কবি বলেনঃ

কে জানে মা তব তত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্ব-প্রসবিনী,
মহতে ত্রিগুণ দিয়া নির্গুণা হলে আপনি।

যিনি নির্বিকার হয়েও সবিকারে এই রূপ জগতের মধ্যে প্রকাশিত হন তিনিই আবার জীবদেহের মূলাধারে কুন্ডলিনীশক্তিরূপে বিরাজ করেন। এই কুন্ডলিনীই নাদশক্তি অতিমধুরনাদ তুলে তিনি শরীর যন্ত্রে লীলা করছেন।

'শরীর শারীরযন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয়তন্ত্রে। গুণভেদ মহামন্ত্রে তিনগ্রাম সঞ্চারিনী।' নির্গুণ ব্রহ্মময়ী মা সগুন হয়ে এই বিশ্বসংসারে লীলায় মেতেছেন। সে যেমন বিচিত্র তেমনি রহস্যময়াবৃত। এই মহামায়া অবিদ্যারূপে জীবকে মোহগ্রস্ত করছেন, তিনিই আবার বিদ্যারূপে জীবের মোহবন্ধ ছিন্ন করছেন। সাধক সাধনার মধ্য দিয়ে এই শক্তির স্বরূপ বুঝতে বা একে আয়ত্ব করতে চেষ্টা করেন। পশুভাব, বীরভাব বা দিব্যভাবে সাধকগণ এই সাধনা করে থাকেন। উক্ত ভাবত্রয়ের মধ্যে পশু ভাবের সাধনা— বেদাদি আচার ক্রমে সংযম, অভ্যাস ও ভগবদ্ভক্তিলাভের সাধনা। নিয়ম নিষ্ঠা পূর্বক দেবীর পূজা, নিত্য নৈমিত্তিক কর্মাদি সম্পাদন প্রভৃতি এরূপ সাধনার অঙ্গ। বীরভাবের সাধনা আরো কঠিন এবং নিহিতার্থব্যঞ্জক। যাঁরা মহাবলশালী, নির্ভীক, সবলহৃদয় তাঁরাই এই সাধনার অধিকারী। বীরভাবের সাধন-সোপান অতিক্রম করে দিব্যভাবে পৌঁছতে হয়, দিব্যভাবের শক্তিসাধনা এক মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত তা দিব্যগুণসম্পন্ন। ভাবত্রয়ের মধ্যে এটাই শ্রেষ্ঠ। শাক্তপদাবলীতে যে শক্তি সাধনার পরিচয় পাওয়া যায় তা অতিসুন্দর দিব্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থূল ইন্দ্রিয় বিক্ষোভকে প্রশমিত করে এক মহান ভাবের জগতে সাধক উপস্থিত হন। বিধি নিষেধের গন্ডী উত্তীর্ণ হয়ে সাধক তখন মানসিক ধর্মানুভবের রাজ্যে প্রবেশ করেন। দেহই তখন তাঁর সাধনীয় তিনি তখন এই সত্যটি অনুভব করতে থাকেন যে— 'ত্রৈলোক্য যানি ভুতানি তানি সর্বাণি দেহও।' — শক্তি এই দেহ ভান্ডেই রয়েছেন। মানবের পরম সত্য এই দেহের অভ্যান্তরেই বিরাজ করছেন। শক্তিলাভ করতে হলে বাইরে ঘুরে মরতে হবে না দেহেই তার সন্ধান মিলবে— আপনারে আপনি দেয়, যেওনা মন কারো ঘরে, যা চাবে এইখানে পাবে। খোঁজ নিও অন্তঃপুরে। দেহকে সাধনীয় জ্ঞান করে শক্তি সাধকগণ এই দেহ যন্ত্রটিতে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। দেখেছেন দেহস্থ বহুসংখ্যক নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটি নাড়ীই প্রধান। তম্মধ্যে আবার ইড়া- পিঙ্গলার মধ্যবর্তী সুষুম্নাই সাধকজনের প্রধান লক্ষ্য। এই সুষুম্না নাড়ীতেই দেহের ষট্‌চক্র, মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনহত, বিশুদ্ধাখ্য ও আজ্ঞা অবস্থিত। এই ষট্‌চক্রের ব্রহ্মরন্ধ্রে এই একটি সহস্রদল পদ্ম অধোমুখী হয়ে বিরাজ করছে। এই পদ্মেই পরম রমণীয় শিবপুরী। পরম শিব শবাকারে এখানে অবস্থান করছেন। কুন্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতাবস্থায় রয়েছেন মূলাধারে। এই সুষুম্না কুন্ডলিনীকে উদ্বোধিত করে ষট্‌চক্রের মধ্য দিয়ে সহস্রের পরম শিবের সঙ্গে যুক্ত করাই কুন্ডলিনী যোগ। এই যোগক্রিয়াই দিব্যমন্ত্রের সাধন। এহেন যোগের সিদ্ধি প্রভাবে জীব প্রকৃত পক্ষে শিবের সঙ্গে মিলিত হন— এ যোগানন্দের তুলনা নেই। তখন জীব বুদ্ধি লোপ পায়। এক অনির্বাচ্য আনন্দানুভূতির মধ্যে সমস্ত কিছু একাকার হয়ে যায়। শিব ও শক্তির মিলনসঞ্জাত এই আনন্দরূপ অমৃতকে শক্তিসাধকগণ বলেন 'সামরস্য'। এই সামরস্য আস্বাদনের অনুভূতি সীমাবদ্ধ ভাষায় প্রকাশের অতীত। সাধক শুধু আভাস -ইঙ্গিতে তা বোঝাতে চেষ্টা করেন—

' মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুমসকলে।।'

শক্তিপদ বিচারে এই শক্তিতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব অতি সহজ সরল ভাষায়, অতি পরিচিত দৃশ্যাবলীর রূপকের মাধ্যমে বাণীবদ্ধ হয়েছে। এখানে উপাস্যা— অনন্দময়ী জননী, উপাসক-ভক্ত সন্তান। লৌকিক বাৎসল্য ও প্রতি বাৎসল্য রসের মধ্য দিয়ে এই উপাসনা দিব্য ভক্তিরসের স্তরে উন্নীত হয়েছে। শক্তি সাধনা শুষ্করসহীন জ্ঞানের সাধনা নয়, ভাবের সাধনা রসের সাধনা— আনন্দ এর সাধ্য, আনন্দ হলো সিদ্ধি। সকল তত্ত্ব ছাপিয়ে শাক্ত পদাবলীর মধ্যে এই আনন্দানুভব গীতিময় বাণীমূর্তি লাভ করেছে। এতে ভাব ও যোগের তত্ত্ব ও রসের যুক্ত বেণী রচিত হয়েছে।

কত কবিই শাক্ত সংগীত রচনা করেছেন। তবে অষ্টাদশে প্রায় শতেক কবি এই গান রচনা করে মায়ের চরণে ভক্তির নৈবেদ্য নিবেদন করেছেন।

মুছে যাওয়া মুখ : ভুলে যাওয়া কথা

নন্দিনী মুখোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলার নব্যশিক্ষিত, নবোদ্ভূত উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজে চিন্তাভাবনার, মূল্যবোধের এবং জীবনযাত্রার যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল নারীশিক্ষার উদ্‌গম এবং লেখিকারূপে তাঁদের আত্মপ্রকাশ তারই একটি দিক। নারীসংক্রান্ত মূল্যবোধের পরিবর্তনের আলোড়ন সর্বাধিক ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। ক্রমে সমাজের সর্বস্তরে এর অভিঘাত আসে। শিক্ষিত, সচেতন, প্রগতিপন্থীরা সোৎসাহে শুধু লেখাপড়াই শেখেননি উৎসাহিত করেছেন তাঁদের ভাবনা বিকাশেও। বলাবাহুল্য বিপরীত দিকটিও যথেষ্ট সুলভ ছিল।

বাংলায় প্রথম গ্রন্থলেখিকা হিসাবে আবির্ভাবের কৃতিত্ব কৃষ্ণকামিনী দাসীর। অন্ধকার অন্তঃপুরের ভাবনা এই প্রথম আত্মপরিচয় নিয়ে প্রকাশিত হলো। প্রমাণ পাওয়া গেল যে, বহির্জগতের গতিশীলতা অন্তঃপুরকেও স্পর্শ করেছে।

লেখিকা সমর্থন করেছেন বিধবা বিবাহকে যুক্তিসংগতভাবেই । কারণ বিধবা বিবাহ না থাকার ফলে অজস্র ভ্রূণহত্যায় মায়ের যন্ত্রণা যে সন্তানকে হত্যা করার তুল্য তা যেভাবে নারীর ভাষায় ও উপলব্ধিতে তিনি তুলে এনেছেন, পুরুষের পক্ষে, পুরুষের দৃষ্টিকোণে তা অসম্ভব ছিল।

তাঁর লেখায় এসেছে স্বামী বর্তমানেও বৈধব্যের অধিক যন্ত্রণাভোগী মেয়েটি —

' চির দুঃখ দুঃখী চিরদিন
দারুণ লম্পট পতি পর মহিলায় রতি
পরবাসে বঞ্চেন যামিনী। '

অন্যদিকে শিক্ষিতা স্ত্রীর স্বামীর কাছে স্ত্রীর মূল্য নিছক তাঁর রূপে নয়, 'অন্তর্গত গুণ' মুগ্ধ করেছে তাঁকে। কারণ

' বিচারে পন্ডিতা তুমি, বুদ্ধে বিচক্ষণা।'

বিদ্যা, বুদ্ধি , বিচারশক্তি দিয়ে নারীর এই মূল্য নিরূপণ আধুনিককালের জন্মকেই সূচিত করে। তাই বাল্যবিধবা মনোরমা ব্যথা মোচনের পথ পেয়েছে বিদ্যার বিস্তৃত জগতে—

' যদ্যপি কখন মন হলে উচাটন
পুস্তক করিয়া হস্তে করি নিবারণ'

কৌলীন্যপ্রথার সমালোচনা এই বইটির অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

চিত্তবিলাসিনী এই মনোরমার মতোই একালের লেখিকাদের একটি বৃহৎ অংশ লেখনী আশ্রয় করেছিলেন শুধু শূন্য জীবনের ব্যথামোচনে। এই ব্যক্তিগত বেদনাগুলি অপ্রকাশিত অজস্র বেদনার প্রতিনিধিত্বসূচক।

ব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসী 'কবিতামালা' (১২৯৭) লিখেছেন, 'পতিবিয়োগের' কারণে বিধবামাত্রই

' সর্বসুখে বঞ্চিত সে বিশাল ধরায়
সতত রোদন ভিন্ন না আছে উপায়'

অন্নদাসুন্দরী দাসী 'অবলাবিলাপ' কাব্যগ্রন্থে (১২৭৮) নিবেদন করেছেন বাবা, মা, ভাই ও স্বামীর বিয়োগযন্ত্রণাকে।

শ্রীমতী ইন্দুমতীর 'দুঃখমালা' গ্রন্থ (১৩০৩) তাঁর বাবা, ভাই , স্বামী ও একমাত্র সন্তানকে হারাবার শোকগাথা। একাকী জীবনে এই অসহায় বিলাপ ও ঈশ্বরের কাছে আকুল প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই সম্বল ছিল না এমন বহুজনের।

একালের মহিলাদের লেখা অধিকাংশ কবিতাই বর্ণনামূলক ও বিষয়মূলক। সেই সঙ্গে ঈশ্বর বা পিতামাতাবন্দনা বা নীতিকবিতা । এঁরা অনেকেই 'বিশ্বশোভা'র (১২৭৬) লেখিকা কৈলাসবাসিনী দেবীর মতোই সংকোচজড়িতভাবে উপস্থাপিত করেছেন নিজেকে—

' অনুগ্রহপূর্বক একটু একটু উৎসাহরূপ
কৃপাবারি প্রদান করিলে পরম পরিতোষ লাভ করিব'

একালের মেয়েরা এই কৃপাজাত উৎসাহটুকু পেলেই কৃতার্থ হতেন। কারণ সাহিত্যচর্চা ছিল—

' নীচ হয়ে বড় আশ করবে সবে উপহাস
নারীর একাজ কভু নয়'

'হাসিবে বিজ্ঞসমাজ' জেনেও 'অমন' এর ভয়ে যে এঁরা পিছিয়ে যাননি তার মধ্যেই অদম্য প্রাণশক্তির প্রথম প্রকাশ।

এই লেখিকাদের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয় ষোড়শীবালা দাসীর 'পুষ্পপুঞ্জ' (১২৯১) গ্রন্থে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ভূমিকায় —

' তাঁহারা দয়ার পাত্রী। গ্রন্থে যদি গুণ না থাকে তবে বড় একটা গালি খাইতে হয় না।'

এই তাচ্ছিল্য সত্ত্বেও নারীর সাহসী স্বর পরিব্যাপ্ত দেখি ঢাকা বিক্রমপুরের গ্রামবাসিনী পঙ্কজিনীর (জন্ম- ১৮৮৪) লেখা 'স্মৃতিকণা' কাব্যগ্রন্থেও। তেরো বছর বয়সে বিবাহের পর সতেরো বছর বয়সে মৃত্যু হয় পঙ্কজিনীর । এই কিশোরীটি লিখেছে —

' আলোকের জীব এরা, আলোকে বেড়ায়,
আঁধারের কীট তোরা তাই দলে পায়,
··· সেথা কি পশিতে পারে এদের নয়ন,
যেখানে দুহিতা, মাতা, ভার্যা, ভগ্নীগণ,
কী ভীষণ দুঃখ লয়ে যাপিছে জীবন। (তাই দলে পায়)'

কিংবা

' বাঙালীর ছেলে তোরা কে দেখিবি আয়!
ষাট বর্ষে মরে দারা
তবু দারা গৃহে তারা
নাহি লজ্জাবোধ কিংবা অপমান তায়!
ওদিকেতে কচি বালা
সহিছে বৈধব্য জ্বালা
তার তরে ব্রহ্মচর্য আছে ব্যবস্থায়।'

এই নিভৃত পরিবর্তনহীন অন্তঃপুরে অনেকেই খুব স্বাভাবিকভাবেই ভাব ও ভাষায় নিতান্ত রক্ষণশীল ছিলেন। এঁরাই দেখিয়ে দেন এই চেতনাবোধকে আনা কত দুর্লভ ছিল। যেমন পনেরো বছরের বালিকা হরিবালা দেবী অন্নদামঙ্গলের আদর্শে পুরাণবর্ণিত সতীর কাহিনী লিখেছেন 'সতীসংবাদ' কাব্যে (১২৯৭)। সুরঙ্গিনী দেবীর 'তারাচরিত' (১৮৭৫), ফৈজুন্নিসা চৌধুরানীর 'রূপ-জালাল' (১৮৭৬), ভুবনমোহিনী দেবীর 'আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহস্বপ্নপ্রদর্শনে অভিজ্ঞান' (১২৮৪) ইত্যাদি এরই উদাহরণ। পুরুষের উৎসাহ ও অনুকম্পায় যাঁরা কৃতার্থ হয়েছেন স্বাভাবিক কারণেই পতিভক্তি ও সতীত্ব এই দুই বিষয়ে তাঁরা নিজেদের সাধ্যকে উজাড় করে দিয়েছেন দীর্ঘদিন।

একজন বঙ্গমহিলা কর্তৃক প্রণীত 'পদ্যমালা' (১২৭৭), উপেন্দ্রমোহিনী দেবীর 'নারীরচিত' কাব্য (১২৮৬), পাঁচুরানীর 'স্মৃতি' (১৩১০) এই গতানুগতিকতারই প্রকাশ।

একালে গাথাকাব্য লিখেছেন নবীনকালী দেবী। তবে আঙ্গিকে গতানুগতিক হলেও ভাবনায় তাঁর স্বকীয়তা অনস্বীকার্য। নারী যে শুধু সুখসঙ্গিনী নয়, সেই ধারণা তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন 'মন্দোদরীর রণসজ্জা' (১২৮৭) কাব্যে। রাবণবধের পরে মন্দোদরী যেন রণসজ্জিত হয়ে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এমন একটি ছবি তিনি আঁকতে চেয়েছেন। মেঘনাদবধের প্রমীলার প্রবল প্রভাব সত্ত্বেও মন্দোদরীর নিজস্ব দুটি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত, প্রমীলার সঙ্গে ছিল শুধু একশত চেট্টিনী, মন্দোদরী সমগ্র নারীসমাজকে আহ্বান করেছেন

' সাজি সংগ্রামের সাজ ত্যজি সবে ভয় লাজ
দাঁড়ালো নারীসমাজ '

দ্বিতীয়ত, প্রমীলা স্বামীর সঙ্গলাভের উদ্দেশে এসেছিলেন, কিন্তু মন্দোদরী এসেছেন 'রাখিতে আপন দেশ'।

পরিশেষে নারীবাহিনীর ভয়ে সবাই যখন কাতর, মন্দোদরীর মনে হয়, স্বামীহীন পৃথিবীতে জয়লাভেই বা কী সুখ। তিনি অস্ত্র ত্যাগ করে মৃত স্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়েন।

লেখিকা কোনো অভিনবত্বের বা বিদ্রোহের পতাকা তুলতে চাননি। কিন্তু তাঁর লেখা থেকে দু'টি জিনিস স্পষ্ট, বাস্তবে মেয়েরা বাইরে বেরিয়ে আসার আগেই তাঁদের দৃপ্ত তেজে বহির্গমনের কল্পনাভূমি তৈরি হয়েছিল, এবং স্বামীহীন পৃথিবীতে কোনো নতুন ভূমিকে খুঁজে নেবার সাধ্য তখনও হয়নি এঁদের।

ধারাবাহিক সাহিত্যসাধনার পরিবেশ এঁদের ছিল না, তবু তারই মধ্যে অপ্রতিরোধ্য নতুন প্রাণশক্তির প্রথম স্ফুরণে যে পথ এঁরা দেখিয়ে গেলেন, উত্তরকালের পথরেখাটি তারই উত্তরাধিকার।

রবীন্দ্রসাহিত্য অধ্যয়নের পটভূমিরূপে রবীন্দ্রজীবন ও দেশ-কাল

প্রশান্তকুমার পাল

সাহিত্য জীবনসম্ভব-রচয়িতার জীবন ও দেশ-কালের ভিত্তিতেই সাহিত্য সৃজিত হয়ে ওঠে, এই সত্যকে মেনে নিলে রবীন্দ্রসাহিত্য অধ্যয়নের পটভূমিরূপে রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং তাঁর দেশ ও কালের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা অত্যাবশ্যক। ভারতের প্রাচীন যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার তিনি অর্জন করেছেন, যে পরিবারে জন্ম নিয়েছেন তিনি, সেই পরিবারের যে নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তিনি বড়ো হয়ে উঠেছেন, নিজের দেশ ও পৃথিবীর পরিবর্তনশীল যে রাজনৈতিক,

অর্থনৈতিক , সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্যকে যথার্থভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আমাদের আলোচনায় এই বিষয়টিকেই আমরা সংক্ষেপে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি সম্পন্ন জমিদার পরিবারে। জীবনধারণের জন্য যে আর্থিক সংগতির প্রয়োজন তার যথেষ্ট সংস্থান করে গিয়েছিলেন তাঁর পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর বাংলা ও উড়িষ্যার অনেক জায়গায় বিস্তৃত জমিদারি কিনে ও তাঁর বিশাল ব্যবসায়সাম্রাজ্যের দ্বারা। ঋণের দায়ে তাঁর ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথ লাভ করেননি বটে, কিন্তু জমিদারির মোটামুটি নিশ্চিত আয়ের জন্য তাঁকে জীবিকা অর্জনের কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়নি। পরবর্তী জীবনে অর্থ সংগ্রহের যে ক্লান্তিকর অভিযানে তাঁকে নামতে হয়েছে তার কারণ তাঁর শিক্ষাভাবনা ও গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তব রূপ বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের ব্যয় মেটানো। রবীন্দ্ররচনায় এই স্থূল বাস্তবের পরিচয় দুর্লক্ষ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু মুসলমান সংসর্গের অপরাধে তাঁর পূর্বপুরুষ সমাজে পতিত হয়ে পিরালী ব্রাহ্মণ আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। ফলে বিবাহাদি সামাজিক কাজকর্মে তাঁরা একটি সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় এই গণ্ডি আরও ছোটো হয়ে এল। এর ফলে অসুবিধাও যেমন হয়েছে, সুবিধাও কম হয়নি। নানাবিধ কাজকর্মে তাঁদের সমাজের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়নি। জাতিচ্যুত হবার ভাবনা না করে সত্যেন্দ্রনাথ সমুদ্র পার হয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীকে নিয়ে তিনি বোম্বাই রওনা হলে পরিবারের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিলেও বৃহত্তর বাঙালি সমাজের কথা তাঁকে ভাবতে হয়নি। ঠাকুরবাড়ি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার দিক দিয়ে অনেক চমকপ্রদ অগ্রগতি ঘটিয়েছে, ধীরে ধীরে প্রায় সব বাঙালিই সেই পথ অনুসরণ করেছে।

সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও এই পরিবার ছিল ভিন্নপথগামী। তখনকার শিক্ষিতসমাজে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ব্যাপক, বাংলাভাষা ব্যবহৃত হতো কেবল অন্তঃপুরে মেয়েদের শিক্ষায়। কিন্তু ঠাকুরপরিবারে বাংলাভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। নিজের প্রতিষ্ঠিত সর্বতত্ত্বদীপিকা সভার গৌড়ীয় ভাষার উত্তম রূপে অর্চনার আদর্শ দেবেন্দ্রনাথ প্রয়োগ করেছিলেন নিজের পরিবারে। ফলে পরিবারের সন্তানদের মাতৃভাষাচর্চার ভিত হয়েছিল সুদৃঢ় এবং তাঁদের কথিত ভাষা এমন একটা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল যাকে বলা হতো ঠাকুরবাড়ির ভাষা। তাছাড়া বেশভূষা , আদবকায়দা ও চালচলনেও তাঁরা ছিলেন স্বতন্ত্র। এই সাংস্কৃতিক আভিজাত্যকে বুঝতে না পেরে রবীন্দ্রনাথের অনেক অনুরাগী তাঁর থেকে দূরে সরে গিয়েছেন, অনেকে হয়ে উঠেছেন রবীন্দ্র-বিরোধী।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল উপনিষদের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সন্তানদের শৈশব থেকেই বিশুদ্ধ উচ্চারণে উপনিষদের নির্বাচিত শ্লোক নিয়মিত আবৃত্তি করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন। আর তারই পরিণতি ঘটেছিল স্বদেশের প্রতি গভীর প্রীতিবোধের উন্মেষে। পরবর্তীকালে এই স্বদেশপ্রীতিই তাঁদের চিন্তা ও কর্মের নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

কিন্তু এই প্রীতি ইংরেজি ভাষা, ইংরেজি সাহিত্য, এমন-কি উদার মনোভাবসম্পন্ন ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে তাঁদের বাধা দেয়নি। বিশ্বের সেরা চিন্তা ও সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলা ছিল তাঁদের ব্রত। স্বদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথীদের জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগে থাকতেই। তাঁর কৈশোরে ও যৌবনে বিদ্বজ্জন-সমাগম ও সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিক করে তোলার চেষ্টা করা

হয়েছে।

রামমোহনের সময় থেকেই ব্রাহ্মসমাজে একটি সাংগীতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। হিন্দুস্থানী সংগীতের কাঠামোয় বাংলা ব্রহ্মসংগীত রচনার সূত্রপাত তিনিই করেন। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর পুত্রেরা এই ঐতিহ্যকে অব্যাহত রেখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে, সাহিত্যে, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত চিন্তাভাবনায় এবং কর্মে এই পারিবারিক ঐতিহ্য ও দেশ-কালের প্রভাব গভীরভাবে অনুভব করা যায়।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের শৈশবেই ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্র ও ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার সূচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ মেলার প্রথমদিকে কেবল দর্শক থাকলেও ক্রমে এখানে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর কবিত্বশক্তির উদ্বোধন আগে ঘটলেও প্রকাশ্য কবিসংবর্ধনা হয়েছে জাতীয়মেলার প্রাঙ্গণেই, যার বিষয় ছিল স্বদেশপ্রেম। স্বনামে কবিতা প্রকাশের সূচনাও এই মেলার সূত্রে। দিল্লিতে লর্ড লিটনের রাজসূয় যজ্ঞের প্রতিবাদে লিখিত কবিতা 'দিল্লি-দরবার' তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার প্রথম প্রকাশ। উল্লেখ্য, বীজের আকারে হলেও এই কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার মূল লক্ষণগুলি নিহিত আছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকের অন্যায় আচরণকে যেমন ধিক্কার জানানো হয়েছে, স্বদেশবাসীর দুর্বলতাও সেখানে সমালোচিত হয়।

১৮৭৮ সালে আই.সি.এস. পরীক্ষা দেবার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডে যান। এই উদ্দেশ্য সফল হয়নি, কিন্তু প্রায় দেড় বছর সেখানে বাস করার অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে ও মানসিকতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে। এখানে থাকার সময়ে তিনি 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে বিলাতপ্রবাসের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকেন। পরবর্তীকালে এগুলিকে তিনি বাল্যবয়সের বাহাদুরি আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মানসিক গঠনপর্বের উদাহরণ হিসেবে এগুলির মূল্য কম নয়। উদারপন্থী একটি ইংরেজি পরিবারের মধ্যে কিছুকাল বাস করে দ্বীপবাসী ইংরেজের প্রতি যে শ্রদ্ধা তাঁর মনে রোপিত হয়েছিল, ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের বহু অনাচার সত্ত্বেও তা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি।

১৮৮০ সালের মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন। আসার পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা 'মানময়ী' গীতিনাট্যের জন্য তিনি একটি গান লিখে দেন ও তাতে অভিনয় করেন। এই পরীক্ষার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ' বিদ্বজ্জন সমাগম' অনুষ্ঠানের জন্য দেশি-বিদেশি সুরে নিবদ্ধ 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যটি রচনা করে প্রকাশ্য জনসভায় অভিনয় করেন পরিবারের মেয়েদের নারীচরিত্রে নামিয়ে। এটি যে কতটা সাহসের কাজ আজ তা কল্পনাও করা যায় না। এই কাজ করা সম্ভব হয়েছিল পিরালী ও ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হওয়ার এবং কিছুটা বিলাতপ্রবাসে নারীস্বাধীনতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জন্য। পরের বছর একই উদ্দেশে তিনি 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যটি রচনা করে অভিনয় করেন। এই দু'টি গীতিনাট্যে দেশি-বিদেশি সুরের সংমিশ্রণের যে পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ সফল হয়েছিলেন, তাঁর পরবর্তী সাংগীতিক সৃষ্টিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারতীয় রাগরাগিণীর সুরব্যবহারের কঠোর অনুশাসনকে না মেনে সুরসৃষ্টির সাহস তিনি এই সূত্রেই অর্জন করেছিলেন। শুধু সুররচনাই নয়, তাঁর ধারণাকে তিনি সুধীজনের কাছে উপস্থিত করেছেন বেথুন সোসাইটিতে ' সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধ পাঠ করে।

মাত্র দু'বছরের বড়ো নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতার খুব ভক্ত ছিলেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোরঞ্জনের উদ্দেশে বিহারীলালের অনুকরণে কবিতা লিখতে চেষ্টা করতেন, তাঁর প্রথম জীবনের কবিতায় বিহারীলালের প্রভাব সহজেই অনুভব করা যায়। কিন্তু এই অনুকরণে তাঁর কবিসত্তা তৃপ্ত হতো না।

একবার কাদম্বরী দেবী স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে দূর দেশ ভ্রমণে গেলে রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জনের দায় থেকে মুক্ত হয়ে নিজের খুশিমতো কবিতা লিখে দেখলেন এতেই তাঁর ভাব যথার্থ প্রকাশ পেল। এই কবিতাগুলি 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়, যে গ্রন্থটিকে তিনি ' আমার কাব্যের প্রথম পরিচয় ' বলে স্বীকার করেছেন।

১৮৮৩ সালে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হলো, তার পরের বছরেই তাঁর নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করলেন। এই ঘটনা তাঁকে যেমন হৃদয়বিদারী দুঃখ দিয়েছে, তেমনই বউঠানের স্নেহের কারাগার থেকে মুক্তির আনন্দও এনে দিয়েছে··· এই সময়েই, বলা চলে তিনি শৈশব থেকে প্রকৃত অর্থে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এর পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদ ত্যাগ করলে মহর্ষি রবীন্দ্রনাথকে এই পদে নিয়োগ করেন। এর আগে পারিবারিক ধর্মাচরণ অনুসরণ করে যাওয়া ছাড়া ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না, কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেই নতুন নতুন ব্রহ্মসংগীত রচনা করে তিনি যেমন সমাজের সভাকবি হয়ে উঠেছেন, তেমনই সমাজের আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে অন্যের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী তর্কযুদ্ধ এই সময়েরই ঘটনা। ' সাকার ও নিরাকার উপাসনা'(১৮৮৫), 'হিন্দু বিবাহ' (১৮৮৭) প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা ও সভাস্থলে পাঠ তাঁর নবোৎসাহের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

দেশ ও বিদেশের সমাজনীতি ও রাজনীতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহের পরিচয় তাঁর তরুণ বয়সের রচনাধারা থেকেই জানা যায়। ইংল্যান্ডে থাকার সময়ে তিনি সেখানকার সমাজকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন ও নিজের দেশের সমাজের সঙ্গে তার পার্থক্য নিয়ে 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র'-তে সাহসী আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য পারিবারিক পত্রিকা 'ভারতী'-র সম্পাদক বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে আপত্তিকর ঠেকেছে, তিনি কনিষ্ঠের কথার প্রতিবাদ করেছেন পত্রিকার পাদটীকায় - তরুণ রবীন্দ্রনাথ তাতে দমে যাননি , তিনিও তর্ক করেছেন ··· 'পারিবারিক দাসত্ব' প্রবন্ধ এই বিতর্কের বিস্ফোরক পরিণতি। পার্লামেন্টে আইরিশ সদস্যদের প্রতি ইংরেজ সদস্যদের অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব তিনি মেনে নিতে পারেন নি, কঠিন সমালোচনা করেছেন দেশে পাঠানো চিঠিতে। দেশে ফিরে আসার পরে নানা উপলক্ষেই তিনি ইংরেজের অনাচারের প্রতি খড়্গহস্ত হয়েছেন প্রথমে 'ভারতী' ও পরে 'সাধনা' পত্রিকার অসংখ্য প্রবন্ধে।

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলো। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর পারিবারিক যোগ ছিল, তিনি নিজেও এর কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ··· বিশেষত কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে। 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে', 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' প্রভৃতি গান কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষেই লেখা ··· 'বন্দে মাতরম্' কবিতায় সুর দিয়ে ১৮৯৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ নিজে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি তিনি সমর্থন করতে পারেননি, ফলে নানা প্রবন্ধে তিনি এই নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। ১৮৯১-এর কলকাতা কংগ্রেসের সময়ে জাতীয় নেতাদের পার্টিতে একটি ব্যঙ্গাত্মক গান গেয়ে শোনান ··· 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না'।

১৮৯১ সালে মহর্ষি রবীন্দ্রনাথের উপর জমিদারি পরিচালনার ভার অর্পণ করলেন। এটি তাঁর জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে পরিগণিত হতে পারে। তিনি শহরবাসী জমিদার হয়ে থাকেননি, অধিকাংশ সময়েই বাস করেছেন জমিদারি পরগণার সদরে বা তারই নিকটে নদীর উপর বোটে। এই জমিদারি পরিদর্শনের সূত্রে তিনি বাংলা দেশের প্রকৃতি ও গ্রাম বাংলার মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ পেলেন। সাহিত্যে তার প্রভাব পড়েছে কবিতায় ও ছোটোগল্পে। গ্রামবাংলার

কৃষিব্যবস্থা ও কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। দেশের দুর্দশামোচনে তিনি সমবায়কেই প্রকৃষ্ট পথ বলে চিহ্নিত করেন। মহাজনদের হাত থেকে গরীব চাষীদের রক্ষা করার জন্য তিনি জমিদারির বিভিন্ন পরগনায় কৃষিব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ধান, পাট প্রভৃতি বাঁধাধরা ফসলের বাইরে অন্যান্য ফসল চাষের জন্য তিনি বীজ, সার ও চাষের পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন। জমিদারিতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করার বিদ্যা শিক্ষার জন্য পুত্র ও জামাতাকে আমেরিকায় পাঠান। এই সমস্ত প্রচেষ্টার পরিণতি হয়েছিল শ্রীনিকেতনে পল্লী পুনর্গঠন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায়।

গ্রাম বাংলার সমস্যা পর্যালোচনা করে তিনি বুঝেছিলেন দারিদ্র্য ও অশিক্ষাই সমস্ত কিছুর মূলে। দারিদ্র্যমোচনের জন্য তিনি যে পথ নিয়েছিলেন , তার কথা উপরেই বলা হয়েছে। অশিক্ষা দূর করার কথা ভাবতে গিয়ে তিনি ইংরেজি-প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরোধিতা করলেন ১৮৯২ সালে লিখিত ও পঠিত 'শিক্ষার হের-ফের' প্রবন্ধে। এখানে তিনি ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু তখন এদেশে এই ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। ফলে তাঁকে নিজেই প্রতিষ্ঠান গড়ে নিতে হলো··· প্রথমে জোড়াসাঁকোয় ও পরে শান্তিনিকেতনে। কিন্তু ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে তিনি যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন, তার আগেই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে উপনিষদ এবং রামায়ণ-মহাভারত ও কালিদাস-ভবভূতির সংস্কৃত কাব্য-নাটকের জগতে প্রয়াণ করেছেন ··· কথা, কাহিনী ও কল্পনা কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি রচনা করে নৈবেদ্য-এর সনেটগুলিও লিখে ফেলেছেন। বিচিত্রকর্মা বৈদান্তিক ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কাব্যটি প্রকাশের আগেই একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে ' The World Poet of Bengal ' অভিধায় ভূষিত করেন। এরই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। নৈবেদ্য প্রকাশিত হলে ব্রহ্মবান্ধব গ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। প্রাচীন ভারতের তপোবন-শিক্ষার অনুসরণ করে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাবে তিনি সক্রিয়ভাবে সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা নানাভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। বিদ্যালয় পরিচালনা করতে গিয়ে তাঁকে অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কষ্ট তিনি ভোগ করেছেন ব্যক্তিগত জীবনে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই তিনি স্ত্রীকে হারালেন, তার পরের বছর মারা গেল দ্বিতীয় কন্যা রেণুকা ··· সবচেয়ে বেশি বেদনা পেলেন ১৯০৭ সালে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে । তাঁর কাব্যদেহে বিরাট পরিবর্তন এল। গীতিকবিতার ধরন ত্যাগ করে ছোটো ছোটো গানের আকারে ভাবকে সংহত করে রচনা করলেন গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর এই প্রথম দশকে কেবল ব্যক্তিগত শোককে আঁকড়ে ধরে তিনি জীবনবিমুখ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেননি। সমাজ ও রাজনীতির প্রতিটি উত্থানপতনে তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। বাঙালির শক্তিকে খর্ব করার উদ্দেশে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা নিয়েছেন, এ কথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেশকে আত্মশক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত করার জন্য ' স্বদেশী সমাজ ' প্রবন্ধ রচনা করে জনসভায় পাঠ করেছেন ও তাকে কার্যকর করার প্রয়াস নিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হলে তিনি জীবনে মাত্র একবারই প্রত্যক্ষ রাজনীতির আঙিনায় অবতীর্ণ হয়ে জনতাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ও নতুন নতুন স্বদেশী গান রচনা করে দেশের বেদনা ও সংগ্রামের সংকল্পকে ভাষা দিয়েছেন। তাঁর প্রয়াস ছিল গঠনমূলক, কিন্তু শহরবাসী ও গ্রামবিমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুখসর্বস্ব রাজনীতির সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেননি। ফলে তিনি বয়কট প্রভৃতি ভাঙন ও উত্তেজনার-আগুন-পোহানো রাজনীতি ত্যাগ

করে নিজের আশ্রমে ফিরে গিয়ে ছাত্রদের নিয়ে দেশ গড়ার সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু ১৯০৭ সালে নরমপন্থী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর সংঘর্ষে সুরাট কংগ্রেসে যজ্ঞভঙ্গ হওয়ার পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার আহ্বান পেলে তিনি উভয় পক্ষকে মেলানোর আকাঙ্ক্ষায় ও তাঁর গ্রামগঠনের আদর্শ পুনরায় যুবকদের সামনে ঘোষণার জন্য তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি দেন। পাবনায় সভাপতির ভাষণে তিনি সেই কথাই বললেন। কিন্তু সামান্যসংখ্যক আদর্শবাদী যুবক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেও নেতৃবৃন্দ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করেন। এরপর শুরু হলো সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। রবীন্দ্রনাথ দুঃসাহসী যুবকদের আত্মাহুতিতে ব্যথিত হলেও এই পথকে সমর্থন করতে পারেননি। সমসাময়িক অনেকগুলি প্রবন্ধে তিনি এই পন্থার সমালোচনা করেছেন। তার সাহিত্যরূপ পাই পরবর্তীকালে লিখিত 'ঘরে-বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেলেন। তাঁর কবিখ্যাতি বিস্তৃত হলো সমগ্র বিশ্বে। এর পরের বছরেই প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলো, যার ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন গত শতাব্দীর শেষ দিনে লেখা নৈবেদ্য-এর কবিতায় ··· 'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে'। অতঃপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষায় তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন ও তারই প্রচারে বারে বারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিক্রমা করেছেন। এই ঘটনাগুলি তাঁর সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে ও তার প্রকাশও হয়েছে বিচিত্রমুখী।

সব কথা আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। কিন্তু যে-ক'টি নমুনা এখানে উল্লিখিত হয়েছে, তাতেই স্পষ্ট হবে রবীন্দ্রসাহিত্যকে যথার্থভাবে বুঝতে হলে দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে পরিচিত হওয়া অত্যাবশ্যক। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা বর্তমান লেখকের 'রবিজীবনী', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী', কৃষ্ণ দত্ত ও অ্যান্ড্রু রবিনসনের ' Rabindranath Tagore : The Myriad Minded Man ' ও জ্যোতির্ময় ঘোষের 'রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক' বইগুলি পড়লে উপকৃত হবেন।

আধুনিকতার স্বরূপ এবং রবীন্দ্র-সমসাময়িক কয়েকজন কবি

পিনাকেশ সরকার

'আধুনিকতা' শব্দটি অনিবার্যভাবেই একটি সময়ধারণাকে উপস্থাপিত করে। ঐতিহাসিক বিচারে বলা চলে য়ুরোপীয় রেনেশাঁস-রিফর্মেশনের সময় থেকেই 'আধুনিক যুগে'র সূত্রপাত । সে হিসেবে গত প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরেই এই আধুনিকতার ব্যাপক বিস্তার শুরু হয়েছে য়ুরোপে। কিন্তু ইতিহাসের কালবিভাজন সমাজ-সংস্কৃতি-শিল্পের জটিলতর সূক্ষ্মতর ভাবপ্রবাহের ক্ষেত্রে সর্বদা প্রযোজ্য হতে পারে না। তাছাড়া য়ুরোপে যে যুগে যে পরিবেশের মধ্যে এই আধুনিকতার জন্ম হয়েছে, পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে সেই একই যুগে বা একই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটে নি। সুতরাং শুধুমাত্র ঐতিহাসিক যুগপর্যায়ের উপর নির্ভর করে বিষয়টির বিশ্লেষণ-প্রয়াস জটিলতার সৃষ্টি করবে। আসলে 'আধুনিকতা' বলতে শুধু যুগকালগত অব্যবহিতিই (immediacy) বোঝায় না। সেই সঙ্গে একটি সামগ্রিক মনোভঙ্গিকেও বোঝায়।

মানবতন্ত্র বা humanism আধুনিকতার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আধুনিক মানুষ ধর্মের

কুসংস্কারকে কাটিয়ে উঠে ক্রমশ যুক্তি ও বুদ্ধির খোলা চোখে বিচার করতে শিখেছে 'ঈশ্বর-সৃষ্টি' পৃথিবীকে। বিশেষত শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী সময়ে মানুষের মনে তার নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিষয়ে স্পষ্ট আত্মোপলব্ধি ঘটল। ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ খারিজ না করলেও সেই সর্বময় অধীশ্বরের মহিমা দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হলো। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের জগৎ বিশ্বমানবের কাছে মেলে ধরল এক অযুত সম্ভাবনার ভাণ্ডার। আধুনিকতাকে সেদিন মানুষ জেনেছিল এক সুস্থ জীবনাদর্শ হিসেবে। মানবসমাজে তা এনে দিল মুক্তির সম্ভাবনা—রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে , ধর্মের শৃঙ্খল থেকে, প্রথাবদ্ধ জীবনরীতি থেকে মুক্তির স্বপ্ন । ম্যাথু আরনল্ড এই আধুনিকতারই সূচনা করেছিলেন তাঁর ' On the modern element in Literature '(১৮৫৭) বক্তৃতায়।

কিন্তু আধুনিকতার এই সম্মানিত ধারণা কিছুদিনের মধ্যেই পাল্টাতে শুরু করল। হারাতে লাগল মানুষের বিশ্বাস ও সমগ্রতাবোধ । যন্ত্রের মাহাত্ম্য সে বুঝেছিল শিল্প-বিপ্লবের পরবর্তী কালে, কিন্তু উল্টো দিকে দ্রুত যন্ত্রায়ণের ফলে তার জীবনাদর্শ হয়ে উঠল কৃত্রিম। নগরায়ণ ক্ষুণ্ণ করল তার সুস্থ সবল জীবনবোধকে। ক্রমশ জন্ম নিতে লাগল একধরনের নৈরাশ্যবোধ— নীট্‌সে -শোপেনহাওয়ের -এর নৈরাশ্যবাদী ও নৈরাজ্যবাদী দর্শনের উদ্ভব এই পর্বেই। তারপর দু-দু'টি মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা মানুষকে এক আত্মশালী সংকটের মুখে ঠেলে দিল। বিংশ শতাব্দীতে এসে মানবসভ্যতা যে দ্রুত পরিবর্তনের মুখোমুখি হলো, জগতের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। সমাজের প্রায় সর্বস্তরে সঞ্চারিত হলো পরিবর্তনের তীব্র গতিবেগ। এই গতিবেগের কাছে ব্যক্তিমানুষ হার মানতে থাকল। যন্ত্রায়িত সমাজব্যবস্থায় , বিশেষত বুর্জোয়া ধনতন্ত্রী-সমাজে, ব্যক্তি ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়ল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আনন্দলোক থেকে সে নির্বাসিত হলো এক যন্ত্রসর্বস্ব জীবনপ্রথার আবর্তে। পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হয়ে সে বাসা বাঁধল নিজের অন্তর্জগতে। এই পরিবর্তনশীলতার মধ্যে অনেকেই লক্ষ করেছেন এক অমোঘ ধ্বংসাত্মক শক্তিকে। স্পেন্ডার যার নাম দিয়েছেন ' destructive element '। আধুনিক মানুষ এই ধ্বংসের আয়তক্ষেত্রেই শিল্প ও জীবনের তাৎপর্যকে খুঁজতে চেয়েছে। এক সর্বব্যাপী সংশয়বাদের জগতে আজ তার বাসস্থান নির্ধারিত। আধুনিক শিল্পে তাই এ স্থানের অবক্ষয় গ্লানি আত্মপরিহাস ও অসীম ক্লান্তি বারবার উচ্চারিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার কয়েকটি স্তর আছে। প্রথমটিকে বলতে পারি— মানবপ্রেম সংস্কারমুক্তি ও যুক্তিবাদের স্তর, যার নায়ক রামমোহন রায়-অক্ষয়কুমার দত্ত -ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের মতো চিন্তানায়ক ও তাঁদের রচনাধারা। এবং তারই সমান্তরালে মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধুর সাহিত্যকীর্তি। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ; যিনি দুই শতাব্দীর বৈশিষ্ট্যকেই সমন্বিত করেছেন তাঁর জীবনবোধে ও সাহিত্যসৃষ্টিতে। আর তৃতীয় পর্বের সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা হচ্ছে রবীন্দ্র-বিরোধিতাকে অবলম্বন করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কালেই স্পষ্ট হয়ে উঠল বাংলা কবিতার পালাবদল। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যে তার সূচনা। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মূলত রবীন্দ্র-ভাবাদর্শে বিশ্বাসী কবি। কিন্তু তাঁর কোনো কোনো কবিতাতেও ফুটে উঠল কবিতার আর এক চরিত্র। যুগোপযোগী ভাবনার বিন্যাস। যেমন তাঁর 'ধর্মঘট' কবিতায় (বেণু ও বীণা) আমরা দেখলাম গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান বাদলরাম হাল্‌ওয়াইকে যে কি না 'ধর্মঘটের মস্ত চাঁই'। 'ছ' ছ' দিনের ধর্মঘটে/ বিকিয়েছে সর্বস্ব তার/ অন্ন মোটে আর না জোটে/ তবুও কাজে যায় নি আর।' যাকে বলে ' topical interest' বা নিতান্তই সাময়িক প্রসঙ্গ, তাও গুরুত্ব পাচ্ছে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে, কবিতার বিষয় হয়ে উঠছে। 'দুর্ভিক্ষে' (কুহু ও কেকা') কবিতায় সরাসরি এসেছে ক্ষুধার প্রসঙ্গ : 'ঘাস পাতাতে চলবে কদিন? কদিন ওসব সইবে পেটে?/ শুকিয়ে আসছে ক্ষিদেয় নাড়ী, কারো নাড়ী দিচ্ছে কেটে।' একদিকে এধরনের জরুরি সামাজিক প্রসঙ্গ, অন্যদিকে দেখি

'সাম্যসাম'-এর (হোমশিখা) মতো কবিতায় এক উদার আহ্বান: 'জাগ জাগ ' ওগো বিশ্বমানব! বারতা এসেছে আজ !/ তোমার বিশাল বপু হতে ছিঁড়ে ফেল ভৃত্যের সাজ।' নজরুলের আগে সত্যেন্দ্রনাথই এই নতুন বার্তা নিয়ে এসেছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতায়। 'জাতির পাঁতি'(অভ্রআবীর) কবিতার কথাও প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে। পারিপার্শ্বিক দুনিয়া সম্পর্কে এই সচেতনতা সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় আধুনিকতার অন্যতম লক্ষণ। যখন তিনি বলেন:' মন ভেঙে যায় মোহ ফুরায় মুহুর্মুহু ধাক্কা যত লাগে/ রামধনুকের রঙীন স্বপন গুঁড়ো হয়ে যায় উড়ে কোন্ বাগে' (সাল-তামাকী/ ' বেলা শেষের গান') তখন আধুনিক মনের সংশয় ও হতাশার দিকটিও আর খুব অস্পষ্ট থাকে না। 'ফুলের ফসল'-এর 'আফিমের ফুল' বা 'আকন্দ'র মতো কবিতার চিত্রকল্পে যে বাঁকানো সংকেত তা আধুনিকতারই অন্তঃসাক্ষ্য বহন করে।

মোহিতলাল মজুমদার বা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতার মধ্যেও আধুনিকতার সংশয়বিদ্ধ রূপটিকে আমরা খুঁজে পাই। মোহিতলালের 'কালাপাহাড়', 'নাদির শাহের জাগরণ' বা 'অঘোরপন্থী'র মতো কবিতায় নজরুলের বিদ্রোহী-সত্তার পূর্বাভাস, আবার 'পান্থ' , 'পাপ' বা 'স্পর্শরসিক'-এ সংরক্ত দেহাত্মবাদের অকপট অভিব্যক্তি সেদিন বাংলা কবিতায় আধুনিকতার একটি ভিন্ন মাত্রা সংযোজিত করেছিল। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখবাদী কবি-সত্তা বহু আলোচিত । তাঁর প্রকাশভঙ্গির তির্যক পরিহাসময়তা, চিত্রকল্প-প্রয়োগের অভিনবত্ব স্পষ্টতই অন্যদের থেকে আলাদা। ' প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি' (ঘুমের ঘোরে) — এ ধরনের বাগ্‌ভঙ্গি সেযুগে বাস্তবিকই অভিনব। পৃথিবীকে তিনি দেখেন ঈশ্বর-সৃষ্টি 'চামড়ার কারখানা'রূপে। যেখানে রোমান্টিক প্রেমের কোনো স্থান নেই, যা আছে তা নিছক জৈব চাহিদানিবৃত্তি: 'প্রেমের প্রলেপ ঘষিয়া ঘষিয়া চক্‌চকে করে রাখা/ থেকে থেকে সেই আদিম গন্ধ তবুও পড়ে না ঢাকা। '

আবার নজরুল ইসলামের কবিতার উচ্চকিত প্রতিবাদ, সদর্প আত্মঘোষণা , দুরন্ত আবেগসঙ্কুলতা অন্য এক ধরনের মানসিকতাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়। 'সাম্যবাদী', 'বিদ্রোহী', 'ফরিয়াদ','আমার কৈফিয়ৎ' জাতীয় কবিতায় যে আবেগদৃপ্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পাই , তাতে কবিতার প্রকরণগত আধুনিকতা হয়তো অনুপস্থিত কিন্তু নিঃসন্দেহে তা সেদিনের পাঠকচিত্তকে উদ্‌বোধিত করতে পেরেছিল। রাবীন্দ্রিক বৃত্তকে ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় এঁরা সকলেই হয়তো অতিসচেতন, কিন্তু এছাড়া উপায়ও ছিল না তাঁদের। আর এঁদের প্রতিক্রিয়াধর্মী রবীন্দ্রবিরোধিতার পথ ধরেই অল্প দিনের মধ্যে এসে গেলেন একদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-মনীশ ঘটক-বুদ্ধদেব-অজিত দত্ত। অন্যদিকে যাঁদের কবিতা প্রথমাবধি স্বপ্রতিষ্ঠ সেই জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে'র মতো কবিবৃন্দ। বাংলা আধুনিক কবিতার ইতিহাসে সে এক নতুন পর্বাধ্যায়।

শরৎ-সাহিত্যে মাতৃত্ব : একালের প্রেক্ষিত

প্রভাসকুমার রায়

বঙ্কিমের মতো বিরাট প্রতিভা বা রবীন্দ্রনাথের মতো সমুচ্চ কবি-কল্পনার অধিকারী না হয়েও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেবলমাত্র সহজ আন্তরিকতার গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হতে পেরেছিলেন। তিনি এমনসব বিষয় নির্বাচন ও ঘটনার রূপ দিলেন যা আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে নিয়ত বর্তমান, তিনি এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করলেন যারা স্বভাবে-আচরণে, চিন্তায়-মননে, সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নায় আমাদেরই মতো। ফলে পাঠক সেইসব চরিত্রের সঙ্গে নিজের সত্তাকে অনায়াসে একাত্ম করে ফেলত। বিশেষ করে তিনি নারীর হৃদয়-বেদনাকে ফুটিয়ে তুলতে সবচেয়ে বেশি যত্নবান হয়েছেন। সমাজের নির্মম খেয়ালে নারীর প্রেম ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষা কীভাবে বিফল ও চূর্ণ হয়ে যায় তা নিপুণ বিশ্লেষণে অশ্রুসজল ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন।

শরৎ-সাহিত্যে কেবল প্রেম পারাবতী-নারীই নয়, জননীর হৃদয়-চিত্রটিও অপূর্ব মাধুর্যের সঙ্গে উদ্ভাসিত হয়েছে। তবে জননীর এই রূপ শরৎ-সাহিত্যে একটু অভিনব ধরনের, কেননা এখানে আপন গর্ভজাত সন্তানকে অবলম্বন করে স্নেহ-ভালোবাসা বিগলিত হয়নি, মাতৃত্বের মাধুর্যময় রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে অপরের সন্তানকে ঘিরে। শরৎচন্দ্র জননীর এই মাধুর্যময় রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন একান্নবর্তী যৌথ পরিবারের শুভ আদর্শকে ভিত্তি করে। আমরা সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে না গিয়ে মাতৃত্বের এই রূপটি কেবলমাত্র 'বিন্দুরছেলে', 'রামের সুমতি', 'মেজদিদি' এবং 'নিষ্কৃতি' — এই চারখানি বড়োগল্পকে ভিত্তি করে নির্ণয় করতে সচেষ্ট হবো। এই চারখানি গল্প তিনি ১৯১৩-১৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লেখেন। তখনও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বনাশা প্রভাব গ্রাম-বাংলার জন-জীবনে প্রভাব বিস্তার করেনি, তাই শান্ত-নিস্তরঙ্গ গ্রাম-জীবনের অখণ্ড চিত্র একান্নবর্তী পরিবারের মধ্য দিয়ে রূপলাভ করেছে।

শরৎচন্দ্র প্রেমমূলক গল্প-উপন্যাসে গভীর দুঃখবাদী। কিন্তু পারিবারিক আদর্শভিত্তিক রচনাগুলিতে আশ্চর্য রকমের আশাবাদী। সেজন্য সাময়িক বিরোধ ও সংকটের উপরে তিনি স্নেহপ্রীতি ও মিলনের আদর্শকেই বড়ো করে তুলে ধরেছেন, এ জাতীয় গল্পগুলির মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের জীবন দর্শন ও প্রতিফলিত। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন যৌথ পরিবারভুক্ত। ছোটোভাই প্রভাস এবং তিনি একই পরিবারভুক্ত ছিলেন, তাই যৌথপরিবারের আদর্শ সম্পর্কে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। শরৎচন্দ্র ছিলেন নিঃসন্তান, তাই হয়তো তাঁর পিতৃ-স্নেহ ও স্ত্রী-হিরন্ময়ীদেবীর মাতৃত্ব আবর্তিত হয়েছিল ছোটো ভাইয়ের সন্তানসন্ততীকে ঘিরে। এজন্যই হয়তো আমরা শরৎ-সাহিত্যে অপরের সন্তানকে ঘিরে মাতৃত্বের এমন অপূর্ব মাধুর্যরূপ দেখতে পাই।

শরৎ-সাহিত্যের যৌথপরিবারে যে অনাবিল সুখ শান্তি ও উদার মাতৃত্বের স্নিগ্ধ মাধুর্যময় রূপ দেখতে পাই তা আমাদের সত্যই বিমুগ্ধ করে তোলে। বহুমানুষের সাহচর্যের মধ্য দিয়ে লালিত হবার ফলে সেইসব পরিবারের সন্তানদের যেমন শিশুমস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশ হয়, তেমনি তারা উদার — মনস্কেরও অধিকারী হয়।

শরৎসাহিত্যের এই-পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে যখন আমরা স্নিগ্ধ জীবনরস আহরণ করি, তখন স্বভাবতই মনে পড়ে যায় বর্তমান কালের সমাজ প্রেক্ষিতের কথা। বলাবাহুল্য যৌথ পরিবারের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারাই আমরা বর্তমান যুগে দেখতে পাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সমাজ পরিবেশে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই

দুর্বর হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের ভোগমুখী চিন্তাধারা বেড়ে যায় , খণ্ডিত জটিল সমাজব্যবস্থার মধ্যে একটুখানি সুখ ও শান্তির প্রত্যাশায় মানুষ ছোটো নীড় বাধার চেষ্টা করে। এই ছোটো নীড়কে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সাজিয়ে তোলার দায়িত্ব নেয় গৃহকর্ত্রী। গৃহকর্ত্রীর সেই ছোট্টো সংসারে অবাঞ্ছিতলোকের প্রবেশ নিষেধ। সেখানে শুধু সে স্বামী এবং একটি কি বড়োজোর দু'টি শিশুর আবির্ভাব। সেই শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার প্রথম দায়িত্ব নেয় উচ্চশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত নারী-আন্দোলনের অগ্রণী যাত্রী ছোটো পরিবারের সেই জননীই।

মধ্যযুগের সাহিত্যে ব্রাহ্মণসমাজ

প্রীতিপ্রভা দত্ত

১২০২ খ্রীঃ বখ্‌তিয়ার খিলজী যখন বাংলাদেশ অধিকার করেন তখন বাংলায় দুই প্রধান সমাজ ছিল— বৌদ্ধ সমাজ ও হিন্দু সমাজ। দুই সমাজই আক্রমণের আকস্মিকতায় ও বীভৎসতায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বৌদ্ধসমাজের অনেকেই আশ্রয় নেয় তিব্বত ও নেপালে। অনেকে আবার চট্টগ্রামে। আর হিন্দুসমাজ বিশেষ করে নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজ মুসলমান শাসকদের অত্যাচার, নিপীড়ন ও ধর্মান্তকরণের বলি হয়। এই পটভূমিকাতেই মধ্যযুগে হিন্দুসমাজের স্রোতধারা প্রভাবিত হয়েছিল।

এই সকল কারণে হিন্দুসমাজে নতুন করে জাতিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। একটা মীথ সৃষ্টি করা হয়েছিল, যার দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছিল যে , বাংলার সকল জাতির মধ্যেই পিতৃকুল নয়, মাতৃকুলের উচ্চবর্ণের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলার জাতিসমূহের এই সঙ্করত্বকেই ভিত্তি করে বাংলায় মুসলমান রাজত্ব শুরু হবার অব্যবহিত পরেই রচিত হয়েছিল 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'-এ বাংলার জাতিসমূহকে বিভক্ত করা হয়েছিল তিন শ্রেণীতে— উত্তম সঙ্কর, মধ্যম সঙ্কর, অন্ত্যজ।

পরবর্তীকালে ময়ূরভট্টের 'ধর্মপুরাণ', মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' , বিজয় গুপ্ত রচিত 'মনসামঙ্গল', ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', দেবীবরের 'মেলবন্ধন' এবং পর্যটকগণের ভ্রমণকাহিনীসমূহ থেকে মধ্যযুগের সামাজিক বর্ণবিন্যাসের একটা সঠিক চিত্র পাওয়া যায়।

এ থেকে জানা যায় বাংলার হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সাধারণত এই তিন বর্ণেরই প্রাধান্য ছিল। কবি মুকুন্দ তাঁর নিজের জন্মস্থান দামুন্যা গ্রামের বর্ণনারম্ভে লিখেছেন :

'কুলে শীলে নিরবদ্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য
দামুন্যায় সজ্জন প্রধান।'

প্রায় একশত বৎসর পূর্বেও যে হিন্দুসমাজে এই তিন জাতিরই প্রাধান্য ছিল তা বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' থেকেও জানা যায়। আবার এদের মধ্যেও ছিল নানা ভাষা। আমাদের আলোচ্য বিষয় মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রতিফলিত ব্রাহ্মণ সমাজ।

দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরা বৈদিক , বারিন্দ্রী ও রাঢ়ী — এই তিনভাগে বিভক্ত ছিলেন। আবার এদের মধ্যে কুলীন ও অকুলীন — এই দুই ভাগ দেখা যায়।

তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণরাই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতেন। সুকুমার সেন

সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গলে এর পরিচয় পাওয়া যায় :

'ব্যবহারে বড় রিজু
নিত্য পড়য়ে মজু
বেদবিদ্যা মুখে অবিরত ' (পৃ: ৭৯)

এঁরা মূলত ছিলেন খুব সাত্ত্বিক প্রকৃতির ও বিদ্বান। বেদ, আগম, পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁদের পারদর্শিতা ছিল ও নানাস্থান থেকে বিদ্যার্থীগণ তাঁদের কাছে পড়তে আসত। নিত্যানন্দ দাসের ' প্রেমবিলাস'-এ, বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এ, মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ , ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ অধ্যাপকদের সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উক্তি করা হয়েছে। যেমন—বৃন্দাবন দাস বলেন :

'ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিত্র বা আচার্য
অধ্যাপনা বিনা কারো নাহি কোন কার্য।' (পৃ: ১৩)

কবিকঙ্কণ বলেন—

'কণ্ঠে তার সরস্বতী মুখে তার বৃহস্পতি
আগম আদি বেদ বাখান।'

' চৈতন্যভাগবত'-এ স্পষ্টভাবে বলা হয় নি যে, এঁরা অর্থের বিনিময়ে বিদ্যাদান করতেন, কিনা। কিন্তু 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ 'শ্রীমন্তের বিদ্যাদান' অংশে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

বিবাহাদি অনুষ্ঠান শেষ হওয়ামাত্র ব্রাহ্মণ এক কাহন দক্ষিণা আদায় করত। ঘটক ব্রাহ্মণেরা উপযুক্ত পুরস্কার না পেলে বিবাহসভামধ্যে কুলের অখ্যাতি করত। ঘটক সম্পর্কে ঘনরাম বলেন :

'ভট্টজাতি শঠ বড় সভাতে পাঠক
না করে মিথ্যারে ভয় বিশেষ ঘটক।'

কবিকঙ্কণ বলেন—

'গালি দিয়া লন্ডেভন্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দন্ডে
কুলপঞ্জি করিয়া বিচার।'

গ্রহবিপ্র অর্থাৎ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা শিশুর কোষ্ঠী তৈরি করতেন এবং গ্রহদোষ কাটাবার জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করতেন। মুকুন্দ মঠপতি বর্ণবিপ্রগণের উল্লেখ করেছেন :

'গুজরাট একপাশে গ্রহবিপ্রগণ বেসে
বর্ণদ্বিজগণ মঠপতি' (পৃ-৮০)

অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরও উল্লেখ এই কাব্যে পাওয়া যায়। এরা শ্রাদ্ধ ও মৃত্যুকালীন দান গ্রহণ করতেন, এই কারণে 'পতিত' বলে গণ্য হতেন। এছাড়া বাঙালি মুসলমানদের নানা অনুষ্ঠানে যারা কাজ করতেন তাদের বলা হতো আলেম ব্রাহ্মণ। এদের পরিচয়ও 'চন্ডীমঙ্গল'-এর 'কালকেতুর গুজরাট নগরপত্তন' কালে পাওয়া যায়।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর একটি উক্তি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক :

'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণ
কলিযুগে ছাড়ে লোক নিজ নিজ ধর্ম।'

আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত জয়নারায়ণ সেনের 'হরিলীলা' পাঠে মনে হয় , ব্রাহ্মণেরা ঐ যুগে শুধু শাস্ত্রচর্চা করতেন না, অন্তত তাদের মধ্যে কিছু লোক রাজনীতি চর্চাও করতেন। সেখানে বলা হয়েছে—

'দক্ষিণে বসিয়া বেদবক্তা দ্বিজগণ
রাজনীতি কহে কহে ব্রহ্ম নিরুপণ।।'

সমসাময়িক কালের মূর্খ ব্রাহ্মণদের কটাক্ষ করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরাঙ্মুখ হন নি :

'প্রভু কহে সন্ধিকার্য্য জ্ঞান নাহি যার।
কলি যুগে ভট্টাচার্য পদবী তাহার।'

' চৈতন্যভাগবত'-এ জগন্নাথ মিশ্র আক্ষেপের সঙ্গে বলেন :

'সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত
পড়িয়াও আমার ঘরে কেন নাই ভাত।
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতে যে নারে
সহস্র পন্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে।'

ভোগবিলাসী ব্রাহ্মণের উল্লেখও চৈতন্যভাগবতে রয়েছে। যেমন :

'তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে
দশবিশ জন যার আগে পাছে রড়ে।'

কিংবা পুন্ডরীক বিদ্যানিধির সভার যে বর্ণনা রয়েছে তা প্রায় রাজসভার সদৃশ :

'দিব্য খট্টা হিঙ্গুল পিত্তলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে।।
তঁহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মবাসে।
পট্ট নেত বালিস শোভয়ে চারিপাশে।।
. . . .
দিব্য ময়ূরের পাখা লয় দুই জনে।
বাতাস করিতে আছে জেরে সর্বক্ষণে।।'

বস্তুত নতুন সামন্ততান্ত্রিক জীবনাদর্শের কাঠামো সকলকেই প্রভাবিত করে। ফলে বৃদ্ধি পায় অর্থ -সম্পদ, ভোগ-বিলাসিতার প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা। আর দেখা যায় অর্থ-সম্পদই বৃদ্ধিকরে সামাজিক প্রতিপত্তি। এর প্রমাণ 'অন্নদামঙ্গল'-এ দেবীর কৃপায় অর্থলাভের পর দরিদ্র হরিহোড় সমাজের উচ্চ আসন লাভ করে :

'বাহাত্তুরে গালি ছিল তাহা গেল দুর'

এবং

' ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা।'

এই কারণে কখনো কখনো ব্রাহ্মণদের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব দেখা যায় :

'শতেক বামন মিছা পুঁথি বানাইয়া
কাফর করিল লোকে কোফর করিয়া।'

বৈষ্ণবদের ভ্রষ্টাচার সম্পর্কে 'ধর্মমঙ্গল'-এ বলা হয়েছে —

'না বুঝে তত্ত্ব পরদারে মত্ত
মজাইবে মাংসে মদে।'

আর জয়ানন্দ ভবিষ্যদবাণী বলে যা লিখেছেন তা তৎকালীন বহু ব্রাহ্মণ সম্পর্কে সত্য পরিচয় :

'ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে,
মোজা পাএ পড়ি হাথে কামান ধরিবে।'

এছাড়া 'চৈতন্যভাগবত'-এ অবিনয়ী, অহংকারী, উদ্ধত ব্রাহ্মণের পরিচয়ও পাওয়া যায়। এভাবে গোটা মধ্যযুগের সাহিত্য বিচার করলে ব্রাহ্মণদের বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন তালিকা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হতে পারে। কিন্তু স্বল্প পরিসরে তা সম্ভব নয়। সুতরাং আলোচনা এক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। আর সে কারণেই এই আলোচনা সর্বাঙ্গীন বা ক্রটিহীন নয়।

ভাষাশিল্পী শরদিন্দু: সৃষ্টির আলোকে

প্রমীলা ভট্টাচার্য

যাঁর জন্ম ১৮৯৯ সালের ৩০ মার্চ, সেই বরেণ্য কথাশিল্পী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতবর্ষের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁর সৃষ্টির পথরেখাটুকু চিনে নেওয়ার এ এক ক্ষুদ্র কিন্তু আন্তরিক প্রয়াস।

আজীবন নিরলস সাহিত্যসেবী শরদিন্দুর বাংলা কথা সাহিত্যের কক্ষে কক্ষে ছিল অনায়াস বিচরণ, কিন্তু তাঁর প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ ঘটেছে গোয়েন্দা, ঐতিহাসিক ও অলৌকিক কাহিনী রচনায়। কখনও গোয়েন্দা গল্পের বুদ্ধিদীপ্ত রহস্যরোমাঞ্চে, কখনও ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্সের বর্ণাঢ্য কল্পনা কুশলতায়, কখনও বা অতি প্রাকৃতের বিস্ময়শিহরণে তিনি পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন। একথা বলা বাহুল্য যে শরদিন্দুর এই কালজয়ী জনপ্রিয়তার মূল কারণ শুধু কাহিনীগুলির বিষয়বস্তুই নয় — তাঁর ভাষা এবং রচনারীতিও বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে।

সাহিত্যরসিক পাঠক ও সমালোচককুল একথা একবাক্যে স্বীকার করে থাকেন যে ভাষা শরদিন্দু -সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের মতে — 'তাঁর গল্পের গুণ বহুগুণিত করেছে তাঁর ভাষা।' তাঁর এই সাফল্যের মূলে আছে তাঁর গদ্যশৈলীতে সাধু ও চলিত রীতির অপূর্ব সহাবস্থান। শরদিন্দুর লেখা অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসেই লক্ষ করা যায় সাধুভাষার পূর্ণ-ক্রিয়াপদ ও গম্ভীরধ্বনি তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার অথচ তার চলন চলিতের মতেই সাবলীল, সপ্রতিভ, লঘুছন্দ, প্রাঞ্জল ও বর্ণময়। ভাষায় অনর্থক জটিলতা বা বক্রতা সৃষ্টির দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ নেই। তৎসম শব্দের প্রতি শরদিন্দুর মধুর পক্ষপাতিত্ব আছে বটে, বর্তমান জীবনে অপ্রচলিত কিছু কিছু প্রাচীন শব্দ যে তিনি ব্যবহার করেন না তাও নয় — কিন্তু লেখকের অভিপ্রেত ভাব প্রকাশে বা পরিবেশ সৃষ্টির কাজে তারা এমনই অপরিহার্য যে এই ধরনের শব্দ প্রয়োগ কোথাও অবাঞ্ছিত বলে মনে হয়না। যেমন 'জাতিস্মর' গল্প গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'অমিতাভ' গল্পটিতে লক্ষ করা যায় একাধিক প্রাচীন শব্দের ব্যবহার, যথা — ঔদক দুর্গ, সৈনিকের গুল্ম, সৃক্কণী, শক্তু, পুরোডাশ, চিপিটক প্রভৃতি অথচ এই শব্দগুলিই যে উক্ত গল্পের বিষয় ও যুগপরিবেশ অনুযায়ী অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত এ সত্য তো অস্বীকার করা যায়না।

শুধু পরিবেশানুগ ভাষা ব্যবহার নয়, চরিত্রানুগ সংলাপ সৃষ্টির মাধ্যমে কাহিনীর পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুটনের ব্যাপারেও শরদিন্দুর কৃতিত্ব প্রশ্নাতীত। সমস্তরের বা সমশ্রেণীভুক্ত মানুষের মধ্যে একজনের সঙ্গে অপরজনের সূক্ষ্ম পার্থক্য তাদের মুখের ভাষায় তিনি অবলীলাক্রমেই ফুটিয়ে

তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে শরদিন্দুর গোয়েন্দা সাহিত্যমালার নায়ক ব্যোমকেশ ও তার বন্ধু অজিত দু'জনেই উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালি, কিন্তু ব্যোমকেশ সত্যান্বেষী, বাস্তব জীবনের তীব্র, তীক্ষ্ণ সমস্যাবলীর সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ — তাই ব্যোমকেশ স্পষ্ট ভাষী — তার বক্তব্য সে প্রত্যক্ষভাবেই ব্যক্ত করে, কোনো রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেনি — অপরদিকে অজিত সাহিত্যিক - মনের ভাব সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপিত করার প্রতিই তার আন্তরিক আগ্রহ।

শরদিন্দুর গদ্য ভাষায় কাব্যের সৌরভ নিঃসন্দেহেই তাঁর অন্তর্লীন কবিসত্তার অনিবার্য প্রতিফলন। তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী গল্প-উপন্যাসগুলিতে তো বটেই, অন্যান্য শ্রেণীর রচনাতেও মাঝে মধ্যে উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অর্থালংকারের প্রয়োগ ভাষায় অন্য এক মাত্রা দিয়েছে অথচ কোথাও তাকে কৃত্রিম বা আড়ষ্ট করে তোলেনি। কখনও কখনও তিনি আমাদের পরিচিত দৈনন্দিন জীবন থেকে প্রয়োজনীয় উপমা চয়ন করে নিয়েছেন — যেমন 'গৌড়মল্লার'-এ তিনি লিখেছেন —

'দারুকের বর্ণ ছিল ধান-সিদ্ধ করা হাঁড়ির তলদেশের ন্যায়।' — নিকষ কালো রঙের তুলনা সাহিত্য জগতে অনেক আছে কিন্তু এ হেন উপমা সচরাচর লক্ষ করা যায় কি ?

অধিকাংশ রোমান্টিক লেখকের মতোই রমণীর রমণীয় রূপের বর্ণনায় শরদিন্দুর নৈপুণ্য উপলব্ধি করা যায় — এক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর প্রিয় ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণার কথা বিস্মৃত হওয়ার উপায় নেই। তাই শরদিন্দুর সব ধরনের কথাসাহিত্যেই নায়িকারা অনিন্দ্য সুন্দরী। গোয়েন্দা গল্প 'মর্মমৈনাক' -এর হেনা মল্লিক, ঐতিহাসিক রোমান্স 'মৃৎপ্রদীপ' -এর সোমদত্তা, 'চুয়াচন্দন' -এর চুয়া, 'বিষকন্যা'র উল্কা-এরা প্রত্যেকেই সৌন্দর্যদেবতার বরপুত্রী, কিন্তু বিস্ময় জাগায় 'ছায়া' — অলৌকিক গল্প 'শূন্য শুধু শূন্য নয়' -এর ছায়া কায়াহীনা — অথচ নায়ক গৌরমোহন আঙুলের স্পর্শের সাহায্যে তার যে রূপ অনুভব করেছে তাও তো কম মধুর নয় :

'চোখ দুটি বেশ টানা টানা মনে হইতেছে, নাকটি সরু, ঠোঁট দুটি ভারি নরম, প্রসারে একটু বড়ো।'

কখনও কখনও নতুন ধরনের শব্দসৃষ্টিতেও শরদিন্দু-আগ্রহ অনুভব করা যায়। যেমন অ-জ্বালিত সিগারেট, সর্বংবহা খাতা ইত্যাদি।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শরদিন্দুর দুই প্রিয় কবি। এই দুই কবির রচনার প্রতি শরদিন্দুর প্রীতি ও শ্রদ্ধার অজস্র উদাহরণ তাঁর সৃষ্ট গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে ছড়িয়ে থেকে তাঁর ভাষায় এনে দিয়েছে গভীর রসদ্যোতনা।

আলোচনার প্রাক-সমাপ্তি মুহূর্তে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে কথাশিল্পী শরদিন্দুর মেজাজ সরস ও প্রসন্ন। শিল্পী মনের এই প্রসন্নতা ও স্মিত কৌতুকের ছোঁয়ায় তাঁর অনেক সাধারণ মানের রচনাও পাঠককে সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত আবিষ্ট করে রাখে, আর এর মধ্যেই নিহিত আছে শুধু ভাষাশিল্পী রূপে নয়, জীবনশিল্পীরূপেও শরদিন্দুর সাফল্যের মূল সূত্রগুলি।

বাঙালির লেখা ইংরেজি সাহিত্য

পল্লব সেনগুপ্ত

ভারতচন্দ্রের মৃত্যু, ১৭৬০। রবীন্দ্রনাথের জন্ম এবং মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশ, ১৮৬১। এই এক শতাব্দীর মধ্যে বাঙালির সাহিত্যচর্চার মূল স্রোতটা বহমান ইংরেজি ভাষায়। রোম্যান্টিক কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক বাংলার আগে ইংরেজিতেই লিখেছেন বাঙালি লেখকরা। দেশচেতনা এবং সমাজ পরিবর্তনের সংকেত সাহিত্যে ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে। তাই বাংলার সাহিত্য সাধনার ক্রমবিবর্তনে বাঙালির লেখা ইংরেজি লেখাগুলির একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। এই ধারা, এ-অবধিও প্রবাহিত।

প্রথম লেখক, জনৈক নাটোরবাসী রামরতন চক্রবর্তী, ইংরেজ ব্যবসায়ী উইলিয়ম হিকীর কর্মচারী। কবিতার রচনাকাল ১৭৯২। তবে এঁর পরিচয় সংশয়মুক্ত নয়। 'মেমোয়ের্স অব উইলিয়ম হিকী' বইতে লেখাটি পাওয়া যায়। এরপর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্মী মোহনপ্রসাদ ঠাকুর এবং রামতনু গাঙ্গুলী ও ছিদামচন্দ্র দাসের কিছু অনুবাদমূলক এবং 'অভিধান ধর্মী' বই বেরোয়। ঠাকুরের 'ভোকাবুলারি',' টেলজ ফ্রম দ্য পার্সিয়ান', গাঙ্গুলীর 'বিউটিজ অব অ্যারাবিয়ান নাইটস' এবং দাসের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বেরোয় ১৮১০-'১৬-র মধ্যে।

এদেশে প্রথম পরিণত ভাবে ইংরেজিতে সাহিত্যচর্চা করতে শুরু করেন হেনরী ডিরোজিও। ইয়ং বেঙ্গলের এই দীক্ষাগুরু তাঁর ছাত্রদের মনে যে ভাবনাগুলি গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন, সেগুলি তাঁর সাহিত্যেও প্রতিবিম্বিত। এগুলি হলো, স্বদেশচেতনা, সামাজিক বামপন্থা, বিশ্ববোধ, যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠা এবং মানবমুক্তির দাবি। তাঁর বই: 'পোয়েমস' (১৮২৭) এবং 'দ্য ফকীর অব জঙ্গীরা' (১৮২৮)। গদ্য লেখা এবং সাংবাদিকতামূলক লেখাও তাঁর ছিল।

ডিরোজিওর সমকালেই কাশীপ্রসাদ ঘোষের 'দ্য শাঅর অ্যান্ড আদার পোয়েমস' (১৮৩০) বেরোয়। দেশপ্রেম, রোম্যান্টিকতা এবং হিন্দু পালাপার্বণ বর্ণনা-এগুলিই ছিল তার উপজীব্য। গুরুচরণ দত্তের 'স্কুল আওয়ার্স' (১৮৩৯) এবং রাজনারায়ণ দত্তের 'ওসমান অ্যান অ্যারাবিয়ান টেল' (১৮৪১) ও 'হেনরিক অ্যান্ড রোশিনারা' (১৮৪৩) বাইরনীয় ঢঙে লেখা কাব্য।

ঐ সময়েই কৈলাশচন্দ্র দত্তের লেখা নভেলেট 'এ জুর্নাল অব ফর্টি -এইট আওয়ার্স ইন দ্য ইয়ার ১৯৪৫' (১৮৩৫) খুব উল্লেখযোগ্য। ইংরেজের বিরুদ্ধেএক শতাব্দী পরে সশস্ত্র বিপ্লবের কল্পনা করে লেখা ঠিক এই কাহিনীর মতোই আর একটি নভেলেট হলো শশিচন্দ্র দত্তের 'রিপাবলিক অব ওড়িশা : অ্যানালস ফ্রম দ্য পেজেস অব টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' (১৮৪৫)। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কিং পোরাস' (১৮৪৩) এবং 'অন্সরী' (১৮৪৪) হলো ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যের যথাক্রমে প্রথম ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক কাব্য। পরে তিনি মাদ্রাজে গিয়ে লেখেন 'দ্য ক্যাপটিভ লেডী' এবং 'দ্য ভিসনস অব দ্য পাস্ট' (১৮৪৮/৪৯)।

এই সময় থেকে রামবাগানের দত্ত পরিবারের সন্তানরা ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যে খুব খ্যাতিমান হতে থাকেন। কৈলাস এবং শশি তো বটেই, তাঁরা ছাড়াও গোবিন্দচন্দ্র (' স্পেসিমেনস ফ্রম এ ভল্যুম অব ভার্সেজ' / ১৮৪৮ ; 'ডাট ফ্যামিলি অ্যালবাম', সম্পাদিত / ১৮৭০), হরচন্দ্র ('ফিউজিটিভ পিসেজ'/১৮৫১; 'লোটাস লীভস' /১৮৭১; 'রাইটিংস : স্পিরিচুয়াল, মরাল অ্যান্ড পোয়েটিক' /১৮৭৮)

গিরীশচন্দ্র ('চেরী স্টোনস' / ১৮৭৯; 'চেরী ব্লসমস'/১৮৮৭) উল্লেখযোগ্য কবি। এঁদের পরের প্রজন্মের তরু এবং অরু। তরু আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর 'এ শীফ গ্লীনড ইন ফ্রেঞ্চ ফীলডস' (১৮৭৬, '৭৯, '৮২) প্রাচীন আমল থেকে তাঁর সমকাল অবধি ফরাসী কবিতার একটি প্রামাণ্য অনুবাদ সংকলন। 'এনসেন্ট ব্যালাডস অ্যান্ড লিজেন্ডস অব হিন্দুস্থান' (১৮৭৮) ভারতের পৌরাণিক এবং লৌকিক কাহিনী নিয়ে লেখা কিছু কবিতা, আর তার সঙ্গে কয়েকটি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ একত্রে সংকলিত। ফরাসি ভাষায় 'লে জুর্নাল দ্য মাদমোয়াজেল দ্যার্ভের্স' (১৮৭৯) এবং ইংরেজিতে 'বিআংক আর দ্য ইয়ং স্প্যানিশ মেডেন' (বেঙ্গল ম্যাগাজিনে ১৮৭৭-৭৮ এ ধারাবাহিকভাবে বেরোয়) নামে দুটি রোম্যান্টিক উপন্যাসও লেখেন তিনি। শশিচন্দ্রেরও অনেকগুলি বই সুপরিচিতি লাভ করে। 'মিসালেনীয়াস ভার্সেজ' (১৮৪৮), 'শংকর : এ টেল অব দ্য মিউটিনি' (১৮৭৫), 'টাইমস অব ইওর' (১৮৭৫), 'ভিনসন অব সুমেরু' (১৮৭৮) প্রভৃতি কবিতার বই, 'ইয়ং জমিন্দার' (১৮৮২) নামে একটি উপন্যাস, 'রেমিনিসেনসেজ অব এ কেরানীজ লাইফ' (১৮৮৩) ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। তাঁর বিখ্যাত ভ্রাতুষ্পুত্র রমেশচন্দ্র বাংলা ছাড়াও ইংরেজি প্রবন্ধ ও উপন্যাস লেখেন যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দ্য লেক অব পামস' (১৮০৫) এবং 'দ্য স্লেভ গার্ল অব আগ্রা' (১৮৯০)। রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য থেকেও সংকলন কোরে, ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশিত করেন তিনি।

কথাসাহিত্যে অবশ্য আগেই বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজমোহন'স ওয়াইফ' (১৮৬৪) এবং লালবিহারী দে 'ফোক টেলজ অব বেঙ্গল' (১৮৭৬) এবং 'গোবিন্দ সামন্ত, অর বেঙ্গল পেজ্যান্ট-লাইফ' (১৮৭৪) লিখেছেন। লালবিহারীর 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকা ছিল ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যের স্বর্ণখনি।

এরপরে দীর্ঘদিন মূলত কবিতারই চর্চা করেছেন ইঙ্গ-বাঙালি কবিরা। নবকৃষ্ণ ঘোষের (রামশর্মা) 'উইলো ড্রপ্স' (১৮৭৪), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'ফ্লাইটস অব ফ্যান্সি' (১৮৮১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'লিরিকস অব ইন্ড' (১৮৮৬), স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী' (১৯০০) উল্লেখযোগ্য। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১৮৯৬ থেকে শুরু করে 'কোয়েস্ট ইটার্নাল' কাব্য শেষ করেন ১৯৩৬-এ। তার আগে রবি দত্ত ('ইকোজ ফ্রম ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট'/১৯০৯), শ্রী অরবিন্দ ('সংস অব মার্টিল্লা', 'বাজি প্রভু' এবং 'সাবিত্রী' সমগ্র গ্রন্থাবলীতে বিভিন্ন সময়ে সংকলিত) সরোজিনী নাইডু ('দ্য গোলডেন থ্রেসোল্ড' /১৯০৫, 'দ্য বার্ড অব টাইম'/১৯০৬, 'দ্য ব্রোকেন উইং'/১৯০৮) এবং মনোমোহন ঘোষ ('লাভ সংস অ্যান্ড এলিজিস' /১৮৯৮, 'সংস অব লাভ অ্যান্ড ডেথ'/১৯২৬) কবিতা লিখে বিখ্যাত হন।

রবীন্দ্রনাথের বইগুলির কথাও এখানে আলোচ্য : 'গীতাঞ্জলি অর সং অফারিংস' (১৯১৩) 'স্ট্রে বার্ডস' (১৯১৭), 'দ্য চাইল্ড' (১৯৩১), 'কালেকটেড পোয়েমস অ্যান্ড প্লেজ' (১৯৩৬) ইত্যাদি উল্লেখনীয়। এখানে প্রাসঙ্গিক যে— এই ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'ই নোবেল প্রাইজ পায়।

এঁদের পরে মূলত কথাসাহিত্যই ব্যাপক হয়ে উঠল। ধনগোপাল মুখার্জির 'গে৷ নেক', 'চীফ অব দ্য হার্ড', 'করি দ্য এলিফ্যান্ট' অরণ্যের প্রাণীজীবনের কল্পকাহিনী; এই শতাব্দীর বিশের ও ত্রিশের দশকে লেখা। তারপরে, ভবানী ভট্টাচার্য ('সো মেনি হাঙ্গারস', 'মিউজিক ফর মোহিনী', 'হি হু রাইডস এ টাইগার', 'এ গডেস নেমড গোল্ড', 'শ্যাডো ফ্রম লাডাখ') এবং সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ ('অ্যান্ড গ্যাজেল্স লীপিং', 'ক্র্যাড্‌ল অব দ্য ক্লাউডস', 'ফ্রেম অব দ্য ফরেস্ট', 'দ্য ভার্মিলিওন বোট') থেকে শুরু করে অতি সাম্প্রতিক উপমন্যু চ্যাটার্জি ('ইংলিশ আগস্ট') এবং অমিতাভ ঘোষ ('ক্যালকাটা ক্রোমোজোম') পর্যন্ত সেই ধারাই প্রবহমান।

প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্য : রবীন্দ্রভাবনায়

বিশ্বনাথ রায়

পূর্বাপর যোগসূত্রে গ্রথিত এবং নানা যুগলক্ষণে চিহ্নিত বাংলা সাহিত্য মোটাদাগে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত— প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য। 'প্রাচীন' বলতে সাধারণভাবে প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কথাই বলতে চাই ; — মধ্যযুগ এবং তৎপূর্ববর্তী আদিযুগের সাহিত্য দুই-ই এই হিসাবের অঙ্গীভূত । 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে আধুনিক কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিকতা'কে একটি 'মর্জি' বলেছিলেন। 'প্রাচীনতা'ও আসলে তাই;— দেশকাল প্রভাবিত এক বিশেষ মনোভঙ্গির প্রকাশ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রত্যেক যুগন্ধর রচয়িতাই কোনো না কোনোভাবে কমবেশি মাতৃভাষার পুরাতন সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত। ঈশ্বরগুপ্ত-মধুসূদন-বঙ্কিম থেকে শুরু করে উনিশ শতক এবং শেষ হতে চলা বর্তমান শতাব্দীর অধিকাংশ সাহিত্যিক সম্পর্কেই একথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। এই সূত্রেই আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথের কথায় আসতে পারি। রবীন্দ্রনাথের সৃজনী প্রতিভা, তথা তাঁর ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগের বিশিষ্টতা বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক কৌতূহলপ্রদ উপাদান।

সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদেই তার চরিত্রগুণের পরিচয়। এদিক থেকে প্রাক্-আধুনিক বাংলাসাহিত্য সাধারণভাবে বাঙালির সর্বায়ত গ্রামীণ জীবন চেতনার ফসল; অন্তরে-বাহিরে তা 'রুর‍্যাল' (Rural) মনোধর্মের রচনা । অন্যপক্ষে আধুনিক সাহিত্য জন্মাবধি স্বভাব নাগরিক। এর অমিশ্র 'আর্বান' (urban) চরিত্র নিয়ে কারো সংশয় নেই। অথচ প্রথম থেকেই বাংলাদেশ তথা সারা ভারতবর্ষেও 'আধুনিক' নাগরিকতার সঙ্গে আবহমান গ্রামীণ জীবন ধারার দূরত্ব ও বিচ্ছেদ ক্রমশ দুস্তর হয়ে উঠছে। এ সমস্যার সমাধান রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন, কর্ম ও সাধনা দিয়ে করে গেছেন আপন সীমিত গন্ডিতে। নাগরিকতা ঋদ্ধ পরিবারের সন্তান হয়েও গ্রামীণ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার সহযোগে তার উন্নয়নের সাধনা ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের এক শ্রেষ্ঠ ব্রত। আর ঐ গ্রামীণ জীবনের প্রাণধর্মকেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে। সেই সাহিত্যের আস্বাদন, অনুসন্ধান, আলোচনা-পর্যালোচনা তাঁর পক্ষে ছিল এক ধরনের আন্তরিক 'প্যাশন' । সে নিছক নান্দনিক মূল্যের জন্য নয়— তার সার্বিক জীবন মূল্যের সম্ভাবনাবশেই।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই আধুনিক শিক্ষিত নাগরিক বাঙালি সাহিত্যিকদের আগ্রহ নানা দিক থেকেই পুরাতন বাংলা সাহিত্যের উপর প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্য-চর্চার পুরোটাই ছিল য়ুরোপীয় প্রেরণাদর্শ প্রভাবিত নবজাগরণ চেতনার এক জাতীয়তাপ্রবুদ্ধ প্রয়াসমাত্র। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আরো বেশি কিছু খুঁজেছিলেন উক্ত সাহিত্যধারায়; খুঁজে পেয়েওছিলেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যদিয়ে স্বদেশী ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে নতুন ভাবনার দিশাটুকু যুক্ত করেছিলেন অনাগত সৃষ্টিপ্রবাহের সঙ্গে। প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই সমন্বয়ী দৃষ্টি বিধানেই রবীন্দ্রনাথের প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্য-চর্চা যা কিছু মূল্য ও সার্থকতা।

জীবনের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হয়ে অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন (১৯৩৭)— ' এককালে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য আমি মন দিয়ে এবং আনন্দের সঙ্গেই

পড়েছিলুম। ' এ কেবল নিছক একটি খবর নয়, আসলে কী গভীর মনোযোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনুপুঙ্খ অধ্যয়ন করেছিলেন তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। 'প্রাকৃত পৈঙ্গলম্', 'চর্যাপদ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে শুরু করে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিত সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্য, ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থ রয়েছে সে পাঠ্য তালিকায়। আর এই মানসিক সংযোগ সূত্রেই নিজের বহমান জীবনে উক্ত সাহিত্যধারার সাঙ্গীকরণ ও মূল্যায়ন করেছিলেন তিনি স্বতন্ত্র আগ্রহে।

প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদনাতেও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল পথিকৃতের। প্রথম যৌবন থেকেই প্রাচীন পুঁথি-পত্রের সংগ্রহ, গ্রাম্য সংগীতের অন্বেষণ দিয়েই তার সূচনা। ছড়া-রূপকথা-ব্রতকথা-বাউল্‌গান সংগ্রহে বাঙালির মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম পথচারী। বৈষ্ণব পদাবলী সংকলনেও উদ্যোগ নিয়েছেন বার বার। ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি 'পদরত্নাবলী'(১২৯২)। আর নিজের লেখায় আধুনিক-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের ব্যবহার ও প্রভাব অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, ' আমি বাল্যকালে য়ুরোপীয় সাহিত্য পড়বার ভালো সুযোগ পাই নি— এবং তার পরিবর্তে বৈষ্ণব পদাবলী পড়েছিলুম ও তার থেকে আমার লিরিকের ভঙ্গি ও ভাষা গ্রহণ করবার সুযোগ পেয়েছিলেম এটা আমার পক্ষে একটা বাঁচোয়া। নইলে আমি হয়তো নবীন সেন প্রভৃতির মতো বাইরনী ছাঁচে লেখবার চেষ্টা করতুম।'

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সাঙ্গীকরণ এবং তার রূপান্তরসাধনে সে যুগে তিনি ছিলেন অনন্য। বাউলগানের গভীরে অনন্ত জীবনাভাস, বৈষ্ণব কবিতায় পরম প্রেমের মধুরিমা, চণ্ডীমঙ্গলের ভাঁড়ু দত্তের শঠ চরিত্রে সৌন্দর্যের রহস্য, ছড়া-রূপকথা-ব্রতকথায় চিরায়ত বাঙালি জীবনের প্রাণ-প্রবাহের ফল্গুস্রোত রবীন্দ্ররচনার নানা ক্ষেত্রে এসবেরই অজস্র বর্ণ বিচ্ছুরণ। প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অভিনব ভাবনায় আজও তিনি অনন্য। মাত্র ষোল বছর বয়সে 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' তে প্রসঙ্গক্রমে গীতিকবি হিসাবে বৈষ্ণব পদকর্তাদের আলোচনা দিয়ে যার সূত্রপাত, জীবনের প্রান্তসীমায় 'বাংলাভাষা পরিচয়'এর সার্বিক আলোচনায় তার সমাপ্তি। এর মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্য, লোকসাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে তাঁর ভাবনা চিন্তা ও মূল্যায়ন যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে, রবীন্দ্র-উত্তর কালের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চর্চায় তা দুর্লভ।

অধুনাতনকালে আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজ তো বটেই, ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক মহলও আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। এর কারণ সম্ভবত উক্ত সাহিত্যের আলোচনা-পর্যালোচনা ক্রমশ নীরস কন্টকাকীর্ণ তথ্যভার জর্জরিত একাডেমিক্ দৃষ্টিভঙ্গি সর্বস্ব হয়ে পড়া। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনোই তা চান নি। প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চায় রবীন্দ্রভাবনাকে যদি সঙ্গী করে নেওয়া যায়, তাহলে এই সমস্যার মোচন সম্ভব বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রসঙ্গ : লোক সাহিত্য — প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী

লোক সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, লোকসাহিত্যের সঙ্গে শিষ্ট সাহিত্যের প্রভেদ, লোকসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ তৎসহ ছড়া, ধাঁধা, প্রবন্ধ, লোককথা, লোকসংগীত, গীতিকা, লোকপুরাণ, কিংবদন্তী প্রভৃতির পরিচয় আলোচিত হবে। লোকসাহিত্য সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও আলোচনার ধারাটি বিশ্লেষিত হবে। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে ১৩০১ বঙ্গাব্দ থেকে যদিও আমরা লোকসাহিত্য চর্চার সচেতন সূত্রপাত বিবেচনা করি, কিন্তু তৎপূর্ব থেকেই এই আলোচনার সূত্রপাতে বিদেশীদের ভূমিকাটি অস্বীকার করার নয়— তবে তার মূলে ছিল মূলত ঔপনিবেশিক শাসন ক্ষমতা রক্ষার আগ্রহ ও সেই সঙ্গে এদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের ব্যাকুলতা— জ্ঞান চর্চার ব্যাপারটি থাকলেও তা ছিল চরিত্রে গৌণ। উপযুক্ত তথ্যাদি সহ এই বিষয়গুলিই ব্যাখ্যাত হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রেরণা

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বক্তৃতা : 'বঙ্কিম-উপন্যাসের পাশ্চাত্য প্রেরণা'

সাহিত্যে 'প্রভাব' আবিষ্কার করার যে-প্রবণতা অনেক সমালোচকের মধ্যে লক্ষ করা যায় তা অনেক সময় বিপজ্জনক। যাই হোক, সাহিত্য-মীমাংসায় ব্যাপারটাকে কিছু গুরুত্ব দিতেই হয়। আর তুলনামূলক সাহিত্য-চর্চার এটি অন্যতম ভিত্তি। বঙ্গীয় নবজাগরণের হোতাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একজন, সুতরাং সেদিক থেকে তাঁর রচনার পশ্চাতে পাশ্চাত্য প্রেরণা থাকা খুব স্বাভাবিক । এই স্বাভাবিকতা খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, শ্রী অরবিন্দ তাঁর ' The Bengal He [Bankim] Lived In ' - প্রবন্ধে। তবে অন্য সব মহান লেখকের মতোই, বঙ্কিমচন্দ্র অনুকরণ করেন নি, আত্মসাৎ করেছেন। (টি.এস.এলিঅট যথার্থই বলেছেন যে, ' Immature poets imitate; mature poets steal. ') বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যয়নের পরিধি বিস্ময়কর— অনুবাদে ফরাসী গ্রন্থাদিও তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ভিক্তর হ্যুগোর উল্লেখ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিম তাঁর নিজের সাহিত্যের আদর্শ পাশ্চাত্য সাহিত্যে খুঁজেছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে। তিনি উপন্যাস লিখতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর নিজের দেশের সাহিত্যে উপন্যাসের কোনো ঐতিহ্য ছিল না। 'বাসবদত্তা' বা 'কাদম্বরী' 'কথা'-পর্যায়ে পড়ে, ' novel '-পদবাচ্য নয়। ওঅলটার স্কট ছাড়া অন্য যে-সমস্ত কথাসাহিত্যিকদের উপন্যাস বঙ্কিম বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ডিকেন্স, থ্যাকারি, শার্লট ব্রন্টি, লর্ড লিটন এবং উইলকিন্স। ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের রোমান্টিক পঞ্চপাণ্ডব— ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, বায়রন, শেলি ও কীটস — সব শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছেই বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিলেন, এবং বঙ্কিম এর ব্যতিক্রম নন। আর সর্বোপরি আছেন শেকস্‌পীয়র। স্কটের উপন্যাসকে বঙ্কিম হয়তো তাঁর আদর্শরূপে সামনে রেখেছিলেন, কিন্তু স্কটের প্রভাব বঙ্কিম-উপন্যাসে গভীর নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের শরীর পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের মাটিতে গঠিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বকীয় প্রতিভা দিয়ে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি শুধু বাংলা উপন্যাসের জনক নন, ভারতীয় উপন্যাসেরও জনক। ই.সি.ডিমকও একথা স্বীকার করেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখার আগে খুব সম্ভবত বঙ্কিম 'আইভ্যান্হো' পড়েন নি। তাঁর উপন্যাসগুলির নাটকীয়তার মূলে তাঁর শেক্সপীয়র-অনুশীলনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। 'রজনী'উপন্যাসে পাশ্চাত্য প্রেরণায় যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির শুধু কাহিনীর বৈচিত্র্যে বা প্লটের বিন্যাসেই নয়, চরিত্র-অঙ্কনে এবং ভাষাতেও পাশ্চাত্য প্রেরণা লক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয় বক্তৃতা : উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রেরণা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান-অপ্রধান অধিকাংশ বাঙালি কবির রচনায় পাশ্চাত্য প্রেরণা পরিস্ফুট। বঙ্গীয় নবজাগরণে যে-নতুন সাহিত্যের আরম্ভ, তার গোড়াতেই আমরা বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গত কারণেই তাঁকে 'ভোরের পাখি' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর 'সারদামঙ্গল'-কাব্যে যে সরস্বতী বন্দনা আছে, তার সঙ্গে শেলি'র 'হিম্ টু ইন্‌টেলেকচ্যুয়াল বিউটি'র সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তাঁর 'সঙ্গীত শতক' -এর কয়েকটি গানে কীটসের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। নবীনচন্দ্র সেন 'বঙ্গের বায়রন'-নামে পরিচিত ছিলেন। উদ্দাম ভাবাবেগের দ্বারা চালিত এই বঙ্গকবির রচনায়, বিশেষত তাঁর ঐতিহাসিক গাথাকাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫)-এ বায়রনের প্রভাব চোখে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'নির্ঝরিণী'র কবিতাগুলিতে কীটসীয় রূপতান্ত্রিকতা 'sensuous ness' রয়েছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য প্রেরণার ধারাবর্ষণে অভিষিক্ত। বাংলা সাহিত্যের বহু বিভাগে বা genre -এ তিনি পথিকৃৎ, কিন্তু এগুলির প্রেরণা এসেছে প্রতীচ্য থেকে। চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেই শুধু নয়, তাঁর 'বীরাঙ্গনা' এবং ' মেঘনাদবধকাব্যে'ও তিনি পাশ্চাত্য কবিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন। তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দেই শুধু নয়, মেঘনাদবধকাব্যের ভাষা ও রচনাশৈলীতেও রয়েছেন মিলটন প্রধানত, তা ছাড়া ভার্জিল, দান্তে ইত্যাদি কবিকুল। তাঁর মহাকাব্যের মূল কাহিনীই শুধু প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্য থেকে নেওয়া , ভাষাভঙ্গি, শৈলী, আঙ্গিক ইত্যাদি পাশ্চাত্য মহাকাব্য থেকে এসেছে। তাঁর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও বৈপ্লবিক বা রোমান্টিক — তাই তাঁর কাছে রামের চেয়ে রাবণ মহত্তর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ নিয়ে আজীবন পাশ্চাত্য সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন। অসংখ্য ইংরেজ লেখকের রচনা ছাড়াও তিনি গ্যেটে ও হাইনে ইত্যাদি জার্মান লেখকদের, এবং আমিয়েল, জুবেখার ইত্যাদি ফরাসী লেখকদের রচনা সযত্নে পড়েছেন। জার্মান ও ফরাসী ভাষা তিনি খানিকটা শিখেও ছিলেন। হেনরি মর্লির কাছে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে শেকস্‌পীয়রের নাটকেরও অনুশীলন করেছেন। প্রয়াত তারকনাথ সেন মনে করেন যে, ' Though Tagore did not write plays after the Shakespearean pattern, it is with Shakespeare that he belongs. ' মিলটনের মহত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। তবে রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে-ইংরেজ কবিদের সমধিক প্রভাব দেখা যায় তাঁরা রোমান্টিক কবিকুল, বিশেষত ওয়ার্ডসওয়ার্থ , শেলি ও কীটস। 'বাংলার শেলি' নাম তাঁর ভালো না লাগলেও শেলি ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রিয় লেখক এবং তিনিও ছিলেন, শেলির মতই 'সূর্যচারী' ('Sun-treader') । রবার্ট ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথ একই তারিখে জন্মেছেন (৭ মে) এবং অনেক দিক থেকেই তাঁরা সমানধর্মা। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা ও গানে (এবং অন্যান্য রচনাতেও) ব্রাউনিং-রাগিনীর অনুরণন শোনা যায়।

বাংলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি (১৯০১-৪৬)

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

১. বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বকে লেখকদের পক্ষে উত্তেজনার পর্ব (It was an exciting Period for the writers) বলে ঘোষণা করেছিলেন স্কট জেমস। ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবিও তাঁর 'A Study in History' গ্রন্থে বলেছিলেন যে ১৯১৪-১৮-র মধ্যে সাহিত্যে আধুনিকতার অবসান ঘটে গেল। এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বই কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের কথা মাথায় রেখে এই সমস্ত মন্তব্য করেছিলেন। তাঁদের সঠিকভাবেই মনে হয়েছিল যে বিংশ শতাব্দীতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

২. পাশ্চাত্য উপন্যাসে আধুনিকতার সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীতেই । উপন্যাসের বিষয় বা form নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেখানে আগেই শুরু হয়ে গেছে। বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তেই (১৯০৩) প্রকৃত আধুনিকতার সূচনা। কারণ এখানেই প্রথম মানুষের 'আঁতের কথা'-কে বাইরে টেনে বের করবার চেষ্টা হয়েছে। তবে 'চতুরঙ্গ'তেই (১৯১০) প্রথম উনিশ শতকীয় প্লটের কাঠামো রবীন্দ্রনাথ ভেঙে দিলেন। 'গোরা'র (১৯০৯) মাধ্যমেই প্রথম বাংলা সাহিত্যে Novel of Ideas এল।

৩. Modernism বা আধুনিকতা প্রধানত গড়ে ওঠে 'আমিত্ব'কে কেন্দ্র করে। Post-Modernism এই 'আমিত্ব'কে বারবার ভাঙতে চেষ্টা করেছে। টয়েনবি যখন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আধুনিকতার অবসানের কথা বলেন তখন তিনি বোধ হয় এই আমিত্বে-র প্রাধান্যের অবসানেরই ইঙ্গিত দেন। বিন্যাসে ক্রমশ দেশকালই প্রাধান্য পেতে থাকে। সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিও তাই ক্রমশ পাল্টে যায়। বলা হলো গদ্য পড়ে জানবার জন্য লেখকের মুখের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই, পাঠক ওগুলো বিনির্মাণ করে পড়বে। বলা হলো সাহিত্যকর্ম আবেগ, আইডিয়া বা সংবেদন দিয়ে তৈরি হয় না, হয় শব্দ দিয়ে। তাই কোনো সৃষ্টিই লেখকের আত্মপ্রকাশ নয়।

৪. বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণতত্ত্ব, ১৯১০-এ লন্ডন শহরে Post Impremionist দের চিত্র প্রদর্শনী (on or about December 1910 human nature changed-- Virginia Woolf)। আর জাতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, আইনঅমান্য , সত্যাগ্রহ, বিপ্লববাদ। ত্রিশের দশকের চরম অর্থনৈতিক মন্দা একই সঙ্গে মধ্যবিত্তের জীবনে চরম-অনিশ্চয়তা, জীবন ও জীবিকার সংকট, পাশাপাশি অস্তিত্বের সংকটও নিয়ে আসে। এই সময়ের বাঙালি প্রধান বা অপ্রধান ঔপন্যাসিকেরা এদের কোনো না কোনোটির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথও নন। গোরা, ঘরে বাইরে বা চার অধ্যায় তার নিদর্শন। পথের দাবী লিখে শরৎচন্দ্র দেখাতে চেয়েছিলেন যে তিনিও গ্রামবাংলার বাইরে পা বাড়াতে পারেন। আবার এর প্রভাবে চেতনাপ্রবাহের উপন্যাসও আসে।

৫. তবে ইউরোপীয় উপন্যাসের সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের পটভূমিকার পার্থক্য রয়েছে। বাংলা উপন্যাসের জন্মলগ্ন ঔপনিবেশিক পরাধীন ভারতবর্ষে। ১৯৪৭-এর আগে স্বাধীনতা আসে নি। ঔপনিবেশিক কাঠামোয় নায়কের বিকাশ ঘটে না। উপন্যাস যে আধুনিক যুগের মহাকাব্য তার কারণ তা হলো সমাজ, সংস্কৃতি , শাসকগোষ্ঠী বা প্রকৃতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানুষের সংগ্রামের কাহিনী। কিন্তু একমাত্র পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটলেই এই চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। তাই বঙ্কিমকে নায়কের সন্ধানে ইতিহাসের

আশ্রয় নিতে হয়, সামাজিক উপন্যাসের নায়ক এসেছিল জমিদারদের মধ্য থেকে । রবীন্দ্রনাথও উপন্যাস রচনার প্রথম পর্বে এই পথের পথিক। পরে তিনি অখন্ড মানুষকে উপন্যাসে ধরার পক্ষপাতী ছিলেন।

৬. চোখের বালির 'আঁতের কথা' শরৎচন্দ্রকে অবশ্যই আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু এটি তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ তাঁর বিন্যাসে এসেছে। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে স্বীকার করে নিয়েই তিনি তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন। সম্ভবত তিনিই একমাত্র 'খাঁটি বাঙালি ঔপন্যাসিক'। গ্রামবাংলাকে শরৎচন্দ্রের মতো কম লেখকই জানতেন কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের গ্রামে সমাজের উপরতলা ছাড়াও নিচের দিকেও In Social Tenrien শুরু হয়ে গিয়েছিল, তা তাঁর চোখে পড়ে নি। উচ্চবর্গের পাশাপাশি নিম্নবর্গের এই আলোড়ন তারাশঙ্করের উপন্যাসেই প্রথম ধরা পড়ে। জীবন-জীবিকা-উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন, নিম্নবর্গের আত্মমর্যাদাবোধকে তিনিই প্রথম উপন্যাসে তুলে ধরেন।

৭. কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা আশ্রয় খুঁজেছিলেন প্রধানত কন্টিনেন্টাল সাহিত্যে। Naturalism , Bohemianism, Realism প্রভৃতিকে তাঁরা উপন্যাসের উপজীব্য করতে চেয়েছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র , নুট হামসুন ও ম্যাক্সিম গোর্কিকে মেলাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপহাস করে বলেছিলেন, 'ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যা'-কে মেলানো যায় না। তাই কল্লোলের বিপরীতে মানিকের অবস্থান । তিনিই বাংলা সাহিত্যে Socialist Realism -এর প্রবক্তা। পাশাপাশি আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের সংকট তাঁর উপন্যাসে রয়েছে।

৮. এই পর্বে রাজনীতি অবশ্যই ঔপন্যাসিকদের প্রিয়বস্তু। তবে কেউ-কেউ রাজনৈতিক সত্যকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন কেউ বা দিতে চেয়েছেন জীবনসত্যকে। অবলম্বিত মতবাদের প্রতি আনুগত্য অবশ্যই আছে কিন্তু সংশয়গুলিকে গোপন করা হয় নি। চার অধ্যায় থেকেই এর সূত্রপাত। ধাত্রীদেবতা, একদা, বা জাগরীর মতো উপন্যাসে বারে বারে রাজনীতির রথচক্রে পিষ্ট মানবাত্মার আর্তনাদ শোনা গেছে। তবে এদের মধ্যে একদা উপন্যাসের নায়কই সমসাময়িক রাজনীতির বিবর্তনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছে এবং শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে। প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বের এই জাতীয় উপন্যাসে পরাধীনতার একটা চাপা যন্ত্রণা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু দেশমুক্তির স্বপ্ন অনেকের লেখাতেই মানবমুক্তির স্বপ্নে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

সাহিত্যবিচারের নানা মত, নানা পথ

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘ তিনঘন্টা ধ'রে সাহিত্যতত্ত্বের মূল প্রসঙ্গগুলো আলোচনা ক'রে সাহিত্যালোচনায় সে সবের ব্যবহার দৃষ্টান্তসহ যেভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাকে ধরার চেষ্টা না করাই ভালো। কিছু কথা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন । পাশ্চাত্যে নিত্যনতুন আন্দোলনের ঢেউ যেভাবে ওঠা-নামা করেছে, আমাদের এদেশের সাহিত্যবিচারে আমরা অনেকসময় তাকে যান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করেছি। শুধু করেছি নয়, এখনও করে চলেছি। তাই আমাদের সাহিত্যসমালোচকেরা 'উত্তর-গঠনবাদ', 'উত্তর-ঔপনিবেশিকতা','উত্তর-আধুনিকতা','বিনির্মাণবাদ'-প্রভৃতি শব্দগুলো নিয়ে যথেচ্ছ 'খেলা' বা 'লীলা' করেন। একটা দেশে সাহিত্যের তত্ত্ব জন্ম নেয় সেই দেশের আর্থ-সামাজিক পরিপার্শ্ব, সাহিত্যকর্ম প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'রে। কিন্তু মধ্যযুগীয় সংস্কারান্ধ এই দেশে ঔপনিবেশিক মানসিকতা আজও ঘোচে নি।

এখনও বুর্জোয়া -অর্থনীতির ব্যাপক বিকাশ হয় নি অথচ তৃতীয় বিশ্বের এই রুগ্ন দেশ বিশ্বের বাজারে ঢুকে পড়তে চাইছে। রাহুগ্রস্ত বিপন্ন এই অর্থনীতির প্রতিবিম্বন সাহিত্যসৃষ্টিতে হয়েছে অনিবার্য। সাহিত্যবিচারকেরাও এই পরিধির বাইরে নেই। আত্মবিস্মৃত একটা জাতির ইতিহাস থাকে না, নিজস্ব অর্থনীতি থাকে না, সাহিত্য বা সাহিত্যতত্ত্বও থাকে না। বিশ শতকের সাহিত্যতত্ত্বে ভাষাতত্ত্বের প্রবল আধিপত্যের মুহূর্তে আমরা একবারও ভর্তৃহরি বা দণ্ডীর কথা ভাবি না, কুন্তকের কথাও না। আমরা ব্রাডলে, অথবা রিচার্ডস (আই.এ.) ,অ্যাডেন এর মুখে ' atmosphere of infinite suggestion' - কথাটা শুনে চমকে উঠি অথচ আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্তের ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে থাকি উদাসীন। আমরা 'Reader response' -এর কথা যতটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবি, ততটা ভাবি না আলঙ্কারিক-কথিত 'সহৃদয় সামাজিক' বা 'রস' নিয়ে। মার্কস প্রমুখ যখন ভিত্তি (অর্থনীতি) ও অধিসৌধের (শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি) দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাহিত্য বিচারে এক ধরনের নব্যতা এনেছিলেন তখন তাকে আমরা সেভাবে নিতে পারি নি, কেউ বা প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের জন্যে, কেউ বা বুদ্ধিকে খাঁচায় আটকে রাখার জন্যে। ফলে পুরোপুরিভাবে আমরা না-পশ্চিম -না-পূর্ব এমন জায়গায় আমাদের অবস্থানটা বেছে নিলাম। ঠিক এই মুহূর্তে, আমরা মনে করি, নবীনকে জায়গা ক'রে দিতে দিতেই অতীতের পুনরালোচনা করতে পারি। লুপ্ত রত্ন উদ্ধারের আশু প্রয়োজন। তবে এব্যাপারেও আমরা সংস্কারমুক্ত থাকতে চাই। সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করতে হবে নিষ্ঠাসহ। তারপর সেখান থেকে বেছে নিতে হবে এমন একটা কোণ যেখানে সমালোচকের কমিটমেন্টে কোনো খাদ থাকবে না। 'কমিটমেন্ট' লেখকের কাছ থেকে কাম্য, কাম্য সমালোচকদের কাছ থেকেও । নইলে 'সমালোচনা সাহিত্য' কথাটার কোনো মানে থাকে না।

খুব সংক্ষেপে কথাগুলো ব'লে নিয়ে আমরা এবার কিছু মহাজনবাক্য উদ্ধার করছি; এবং তা অবশ্যই পাশ্চাত্য থেকে। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র থেমে গিয়েছে অনেককাল আগে। সংস্কৃতে সাহিত্যরচনাও গোঁড়ামি ছাড়া আজকাল আর কিছু মনে হয় না। সংস্কৃতের পণ্ডিতেরা বেশিরভাগই তাঁদের আঞ্চলিক ভাষায় বলা-কওয়া করলেও অবিলম্বে ইংরেজি বা জার্মান ভাষার জগতে ঢুকে পড়েন। তাই আমরাও কিছু পশ্চিমী মহাজনের মন্তব্য তুলে দিচ্ছি ।এতে কাজের কাজ হবে না। তবে উজ্জীবিত হওয়ার মতো কিছু মিলে যেতে পারে।

রুশ ফর্মালিস্ট <u>Victor Shklovsky</u>(জন্ম ১৮৯৩)- 'Poetry is a special way of thinking; it is, precisely, a way of thinking in images, a way which permits what is generally called 'economy of mental effort', a way which makes for 'a sensation of the relative ease of the process .' Aesthetic feeling is the reaction to this economy.

<u>Medvedev</u> (মতান্তরে বাখতিন): '· · · if literature is a social phenomenon, then the formal method, which ignores and denies this, is first of all inadequate to literature itself and provides false interpretations and definitions of its specific characteristics and features.'

<u>Mukarovsky</u> - The analysis of 'form' must not be narrowed to a mere formal analysis. On the other hand, however, it must be made clear that only the entire construction of work, and not just the part called content; enters into an active relation with the system of life values which govern human affairs.

<u>নিও ক্রিটিসিজম এবং লিভিসিয়ান ক্রিটিসিজম:</u>

লিভিস (Leavis)-এর মতে :' Literary criticism and philosophy seem to me to be quite distinct and different kinds of discipline -- at least, I think they ought to be · · · By the critic of poetry I understand the complete reader. The ideal critic is the ideal reader. The reading demanded by poetry is of a different kind from that demanded by philosophy.'

হারমেনিউটিকস (এই তত্ত্বের জন্ম ষোড়শ শতকের জার্মানীতে। বিশ শতকে হাইডেগার আনলেন নতুন মাত্রা)

হানস-জর্জ গাডামার (Hans-Georg Gadamer): ' All writing is, as we have said , a kind of alienated speech, and its signs need to be transformed back into speech and meaning. Because the meaning has undergone a kind of self-alienation through being written down, this transformation back in the real hermeneutical task.'

ভাষাতাত্ত্বিক সমালোচনা

রোজার ফাউলার (Roger Fowler): 'Adopting a Linguistic approach to literature, as I do, it is tempting to think of and describe the literary text as a formal structure, an object whose main quality is its distinctive syntactic and phonological shape · · · To treat literature as discourse is to see the text as mediating relationships between language users : not only relationships of speech, but also of consciousness, ideology , role and class. The text ceases to be an object and becomes an action on process.'

অবয়ববাদ এবং সাহিত্যসমালোচনা :

জেরার্ড জেনেট -'Structural criticism is untainted by any of the transcendent reductions of psychoanalysis, for example,or marxist explanation, but it exerts, in its own way, a sort of internal reduction, traversing the substance of the work in order to reach its bone-structure : Certainly not a superficial examination , but a sort of radioscopic penetration, and all the more external in that it is more penetrating.'

উত্তর-গঠনবাদ

রলাঁবার্ত : ' The Author , when believed in, is always conceived of as the past of his own book: book and author stand automatically on a single line divided into a before and an after. The author is thought to nourish the book, which is to say that he exists before it, thinks, suffers , lives for it, is in the same relation of antecedence to his work as a father to his child.

পরিগ্রহণ তত্ত্ব এবং 'Reader response Criticism'.

উলফগাং ইসার - 'We look forward, we look back, we decide , we change our decisions , we form expections, we are shocked by their nonfulfilment, we question, we muse , we accept , we reject ; this is the dynamic process of recreation.'

নারীবাদী সমালোচনা (Feminist Criticism)

এলাইন সোআলটার , জন্ম ১৯৪১ (Elaine Showalter) Feminist Criticism has gradually shifted its center from revisionary readings to a sustained investigation of lit-

erature by women. The second mode of feminist Criticism engendered by this process is the study of woman as writers, and its subjects are the history, styles,themes, genres, and structures of writing by women , the psychodynamics of female creativity, the trajectory of the individual or collective female career; and the revolution and laws of a female literary tradition.

" Postmodernism, from this perspective, mimes the formal resolution of art and social life attempted by the avant-garde while remorselessly emptying it of its political content . . '' the aesthetics of postmodernism is a dark parody of such anti-representationalism.

বিস্তারিত জানার জন্য ইংরেজিতে লেখা কিছু বই :

1. From Modernism to Postmodernism : An anthology . Edited by Lawrence Cahoone. Blackwell Publishers , 1996.
2. Twentieth Century Literary Theory : Edited by K.M. Newton Macmillan Press Ltd. 1988,1997.
3. Modern Criticism and theory : A Reader.Edited by David Lodge Longman Group Ltd. 1988.
4. Structuralism and Since. Edited by John Sturrack. Oxford University Press. 1979
5. Feminist Practice & Post Structuralist Theory : Chris Weeden.Basil Blackwel Ltd. 1987.
6. De Construction : A critique. Edited by Rajnath. Macmillan press Ltd. 1989
7. এছাড়া I.A. Richards —এর Principles of Literary criticism. Lunacharsky'র ' On Literature and Art ' এবং Engletom & Milne সম্পাদিত ' Marxist Literary Theory ' অবশ্য পাঠ্য।

উপন্যাসের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি

বিপ্লব দাশগুপ্ত

উপন্যাস কী, উপন্যাস কাকে বলে— এসব প্রাথমিক প্রসঙ্গে আমি বাগবিস্তার করতে চাই না। তবে একথাটা ভুলে যাওয়া অসঙ্গত হবে যে পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যেই উপন্যাস দেখা দিয়েছিল সাময়িক পত্রের হাত ধরে। প্রথম থেকেই এর মধ্যে ছিল ব্যাপক অংশের পাঠকের মন ভোলানোর আয়োজন। কেননা পত্রিকা চালাতে গেলে তার পাঠক চাই, চাই উত্তরোত্তর ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি। কাগজ তো ছাপা হলো। কিন্তু পড়বে কে, কিনবে কে? অতএব পাঠকের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক সুখপাঠ্য আখ্যান পরিবেশনের লোভ কখনোই সম্বরণ করতে পারেন না। কোনো কালের কোনো সম্পাদক , এখনও পর্যন্ত কোনো প্রকাশকের পক্ষেও সম্ভব নয়— উপন্যাসের কেনাকাটার বাজারকে উপেক্ষা করে চলার। এই সূত্রেই আর্থিক প্রসঙ্গের পাশাপাশি এসে পড়ে সমাজ নামের একটি প্রচলিত অস্তিত্ব। আর্থিক চাহিদার পাশাপাশি এসে পড়ে সামাজিক চাহিদার প্রসঙ্গটিও। উপন্যাসের নির্মাণের মূলে এই আর্থ-সামাজিক ভিত্তি কিভাবে কাজ করে সেটাই আমাদের বিস্তারিত আলোচনার বিষয়।

বাংলাগদ্য : প্রাক্-ফোর্ট উইলিয়ম পর্ব (১৭৮৫ -১৭৯৩)

মণিলাল খান

পোর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারত-ভূখন্ডে আসার নতুন জলপথ আবিষ্কারের ঘটনা একটি 'উল্লেখযোগ্য' ঘটনা। এই পথে প্রাচ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা উৎসাহ বোধ করেন। এ জন্যে ইংরেজরা রানী এলিজাবেথের সনদ নিয়ে ১৬০০ খ্রীঃ ৩১ ডিসেম্বর একটি কোম্পানী গঠন করে। নাম : ' কোম্পানী অব্ মারচেন্টস অব্ লন্ডন ট্রেডিং ইন টু দি ইস্ট ইন্ডিস্'— সংক্ষেপে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী'।

১৬১১ খ্রীঃ কোম্পানীর জাহাজ সর্বপ্রথম ভারতের পশ্চিমে সুরাটে আসে। পরে আমেদাবাদ, কাম্বে ও গগাতে কুঠিও নির্মাণ করে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ ইংরেজ অধিকারের সীমা ক্ষেত্র অনেক দূর প্রসারিত হতে সাহায্য করে।

ইতিমধ্যে কোম্পানি দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন করেছে এবং ইংরেজি আইনবিচারের কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। কিন্তু বিচারের ব্যবস্থায় গতি আনতে গভঃ জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস তিনজন ইংরেজ সিভিলিয়ানকে নিয়োগ করেন বাংলাভাষায় ইংরেজি আইনের অনুবাদের কাজে। তিনজন হলেন জোনাথান ডানকান, নীলবেঞ্জামিন এড্ মোনস্টোন ও এইচ.পি. ফরস্টার।

১৭৮৫ খ্রীঃ প্রথম প্রকাশিত আইন গ্রন্থ কোম্পানীর নিজস্ব ছাপাখানায় মুদ্রিত হলো। নাম: ' রেগুলেশনাস ফর দি এডমিনিস্ট্রেশন অব জাস্টিস ইন দি কোর্ট অব দেওয়ানী আদালত' সংক্ষেপে 'ইম্পে কোড'। অনুবাদকের নাম জোনাথান ডানকান। অনুবাদের গদ্য সরল ও স্পষ্ট।

দ্বিতীয় গ্রন্থ: 'বেঙ্গল ট্রানশ্লেশানস্ অব রেগুলেশন ফর দি এডমিনিস্ট্রেশন অব্ জাস্টিস ইন দি ফৌজদারি অর ক্রিমিন্যাল কোর্ট।' (১৭৯১) এবং 'বেঙ্গল ট্রানশ্লেশানস্ অব রেগুলেশনাস্ ফর দি গাইডান্স অব দি ম্যাজিস্ট্রেট 'স(১৭৯২)। আরবী-ফার্সী বহুল দুর্বোধ্য বাংলা।

১৭৯৩ খ্রীঃ হেনরি পিট্স ফরস্টার অনুবাদ করেন 'শ্রীযুক্ত নবাব গভর্নর বাহাদুরের হুজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন'। সংক্ষেপে সেটি 'কর্ণওয়ালিশ কোড' বলে খ্যাত। সরল ও গুরুভার বহনক্ষম।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার আগেই বাংলা গদ্যের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগ যে সঠিক ও সার্থক ছিল তার প্রমাণ পরবর্তী পর্যায়ে দেখতে পাই 'কলেজ' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে।

এস্পানিয়া ও বাংলা সাহিত্য

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো সাহিত্যের সঙ্গে অন্য-একটি ভাষার সাহিত্যের যোগাযোগ নানাভাবেই হ'তে পারে: প্রত্যক্ষ পরিচয় (বা ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ) বিবিধ বিচিত্র উপায়ে সক্রিয় হ'য়ে উঠতে পারে— সবসময়েই যা তা পরস্পর আদানপ্রদানের মাধ্যমে হবে তা হয়তো নয়। এমন কী এক দেশের মানুষজনের সঙ্গে অন্যদেশের মানুষজনের সম্পর্কও নানাভাবে ঘটতে পারে— ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, কখনও-কখনও এমন কী বাধ্য হয়েও। রাষ্ট্রসম্বন্ধের জটিলতা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নানা টানাপোড়েন তৈরি ক'রে দিতে পারে। এ-সব কথা এমনকী খুব কাছাকাছি দুই দেশ বা দুই ভাষার সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়— আর যদি সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে গিয়ে দুই দূর দেশ, অপরিচিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি , উন্নতি বা অধঃপতনের দু-রকম ইতিহাসের মধ্যে ঘুরতে থাকে, কিংবা যদি এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় গিয়ে পৌছবার মাধ্যম থাকে তৃতীয় একটি ভাষা, তখন নানারকম গন্ডগোলের সূত্রপাত হ'তে পারে— এবং সেই গোলযোগের ফলাফল সবসময় সুখকর নাও হ'তে পারে। যেমন, আগে যখন আমাদের সঙ্গে এস্পানিয়ার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তখন আমরা যেভাবে এস্পানিয়া বা এস্পানিওল ভাষা ও সাহিত্যের দিকে তাকিয়েছি, ইংরেজরাজত্বের সময় ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কিন্তু তেমন হয়নি। আমরা এমন কী দেশের নাম, দেশের ভাষা শুদ্ধু বিকৃত ক'রে জেনে বসে আছি — আমরা জানি স্পেন, আমরা জানি স্প্যানিশ ভাষা ও সংস্কৃতি— এস্পানিয়া বা এস্পানিওল নয়। অথচ এক সময় আরব ব্যবসাদারদের মারফৎ ভারতীয় চিন্তা ও চিত্ত গিয়ে পৌছেছিল এস্পানিয়ায়— আর গিয়েছিল বেদেরা— জিপসীরা— যারা বাংলা-বিহার সীমান্ত থেকে, রাজস্থান থেকে, সিল্ক রুট ধ'রে ইউরোপ গিয়ে পৌছেছিল। অনেক ঘুরে গিয়েছিল এস্পানিয়াতেও । কিন্তু জিপসীদের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস আজও নানা দেশে তাদের প্রান্তিক ক'রে রেখেছে , যদিও এস্পানিয়ার সাহিত্যে তাদেরও আবির্ভাব ঘটেছে নানাভাবে— রোমান্স থেকে , পিকারেস্ক উপন্যাস থেকে, এমন কী আদি উপন্যাসেও, তৎকালীন নাটকেও। এক সময় ইসলাম সেখানে প্রভাব ফেলেছিল— ইনকুইজিশনের জল্লাদরা পছন্দ করেনি, কিন্তু সাহিত্য তাতে লাভবান হয়েছিল। সান হুয়ান দেলা ক্রুস (সেন্ট জন অভ দ্য ক্রস) চার্চের উপাসক হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর কবিতায় সুফি চিন্তাধারা বা চিত্রকল্প ব্যবহার করার জন্য কারাগারের অন্ধকারে দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের শেষ থেকেই আমরা এস্পানিয়ার সাহিত্য জেনেছি — কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা বা সামগ্রিক কোনো দৃষ্টিভঙ্গি না -থাকলেও। কিছুটা খাপছাড়া ভাবেই, এখান থেকে এক খামচা ওখান থেকে এক খামচা, নিয়ে এসেছি। সেরভান্তেস-এর ডন কিহোতি-র অনুবাদ হয়েছে একাধিক। কোনোটাই একেবারে আক্ষরিক নয়— তবে ছোটোবড়ো নানা আকারে। অনুবাদ হয়েছে কালদেরোন বা লোপেদে ভেগার এক-আধটা নাটক— অনুবাদ হয়তো ঠিক নয়। আমরা তাকে বলতে পারি অ্যাডাপটেশন। সাজপোশাক খোলনলচে পালটে বাঙালি ক'রে ফেলার একটা চেষ্টা তাতে ছিল। তবে ডন কুন্তি বা জীবনই স্বপ্ন — অর্থাৎ এস্পানিয়ার স্বর্ণযুগের এক-আধটা নিদর্শন বাদ দিলে খুব-একটা বেশিকিছু আমরা জানতাম না।

জানার একটা উৎসাহ (ও উত্তেজনা) এলো বিশে শতাব্দীর তৃতীয় দশকে— তার কারণ প্রধানত রাজনৈতিক —ঘটনাস্থল এস্পানিয়া হলেও তার প্রভাব বা বিস্তার ছিল দূরপ্রসারী, আন্তর্জাতিক। সেই 'স্পেনের গৃহযুদ্ধ' আর তখন থেকেই আমরা এস্পানিওল সাহিত্যের অনেক কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এমন কী ওর্তেগা ই গাসেৎ-এর মতো দার্শনিক সম্বন্ধেও আমাদের কৌতূহল উদ্দীপিত হয়েছিল।

পুরানো আমলে আরবরা নিয়ে গিয়েছিল সংস্কৃত সাহিত্য— 'পঞ্চতন্ত্র' ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্য পেল রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন— হিমেনেথ দম্পতি মারফৎ। কিন্তু শুধু রবীন্দ্রনাথই নয়, একালের বাংলা সাহিত্যের আরো অনেক নিদর্শন এস্পানিওল ভাষায় আদৌ দুর্লভ নয়। কিন্তু সেও অনুবাদকদের ব্যক্তিগত রুচি, পছন্দ অথবা বাইরের কোনো চাপের ফল— অর্থাৎ অনেক সময়ই অসাহিত্যিক কারণে লেখা তর্জমা হয়েছে। তবে এস্পানিয়া ও বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে চমৎকার একটি বই আছে— শাশ্বত মৌচাক— লিখেছেন শিশিরকুমার দাস ও শ্যামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। আরো দুটি বই দেখা যায়—

সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত : শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত। নতুন সাহিত্যভবন এবং

স্পেনের গৃহযুদ্ধ : পঞ্চাশ বছর পরে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং।

'নারায়ণ'

মনোজকুমার অধিকারী

বিগত দুই শতক ধরে বাংলা সাহিত্যে অগণিত সাময়িক পত্রিকার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই সময়ে প্রকাশিত সাময়িক পত্রগুলি কোনোটি সাপ্তাহিক , কোনোটি বা পাক্ষিক , মাসিক বা ত্রৈমাসিক। এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সমসাময়িক এই সাময়িক পত্রিকাগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে। এই প্রসঙ্গে এক সমালোচকের মন্তব্য—' আধুনিক সাহিত্য মুখ্যত সাময়িকপত্র নির্ভর , এবং যেহেতু পাঠক সাধারণের মনোরঞ্জনের দিকেই সাময়িকপত্রের লক্ষ্য, তাই আধুনিক সাহিত্যের বিষয়বস্তু বিচিত্র। একালের জ্ঞানান্বেষা বিশ্বগ্রাসী, সাময়িকপত্রকেও সেজন্য বিবিধ ধরনের 'মনের খাদ্য' 'ঘরের দ্বারে' পরিবেশন করতে হয়।'

ঊনবিংশ শতকের সাময়িক পত্রিকাগুলি পর্যালোচনা করলে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি, তার ভারবহন ও সহনক্ষমতা, বিষয়ানুগ প্রকাশ সামর্থ্য এতে স্পষ্টরূপে লক্ষ করা যায়। নবীন-প্রবীণের ধর্মাদর্শের সংঘাত, সমাজ-সংস্কার , রাজনীতি-শিক্ষানীতি এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সময়োচিত বিকাশ ও বিবর্তনে সাময়িকপত্রের দান অপরিমেয় । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রথমদিকে এর লক্ষ্য সীমাবদ্ধ হলেও উত্তরকালে এর ব্যাপক প্রসার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আলোচ্য বিষয় হলো সাময়িকপত্র সাহিত্যের ইতিহাসে 'নারায়ণ' পত্রিকার গুরুত্ব। বলতে গেলে ১৭৮০ থেকে অদ্যাবধি কাল পর্যন্ত পত্রিকা প্রকাশনার ধারা অব্যাহত রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাময়িক পত্রিকাগুলির বহুমুখী প্রকাশ ছিল পূর্ণযৌবনা নদীর মতো। এই সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী সৃষ্ট সাময়িক পত্রগুলি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে তা সৃষ্টিশীল সাহিত্যে সুরুচি ও সুনীতির পরিচায়ক বলে মনে হয় । কিন্তু বিংশ শতকে সেই প্রবহমান গতি অনেকাংশে স্তব্ধ। যদিও এই শতকের গোড়ার দিকে এর ঢক্কা-নিনাদ কিছুটা শোনা যায়। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে সাময়িকপত্রের যখন ভাটার টান, তখন দুই পরস্পর বিরোধী পত্রিকার প্রকাশ ঘটে মাত্র সাত মাসের ব্যবধানে। একটি 'সবুজপত্র', অন্যটি 'নারায়ণ' । প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় এবং রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় 'সবুজপত্র' পত্রিকাটি ১৩২১ সালের ২৫ বৈশাখ (এপ্রিল ১৯১৪) প্রকাশিত হয়। আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত এবং বিপিনচন্দ্র পাল পরিসেবিত 'নারায়ণ' পত্রিকার প্রকাশ ঘটে ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯১৪ নভেম্বর) । রবীন্দ্রবিরোধী ও 'সবুজপত্র'-এর প্রতিপক্ষরূপে 'নারায়ণ'-এর বহিঃপ্রকাশ একথা আমাদের জানা। প্রগতিশীলতার সঙ্গে রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব পত্রিকাদুটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলে দুই পত্রিকাই একসময় সাহিত্যমহলে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করে।

'নারায়ণ' পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য : বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটাতে 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২১ সালে। তার সাতমাস পরে 'নারায়ণ' প্রকাশিত হয়। সাময়িকপত্রের চিরাচরিত নিয়মানুসারে সম্পাদক পত্রসূচনায় পত্রিকা প্রকাশনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে থাকেন। 'নারায়ণ'-এ সেরূপ কোনো সম্পাদকীয় মন্তব্য পাচ্ছিনা যাতে করে পত্রিকা প্রকাশনার উদ্দেশ্য আমরা জানতে পারি। তবে 'নারায়ণ' পত্রিকা প্রকাশনার সুদীর্ঘ চোদ্দবছর পর 'বাঙ্গলার কথা' নামক এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন— ' দাশ সাহেব নিজে সম্পাদক হইয়াও 'নারায়ণ'-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো কথা বলিলেন না, কাহাকেও দিয়া সে কথা লিখাইলেনও না। তিনি শিষ্য, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার গুরু। তিনি গুরুকে দিয়া এক লম্বা প্রবন্ধ লিখাইলেন— 'নূতনে-পুরাতনে' (১৩২১ অগ্রহায়ণ), সেই পুরানো কথা,

সেই হিন্দু রিভাইভাল সেই হিন্দু ধর্মের নবজীবন। 'বঙ্গদর্শন'-এর শেষকালে যাহার অঙ্কুর বাহির হইয়াছিল। 'প্রচার'-এ যাহার দুইটি পাতা বাহির হইয়াছিল, অক্ষয় সরকারের 'নবজীবন'-এ যাহার নবপল্লব প্রকাশ হইয়াছিল; সেই কথা। দাশ-পালের কাগজে ইহা খুব জোরের সহিত বলা হইয়াছে। আমাদের পুরানো যাহা ছিল ভালোই ছিল।'

বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে বাঙালি জাতির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সচেষ্ট ছিলেন। এ সম্পর্কে P.C. Roy Chowdhury তাঁর ' C.R. Das and His Times ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন—' We are looking forward for a new force to revive the Bengali literature and through the literature the Bengalis . That was the objective with which 'Narayana' was sponsored. '

সাময়িকপত্রের ইতিহাসে 'নারায়ণ' এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। ভক্ত পূজারী যেমন বিনম্র চিত্তে গদ গদ কণ্ঠে তাঁর নৈবেদ্য আরাধ্য দেবতাকে উৎসর্গ করার নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত প্রাণ; ভক্ত পূজারীর নিষ্ঠা নিয়ে দেশবন্ধুও দেশবাসীকে উৎসর্গ করার জন্য 'নারায়ণ'-এ নৈবেদ্য সাজিয়ে দিলেন। 'সবুজপত্র'-এর সবুজসেনার মতোই 'নারায়ণ'এর প্রবীণ লেখক গোষ্ঠীর সমবেত প্রচেষ্টায় দেশের কাব্য-নাটক, সঙ্গীত, চারুকলা, ভাষাসাহিত্য, ধর্ম, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, সমালোচনা সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য নবরূপে দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত হলো।

সাম্প্রতিককালে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ফলে সমাজের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। একদল ইংরেজি শিক্ষার সুফল সম্পর্কে আশান্বিত, অন্যদল ইংরেজি শিক্ষার কুফল নিয়ে বেশি সরব ও চিন্তান্বিত। এর পরিণাম সম্পর্কে চিন্তাশীল মনীষীরা উদ্বিগ্ন ছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডার আমরা হাতের কাছে পেয়েছি। 'নারায়ণ' সম্পাদক চিত্তরঞ্জনের ভাবনা ছিল অন্যরূপ। তিনি ভাবতেন পাশ্চাত্যশিক্ষা আমাদের আত্মবিস্মৃত করেছে, আমরা আমাদের পূর্ব পরিচয় ভুলেছি। বাঙালি তার স্বভাবসুলভ ধর্মকর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতিকে হারাতে বসেছে। তাই 'নারায়ণ' প্রকাশ করে চিত্তরঞ্জন বাঙালির লুপ্তপ্রায় চেতনাকে জাগ্রত করতে প্রয়াসী হন। 'নারায়ণ' প্রকাশের এটাও একটা কারণ বলে মনে হয়।

পত্রিকাটির প্রকাশনা : নারায়ণ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল সর্বমোট আটবছর । ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ১৩২৯ সালের কার্তিক পর্যন্ত। 'নারায়ণ'-এর সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য পত্রিকাটি কোনোকারণেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ থাকেনি।

রবীন্দ্রবিরোধী ও 'সবুজপত্র' বিরোধী পত্রিকা হিসেবে 'নারায়ণ'-এর ভূমিকা— 'সবুজপত্র' প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য — ' বাঙালির মনকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই 'সবুজপত্র' প্রকাশ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী।' তাছাড়া প্রমথ চৌধুরীর বাক্‌চাতুর্য, গাঢ়বন্ধ ও অ-গতানুগতিক শ্রেণীবদ্ধ রচনারাজি লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ স্থির করেছিলেন বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটাতে প্রমথ চৌধুরীর একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকা দরকার। তাই রবীন্দ্রনাথের স্নেহানুকুল্যে ও প্রমথ চোধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র'-এর বহিঃপ্রকাশ ।

ভাবতে অবাক লাগে 'সবুজপত্রের' ঠিক সাতমাস পর 'নারায়ণ' প্রকাশিত হয়েই 'সবুজপত্র'কে আক্রমণ করতে শুরু করে। এই আক্রমণের মূল লক্ষ্য হলো— (১) দুই পত্রিকার পারস্পরিক সাহিত্যাদর্শের দ্বন্দ্ব, (২) বাংলা ভাষার গাম্ভীর্য ও সাবলীলতা নষ্ট হবার উপক্রম দেখে 'নারায়ণ' প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। (৩) রবীন্দ্রনাথ বনাম বিপিনচন্দ্র পাল, (৪) রবীন্দ্রনাথ বনাম চিত্তরঞ্জন।

দুটি পত্রিকাই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একটি চলেছিল তেরো বছর, অন্যটি আটবছর । এই স্বল্পায়ু জীবনেই পত্রিকাদুটি স্ব-স্ব চিন্তাধারা, আদর্শ, রুচি অনুযায়ী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে দুই পত্রিকার আদর্শগত দ্বন্দ্বে কোন্ পক্ষের গলায় বিজয়ীর বরমাল্য দুলেছিল সেটা বড়ো কথা নয়, বরং পারস্পরিক আপাত বিরোধিতা, সরস সমালোচনা, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের ফলে ভাষা তীব্র-তীক্ষ্ণ ও শাণিত হয়েছে। পত্র সাহিত্যের ইতিহাসে নব অরুণোদয় সূচিত হয়েছে।

প্রমথনাথ বিশীর 'পদ্মা'

মাধবী বিশ্বাস

বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী লেখক প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫) কথাশিল্পী হিসাবে প্রথম সাহিত্য পাঠকদের চমকে দিয়েছিলেন তাঁর 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে প্রায় একই সঙ্গে কবিতা ও উপন্যাস দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত হলেও পরবর্তীকালে বেশ কিছুদিন তিনি জোর দিয়েছিলেন কবিতা ও নাটক রচনার উপর।

প্রমথনাথ বিশীর প্রথম কবিতার বই 'দেওয়ালী' (১৩৩০), প্রথম নাটক 'ঋণং কৃত্বা' (১৩৪২), প্রথম উপন্যাস 'দেশের শত্রু' (১৩৩১)।

'দেশের শত্রু' উপন্যাসটির পরবর্তীকালে আর সন্ধান পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে লেখক বলেছেন — ' পদ্মা আমার প্রথম উপন্যাস লিখবার চেষ্টা । তার আগে একখানা উপন্যাস লিখেছিলাম সত্য, পাঠকে সে কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে, আমি ভুলতে পারলে বাঁচি । পদ্মা থেকেই আমার উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টার সূত্রপাত বলে ধরতে হবে।'

আমাদের আলোচ্য প্রমথনাথ বিশীর এই প্রথম বিস্মৃতপ্রায় উপন্যাস 'পদ্মা' (১৩৪২) । আশ্চর্যের বিষয় প্রমথনাথ যখন উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা করেছেন তখন বাংলা কথাসাহিত্যে অনেক নতুন বিষয় প্রবেশ করেছে । অথচ তিনি সে সবের মধ্যে না গিয়ে নদী , নদীর চর, নিসর্গ প্রকৃতি এসবকে নিয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে তুললেন 'পদ্মা' উপন্যাসটি। পরবর্তী সময়ে নদীভিত্তিক বেশ কিছু উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। 'পদ্মা' উপন্যাসটি প্রমথনাথ বিশীর অসামান্য সৃষ্টি না হলেও অন্যান্য বিশ্রুত সব নদীভিত্তিক উপন্যাসগুলির অগ্রদূত, একথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

'পদ্মা' উপন্যাসটির বিষয় বিনয় ও কঙ্কণের প্রেমকাহিনী । কলেজে পড়ার উপলক্ষে বিনয় কলকাতা এলে কঙ্কণের সাথে তার সম্পর্ক শিথিল হতে হতে শেষে বিস্মৃতির পর্যায়ে আসে তার অধ্যাপক কন্যা পারুলের সাথে সম্পর্কের প্রগাঢ়তার সূত্রে। কিন্তু পারুলের সাথে তার ভুল বোঝাবুঝিতে বিনয় আবার কঙ্কণের কাছে ফিরে যায় কিন্তু বিভিন্ন অবস্থার বিপর্যয়ে দেহে ও মনে বিপর্যস্ত কঙ্কণ বিনয়কে প্রত্যাখ্যান করে। পরে পারুলের সঙ্গে বিনয়ের বিবাহের দিনে কঙ্কণের সাথে বিনয়ের সাক্ষাত হলো। পূর্ব প্রণয়ের সূত্রে কুমারী কঙ্কণের যে পুত্র জন্মেছিল তাকে বিনয়ের হাতে সমর্পণ করে কঙ্কণ পদ্মাগর্ভে তলিয়ে গেল।

সমগ্র উপন্যাসটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত— (১) চরচিলমারী— ১১ টি পরিচ্ছেদ,

(২) কলিকাতা — ১০ টি পরিচ্ছেদ, (৩) চরচিলমারী পুনর্বার — ১২ টি পরিচ্ছেদ, (৪) হিমালয় — ৬ টি পরিচ্ছেদ, (৫) পদ্মাগর্ভে— ৭ টি পরিচ্ছেদ

নিসর্গ প্রকৃতি অসাধারণ রূপ নিয়ে প্রথম আবির্ভূত হলো তখন, যখন তাকে তিনি নরনারীর প্রেমনাট্যের প্রেক্ষাপট হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করলেন। পদ্মায় বিনয় আর কঙ্কণের মিলন দৃশ্যটি লেখক বর্ণনা করেছেন এভাবে— 'যুগল হৃৎপিন্ডের খঞ্জনীর তালে তালে যুগল দেহের শিরা উপশিরায় রক্তধারার বিচিত্র জাল ধাবমান হইল। ··· বর্ষার প্রথম বারি সমাগমে নদীগর্ভে শরবন যেমন অকস্মাৎ থর থর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে, বিনয়ের ওষ্ঠস্পর্শে কঙ্কণের সর্বদেহ তেমনি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।··· সেই আবাত ক্ষুব্ধ স্বচ্ছ সরোবরে পূর্ণিমার চাঁদ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল, দুইটি ছায়া আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া এক হইয়া গিয়াছে, একের দেহসীমা হইতে অপরের দেহসীমা সেই পূর্ণিমার আলোকেও পৃথক করিয়া লক্ষ করা যায় না।'— প্রগাঢ় সৌন্দর্যারতি ও সুতীব্র ইন্দ্রিয়োপভোগ দুইয়ে মিলে একটা অপূর্ব আবমত্ততার সৃষ্টি করেছে। প্রেম ও প্যাশনের এই মেঘ-বিদ্যুৎ সহযোগে প্রমথনাথ বিশী অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতি মানব-মানবীর বিরহমিলনের উষ্ণশ্বাসে উত্তপ্ত— তাদের কামনা বেদনার বহু বিচিত্র বর্ণানুসন্ধানে প্রদীপ্ত।

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসে কল্পনাসমৃদ্ধ প্রাকৃতিক বর্ণনা, কবিত্বপূর্ণ ভাষা ও সুনিবিড় সৌন্দর্যবোধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পদ্মা'র সাথে , প্রথম পর্বের কবিতাগুলির ঘনিষ্ঠ মিল আছে। পদ্মা মূলত তাঁর কবিসত্তার রচনা। রাজশাহী শহরের প্রান্ত কাহিনী পদ্মার রহস্যময় বর্ণনাই প্রধান আকর্ষণ । পদ্মায় প্রকৃতিই প্রধান স্থান অধিকার করেছে। বিশাল প্রকৃতির ভীমকান্ত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে লেখকের কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ, কিন্তু চরিত্রগুলি সেই তুলনায় দুর্বল।

প্রমথনাথ বিশীর জগৎ মিশ্র জগৎ। এখানে আশা-নৈরাশ্য, সুন্দর-কুৎসিত, সুখ-দুঃখ , হাসিকান্না সব মিশে একাকার হয়ে গেছে। 'পদ্মা' গীতিকাব্যধর্মী উপন্যাস । 'প্রাচীন আসামী হইতে' সনেট বিশ্লেষণ করলেও তারই রূপচিত্র ও কাব্যরূপ মিলবে এই উপন্যাসে। উপন্যাসটির মূল সূত্র নদী— পদ্মা, আর একটি সূত্র অঞ্চল— রাজশাহী। নদী ও অঞ্চল এখানে শুধু পশ্চাদপট নয়, চরিত্রও বটে। উপন্যাসটিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাথে মানুষের অন্তর্জীবনের বিপ্লব জড়িত। উপন্যাসটি বিয়োগান্ত— পদ্মার জলে গেছে কঙ্কণ । প্রবল নৈসর্গিক পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের একাধিক অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসে প্রযুক্ত হয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতলীলা এর মূল বস্তু। প্রমথনাথ বিশী যে সাহিত্যসমালোচক তা এই উপন্যাসে স্পষ্টই বোঝা যায়। শিল্পী ও সমালোচক পাশাপাশি কাজ করে চলেছেন। কোনোখানে শিল্পী মুখর, কোনোখানে সমালোচক। পদ্মা ছুটে চলেছে তারই মাঝে নিজভাবে নিজ গতিতে। মানুষের জীবনে আকর্ষণ, বিকর্ষণ, উদ্‌ভ্রান্তি ঘটিয়েছে কিন্তু বাধার মধ্যে প্রবাহিত হয় নি। নিসর্গের সেই অনুপ্রবেশ ঘটেছে অন্যত্র 'জোড়াদীঘির উদয়াস্ত'তে। প্রকৃতি-গ্রাম-কল্পনা অনুভূতির আশ্রয় পদ্মা নদী আর প্রান্তরের প্রতি শিল্পীর প্রবল আকর্ষণ অনুধাবন করা যায় এই উপন্যাসে।

প্রমথনাথ বিশী জন্মসূত্রে পদ্মার স্নেহসিক্ত উত্তরবঙ্গের সন্তান। পদ্মার রূপকে তিনি গভীরভাবেই দেখেছেন। সেইসঙ্গে লক্ষ করেছেন তার আশেপাশের মানুষজনকে , অনুভব করেছেন তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রেম-প্রতিহিংসা। অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও জীবনাকর্ষের শিল্পী প্রমথনাথ বিশীর হাতে 'পদ্মা' প্রথম উপন্যাস হিসাবে সার্থক রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

শৈলীবিজ্ঞানের আলোকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

মধুমিতা চক্রবর্তী

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গোষ্ঠীর লেখকদের অন্যতম মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের অবদানকে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার কেজো প্রয়োজনের চেয়ে বড়ো করে দেখতে পারি, যখন দেখি তাতেই ঘটেছে বাংলা গদ্যের মন-মননের জাগরণ। এরই ফলশ্রুতিতে বাঙালি প্রথম গদ্যমনস্ক হয়ে উঠেছিল।

আমরা জানি যে, মৃত্যুঞ্জয়ই ছিলেন প্রথম সচেতন ভাষাশিল্পী এবং পাঁচখানি গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর রচনা বলয়ের মধ্যে অঙ্গীকৃত হয়েছে বিচিত্র বিষয়। যুগোচিত সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁর রচনা বাংলা গদ্যের বনিয়াদকে সুদৃঢ় করেছিল এবং কোথাও কোথাও তা শিল্পসিদ্ধিকে স্পর্শ করেছিল। এহেন লেখকের রচনা সম্ভারকে শুধু বিচার নয়, শৈলী-বিজ্ঞানসম্মত বিচার বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজন বলেই মনে করি। প্রতীচ্যে এই ধরনের বিচার বিশ্লেষণ যখন প্রথম শুরু হয় তখন শৈলীবিজ্ঞানকে 'the science of literary style' অর্থেই ধরা হয়েছিল। পরবর্তীকালের সমালোচকরা স্টাইলকে বলেছেন ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকরা রীতির কথা বললেও তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক আছে এমন কথা বলেন নি।

আধুনিক শৈলীবিজ্ঞান রচনায় উপস্থাপনারীতি, বাক্যসজ্জা, শব্দসজ্জা, বাক্‌প্রতিমা ইত্যাদির সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। অনেক সময় এই সমস্ত বিষয় পরিসংখ্যানের মাধ্যমেও পরিস্ফুট করা হয়। ফলে সমালোচনা হয়ে ওঠে তথ্য নির্ভর, নিরপেক্ষ ও তন্ময়। তাই সংখ্যাতাত্ত্বিক অন্বেষার ভিত্তিতে রচনা বা সাহিত্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়নে শৈলীবিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মূল্য অপরিসীম।

এবার শৈলীবিজ্ঞানের ভিত্তিতে মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরচনার বিষয়বস্তু, বাক্যসজ্জা, শব্দসজ্জা, উপস্থাপনারীতি ইত্যাদির সংক্ষেপে বিচার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয়ের বিষয়বস্তুর উৎস মূলত সংস্কৃত। অনুবাদ তো বটেই যেখানে মৌলিক সৃষ্টি সেখানেও সংস্কৃতের প্রভাব অনস্বীকার্য।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পাঁচটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু দুটি উৎস থেকে গৃহীত — ১. সংস্কৃত, ২. পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক এবং জনশ্রুতিমূলক কাহিনী।

'বত্রিশসিংহাসন' ও 'হিতোপদেশ' সংস্কৃত থেকে অনূদিত। 'বেদান্তচন্দ্রিকায়' বহু সংস্কৃত সূত্রভাষ্যের অনুবাদ করা হয়েছে। 'রাজাবলি' মৌলিক কিনা এ নিয়ে মতভেদ বর্তমান। বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র কোনো কোনো আখ্যান উপাখ্যান সংস্কৃত থেকে নেওয়া। এর ভাষারীতি বিষয় অনুযায়ী পরিবর্তিত। এই বইটির পরিকল্পনা মৃত্যুঞ্জয়ের শৈল্পিক মনের পরিচয়বাহী।

বিষয়বস্তু সংগ্রহে মনে হয় তিনটি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল —১. নীতিশিক্ষা দান, ২. ভারতের প্রাচীন ও প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বের ইতিহাসের পরিচিতি দান, ৩. ভারতীয় ক্লাসিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিদেশী ছাত্রদের পরিচায়িত করা।

শৈলীবিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় বাক্যের সজ্জাবৈচিত্র্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় বাক্যসজ্জার প্রকৃতি পরীক্ষা করে মূলত ছয় রকমের সজ্জার পরিচয় পেয়েছেন। বাংলা বাক্যে 'sov' সজ্জারই প্রাধান্য তবে অন্য দু-একটি সজ্জার ব্যবহারও রীতিবিরুদ্ধ নয়, মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় 'sov' সজ্জার ব্যবহার ও বৈচিত্র্য দুই-ই পাওয়া যায়। তাঁর 'sov' সজ্জায় কোথাও

'S' (কর্তা) অনুক্ত । আবার কোথাও S.O. দুটোই অনুক্ত— উদাহরণ: বুঝিলাম (তুমি পরম ধার্ম্মিক) (বাত্রিশসিংহাসন, ১ম সংস্করণ, পৃ - ১৯৭)

মৃত্যুঞ্জয়ের সমসাময়িক রামমোহন এবং পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এরূপ সজ্জা প্রয়োগ রয়েছে । তাছাড়া 'osr' ও বিরল সজ্জারীতি 'rso' -র ব্যবহার দেখা যায়।

বাংলা গদ্যের পথিকৃৎদের সামনে কোনো আদর্শ না থাকায় তাঁদের হাত বাড়াতে হয়েছে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার বাক্য গঠনের দিকে । গদ্যের প্রকাশ কলাকে স্বচ্ছতর করতে এবং তার মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করতে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ইংরেজি খন্ডবাক্য সজ্জার আদর্শ প্রয়োগ করেছিলেন ।

দুটি ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে মুখের ভাষার প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয় । ১. অ-স্বরান্ত ক্রিয়াপদের সঙ্গে ' ও' -এর সংযুক্তি (করো, থাকো, শুনিয়াছো ইত্যাদি) ২. অসমাপিকা ক্রিয়াপদকে সমাপিকা ক্রিয়াপদের পরে বসানো :

'তোর যাহা ইচ্ছে তাহাই কর গিয়া' (রাজাবলি)

অসমাপিকা ক্রিয়াপদের বহুল ব্যবহার কোনো কোনো স্থানে তাঁর বর্ণনাকে শিথিল, ক্লান্তিকর করে তুলেছে । উদাহরণ স্বরূপ রাজা বিক্রমাদিত্যের দৈনন্দিন কর্মসূচীর বিবৃতিটির কথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার বহুল ব্যবহার থাকলেও সেই ব্যবহার অর্থবহ ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে ।

মৃত্যুঞ্জয়ের বিশেষণ প্রয়োগে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল, তৎসম শব্দের বিশেষণ প্রয়োগ বাক্যকে ওজোগুণসম্পন্ন করতে সহায়তা করেছে: ' সকল বৃক্ষ সকল ঋতুতেই অঙ্কুরিত, মঞ্জরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত, মুকুলিত, ফলিত হইত ।' (প্রবোধচন্দ্রিকা, পৃ - ৩০)

সার্থক গদ্যশিল্পীর মতোই ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার তিনি করেছেন । ছেদ চিহ্নের ব্যবহার গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগরেরই অক্ষয় কীর্তি কিন্তু ' রাজাবলি' ও ' প্রবোধচন্দ্রিকা'র কোথাও কোথাও ছেদ চিহ্নের সুষ্ঠু ব্যবহার লক্ষ করি ।

বাংলা গদ্যের জন্মলগ্নে মৃত্যুঞ্জয় ব্যক্তি ও বৃত্তিভেদে ভাষারীতির বিভিন্নতা সম্পর্কে (প্রবোধচন্দ্রিকা) মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন । কয়েকটি সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা গদ্যের শিল্পরূপ নির্মাণে সহায়তা করেছেন এবং নিজস্ব একটি স্টাইল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর সাধু গদ্যরীতির গভীরে আমরা পরবর্তী যুগের সার্থক গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগর এবং চলিত গদ্যের মধ্য দিয়ে 'হুতোমপ্যাঁচার নকশা'র লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বাভাস পাই ।

পঞ্চকোট রাজসভা ও চতুর্দশপদীর কবি

মাধবী দে

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পর রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বাংলা সাহিত্য চলে এলো জনগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ।এমন একটা সিদ্ধান্তে আমরা এসেছি বিষ্ণুপুর ,বর্ধমান ও কৃষ্ণনগর রাজসভার কথা মনে রেখে । কিন্তু এই সময়ের অনেক পরে, প্রায় একশ বছর পরে আমরা একটি রাজসভাকে লক্ষ করতে পারি, তা হলো মানভূম জেলার কাশীপুর রাজ্যের রাজধানী পঞ্চকোটের মহারাজ নীলমণি সিং

দেও-এর রাজসভা । পঞ্চকোটকে নীলমণি সিং পরিণত করেছিলেন দ্বিতীয় নবদ্বীপে । এই রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন বিষ্ণুপুরের খ্যাতনামা শিল্পীগণ । সঙ্গীতে অধ্যাপক জগচন্দ্র গোস্বামী, মৃদঙ্গে হারাধন গোস্বামী, বাঁশিতে পূরণ সিংহ চৌতাল এবং আরো অনেকে । নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করেছিলেন পঞ্চকোট রাজসভা, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, নৈয়ায়িক পার্বতীচরণ বাচস্পতি কেদার ন্যায়রত্ন । সংস্কৃত চর্চার জন্য কাশীপুরে ছিল অসংখ্য চতুস্পাঠী । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ পরীক্ষায় সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেলে পঞ্চকোট সংস্কৃত পুরস্কার দেওয়া হতো ।

এমন বিদগ্ধ রাজার আমন্ত্রণে কাশীপুরে এলেন মধুসূদন যদিও রাজকবি হয়ে নয়, প্রথম এসেছিলেন ১৮৭২ সালে পুরুলিয়ায় একটি মামলার সূত্রে, মেঘনাদ বধের মহাকবি নয় এলেন ব্যারিস্টার মধুসূদন দত্ত । তখন কবির জীবন অস্তগামী । শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) তিলোত্তমা সম্ভব (১৮৬০) থেকে কবির যে যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল বলা যায় সেই আখ্যান কাব্য ,নাটক ,মহাকাব্য , গীতিকাব্য, প্রহসনের চলার পথের শেষে অনেক অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার কথা, অনেক বিফলতার বেদনারাশি সব ছাপিয়ে তখন চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে (১৮৬৬) বড়ো হয়ে উঠেছিল ক্লান্ত পথিক কবির প্রাণের আরাম মনের শান্তি ।

১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে জুন মাসে ইউরোপ যাত্রা করেন বঙ্গভূমির প্রতি আবেদন রেখে । 'রেখো মা দাসেরে মনে' । বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখছেন, আমাদের ভাষায় আমি চতুর্দশপদী প্রচলন করতে চাই । ভার্সাইতে বসে যে সনেটগুলি লিখলেন প্রবাসী স্মৃতি কাতর কবিহৃদয় তারই মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে । নিজেকে মধুসূদন খুঁজে পেয়েছেন চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে । গৌরদাস বসাককে লিখছেন, '. . . আমি সম্প্রতি ইতালির কবি পেত্রার্ক পড়ছি । আর অনুরূপ সনেট লেখার জন্য হিজিবিজি কাটছি।'' . . . আমি জোর করে বলতে পারি এই সনেট এই চতুর্দশপদী আমাদের ভাষায় চমৎকার লেখা যাবে ।'

আগেই বলেছি ১৮৭২ সাল ফেব্রুয়ারি মাস । মধুসূদন এলেন মানভূম জেলার সদর দপ্তর পুরুলিয়ায় । বরাকর থেকে ৪২ মাইল পাল্কী চেপে আসবার পথে দেখলেন পরেশনাথ পাহাড় । পরেশনাথ গিরি নামক সনেটে কবি ভালোলাগা প্রকাশ করলেন । ইউরোপ ঘুরে আসা কবি সম্ভবত পুরুলিয়ার রুক্ষ মাটি, সহজ সরল মানুষ, উজ্জ্বল প্রকৃতি, ফেব্রুয়ারি মাসের ঘন শীতের আবরণ ভেদ করে মুখ বাড়ানো শাল পলাশ মহুয়া কাঞ্চনের চকিত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন । তাঁর মতো মহাকবিকে কাছে পেয়ে পুরুলিয়ার মানুষ সংবর্ধনা তো দিলেনই উপরন্তু খ্রীস্টান সমাজও তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন, কবি পুরুলিয়াকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন — পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে/বীজকুল,

শস্য তথা কখনো কি ফলে ?/কিন্তু কত মনানন্দ
তুমি মোরে দিলে/হে পুরুল্যে ।
পুরুলিয়াবাসীর জন্য তার উদার প্রার্থনা—
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি/ভাসুক
সভ্যতাস্রোতে নিত্য তব তরী ।

কবি এখানে এক খ্রীস্টান ভদ্রলোকের পুত্রকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে ধর্ম পিতা হলেন । একটি কবিতাও লিখলেন স্নেহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে । জ্যোতিরিঙ্গণ মাসিক পত্রিকায় কবিতা দুটি প্রকশিত হয়েছিল ।

পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ দেও কবির আগমন সংবাদ জানতে পেরে তাঁকে নিতে চাইলেন রাজধানী কাশীপুরে । কিন্তু কবি তখন কলকাতা চলে গেছেন । লোক পাঠালেন কলকাতায়, মধুসূদন এলেন ঋণ ভারে জর্জরিত ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যারিস্টার কবি এলেন পঞ্চকোট রাজের ম্যানেজার হয়ে

কাশীপুরে । এই কাজে এসে হয়তো তাঁর রাজকবি হওয়ার সাধ মিটেছিল । আমরা জানি মধুসূদনের মোহ ছিল রাজকবিদের প্রতি । টেনিসন, ভিক্টর হুগো সম্পর্কে সনেট লিখেছেন । দান্তের জন্মোৎসবে কবিতা লিখে পাঠিয়েছেন ইতালির সম্রাটকে, যাই হোক মাইকেল যে কাশীপুর রাজবাড়িতে এসেছিলেন তা শুধুই অর্থের প্রয়োজনে নয়, নয়মাস মধুসূদন কাশীপুর রাজবাড়িতে বাস করেছেন সেই সময়ের কাশীপুর চিন্তা ভাবনায় সাংস্কৃতিক চেতনায় অনেকটা এগিয়েছিল । আর এই অগ্রগতির কৃতিত্ব মহারাজ নীলমণি সিংহ দেও-এর ।

এই সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনস্ক মহারাজ যে কোনোভাবেই হোক মধুসূদনকে নিজ রাজ্যে আনবার চেষ্টা করেছেন । মধুসূদনও তখন ক্লান্ত, ভগ্নস্বাস্থ্য, আর্থিক কারণে বিপর্যস্ত । ইতিপূর্বে পুরুলিয়ার প্রকৃতির অনাবিল সান্নিধ্য তাঁর ভালো লেগেছিল, কাজেই পঞ্চকোট রাজের আহ্বান পেয়ে ম্যানেজার হয়ে তিনি কাশীপুর এলেন, নীলমণি সিং এর মামলা চলছিল পত্তনীদার শারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর সঙ্গে । জেলা আদালত থেকে মামলা এলো হাইকোর্টে । মধুসূদনের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও নীলমণি সিং দেও হেরে গেলেন । কবি সেপ্টেম্বর ১৮৭২ কলকাতায় ফিরে আসেন ।

পাহাড় ঘেরা কাশীপুরের জল হাওয়ায় মধুসূদনের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছিল । একদা ঐশ্বর্যশালী পঞ্চকোটের ভগ্নদশা দেখে সংস্কারের ইচ্ছেও তাঁর হয়েছিল। পঞ্চকোট গিরি , পঞ্চকোটস্য রাজশ্রী- এ দুটি কবিতায় পঞ্চকোটকে তিনি 'মণিহারা ফণি' বলে উল্লেখ করেছেন । এবং স্বপ্নে দেখেছেন যেন তার অতীত সৌন্দর্য । কিন্তু তাঁর আকস্মিক ভাবে চলে যাওয়ার বেদনা অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে পঞ্চকোট গিরি বিদায় সঙ্গীত কবিতায় —

> 'ভেবেছিনু গিরিধর । রমার প্রসাদে, তাঁর দয়াবলে
> ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি জনশূন্য পরিখায়,
> ধনুর্ব্বান ধরি দ্বারিগণ আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে ।'

কিন্তু হতাশাপীড়িত হৃদয় নিয়েই তাঁকে ফিরতে হলো । পঞ্চকোট ত্যাগের দুঃখধ্বনি এই কবিতায় শোনা গেছে মনে হয় —

> '· · · দেখি ভ্রান্তি ভাব ধরি ।
> ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী
> অদয়ে, অতল দুঃখ সাগরের জলে
> ডুবিনু, কি যশঃ তব হবে বঙ্গস্থলে ?'

পুরুলিয়া ছেড়ে যাওয়ার নয়মাস পরে ২৯ জুন ১৮৭৩ কবি প্রয়াত হন ।

দ্রষ্টব্য : মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য- সুরেশ চন্দ্র মৈত্র । মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রাবলী- ড. সুশীল রায় । মধুসূদন ও মহারাজা নীলমণি — এক প্রসন্ন প্রত্যূষ কথা - দিলীপ কুমার গোস্বামী ।

বাংলা সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র
প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের কাহিনীনির্মাণ
মিহির ভট্টাচার্য

বাংলায় যখন সিনেমার আরম্ভ— নির্বাক যুগে অর্থাৎ ১৯৩০ এর আগে— তখন কথাসাহিত্য এবং নাটকে শক্তিশালী ও মনোরঞ্জক অনেক রকম উপাদান তৈরি হয়ে গেছে। উপন্যাস ও গল্পের বাস্তববাদী আখ্যান জনমানসে স্থান করে নিয়েছে, শহরে নাটকের চলছে সুবর্ণযুগ। কাজেই সিনেমার শুরুতেই আমরা দেখতে পই নানাবিধ 'সাহিত্যিক' এবং 'নাটকীয়' প্রথাপ্রকরণের সমাহার। গল্প বলার ধরন যতটা না এসেছে সিনেমার বিদেশী পীঠস্থান থেকে, ততটাই দেশজ এবং স্থান-কাল-নির্ভর সূত্র অনুসরণ করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল বাংলার চলচ্চিত্রে।

সবাক যুগেও সাহিত্য এবং নাটকের সঙ্গে সিনেমার যোগসূত্র অটুট রইল। জনপ্রিয়তার ভিত্তি ছাড়া সিনেমার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে, কাজেই মনোরঞ্জনের চাহিদায় মধ্যশ্রেণীর গঠিত রুচির উপরে নির্ভর করে অগ্রসর হলো চলচ্চিত্রের কাহিনীনির্মাণ। সিনেমার নিজস্ব ভাষা, আখ্যানের বিকল্প বিন্যাস অনেকখানি অবহেলিত হয়ে রইল। বাস্তবতার দাবি খুব জোরালো হয়ে উঠল না। ১৯৫৫ সালের 'পথের পাঁচালী'-এ জন্যই বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমায় নতুন যুগের সূচনা করল বলা চলে।

প্রসঙ্গ : চোখের বালি
যূথিকা বসু

১৯০১-এর এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথ 'নষ্টনীড়'কে চূড়ান্ত রূপ দিয়ে ভারতীতে প্রকাশের জন্য পাঠাচ্ছেন এবং একই সময়ে নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় 'চোখের বালি' নামে বিনোদিনীর প্রকাশ আরম্ভ হচ্ছে । ১৯০১-এর মার্চ মাসে লিখছেন '··· এ গল্পে ঘটনাবাহুল্য একেবারেই নেই, সেইজন্যে এটা ক্রমশ প্রকাশের যোগ্য নয় ।'

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ' চোখের বালি'র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থপ্রকাশের চল্লিশ বছর পরে উপন্যাসটি প্রসঙ্গে যে দাবি উত্থাপন করেছেন, তা' হলো 'আকস্মিকতা' অর্থাৎ পূর্বপ্রস্তুতিবিহীন এক অভিনবত্ব আনয়নের দাবি, 'আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে 'চোখের বালি' উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ।'

এই অভিনবত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে 'সূচনা'র শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন — 'সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরায় বিবরণ দেওয়া নয় বিশ্লেষণ করে আঁতের কথা বের করে দেখানো । সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে ।'

'চোখের বালি' তাই নিছক 'বিষবৃক্ষ'-এর অনুবর্তন নয় । অথচ, 'চোখের বালি' লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বিষবৃক্ষ'-এর কথা মনে রেখেছেন । 'চোখের বালি' প্রসঙ্গে অনতিলক্ষ্য বিষয়ের অবতারণা ··· ।

রবীন্দ্রনাট্যের প্রযোজনা : পরিচালক রবীন্দ্রনাথ

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের নাট্য-প্রযোজকের জীবন প্রায় ৫৮ বছরের। এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি প্রায় ২৮ টি নাটক বা নাটিকার অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। এখানে তাঁর ভূমিকা ছিল অভিনেতা-পরিচালক আর প্রযোজকের।

প্রথম জীবনে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র (১৮৮১) অভিনয়ের সময় থেকে শুরু করে 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজে'র বিসর্জন (১৯০০) অভিনয়ের সময় পর্যন্ত অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে আমরা সুস্পষ্টরূপেই পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ করি। অর্থাৎ এই সব অভিনয়-প্রযোজনায় ছিল বাস্তবানুকরণের চূড়ান্ত বিকাশ।

পরবর্তীকালে তাঁর নাটকের গঠন-প্রকরণের সঙ্গে নাট্য-প্রযোজনা-সংক্রান্ত ভাবনারও পরিবর্তন ঘটেছিল। এইরূপ মানসিক পটভূমিতেই প্রকাশিত 'রঙ্গমঞ্চ' নামক প্রবন্ধ। (বঙ্গদর্শন, নবপর্যায় ১৩০৯) । যেখানে রবীন্দ্রনাথ ভরতের নাট্যশাস্ত্র বর্জিত ও সমর্থিত প্রযোজনাকেই সমর্থন করেছেন।

পরবর্তী শান্তিনিকেতন পর্বে প্রযোজিত প্রথম নাটক 'শারদোৎসব' (১৯০৮) থেকে রবীন্দ্রনাথের নাট্য- প্রযোজনায় এসেছে সরল অথচ ইঙ্গিতময় সাংকেতিকতা। এই পর্বের বিশিষ্ট নাটক 'রাজা' , 'প্রায়শ্চিত্ত' , 'মুকুট', 'অচলায়তন' ও 'ফাল্গুনী'।

যদিও সময় সময় সাধারণ মঞ্চে অভিনয় দেখা দর্শকের কথা রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বাইরে ছিল না। তাই দেখি কলকাতায় অভিনীত 'ফাল্গুনী' (১৯১৬) অথবা 'ডাকঘর' (১৯১৭) অভিনয় কালে জনমনোরঞ্জনের কথা মনে করে তিনি মঞ্চকে নিতান্ত নিরাভরণ রাখেন নি।

রবীন্দ্র-নাট্য প্রযোজনার ইতিহাসে দেখা যায় 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) এবং 'বিসর্জন' (১৮৯০) শেকস্পীরীয় রীতির নাটক দুটির প্রথম দিকের প্রযোজনায় পাশ্চাত্য রীতি অনুসৃত। পরবর্তীকালে 'বিসর্জন' (১৯২৩) এবং 'রাজা ও রানী'র রূপান্তর 'তপতী'তে (১৯২৯) রবীন্দ্রনাথের নবনাট্যাদর্শের প্রকাশ ঘটেছে। প্রতীকী ব্যঞ্জনা, দৃশ্যপট বর্জন , অবিরাম অভিনয় , যাত্রার বিবেক বা নিয়তির অনুকরণে চরিত্র সৃষ্টি নব-নাট্যাদর্শ প্রকাশের স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

রবীন্দ্র-নাট্য প্রযোজনায় নৃত্যই সর্বশেষ স্তর। অভিনয়ে নানা অভিজ্ঞতার পর রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকেই নাট্যভাব প্রকাশের উপযুক্ত বাহন বলে মনে করেছেন। অবশ্যই এই সর্বশেষ বিবর্তনের কতগুলি বাস্তব কারণও ছিল। বিশ্বভারতীর প্রযোজিত নাট্যদল নিয়ে তাঁকে নানাস্থানে ভারতের অথবা দেশের বাইরেও ঘুরতে হয়েছে। সেখানে অ-বাঙালি দর্শক-শ্রোতার বাধা হয়ে দাঁড়াত কেবল নাট্য-ভাষা। কিন্তু নৃত্যের ভাষা হলো সর্বজনীন। তাই আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না কেন রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নাটক নিয়ে পৌঁছতে হয়েছে নৃত্যনাট্য পর্যন্ত।

এই পর্বের নাটক (নৃত্য-নাট্য) 'নটীর পূজা' (১৯২৬) 'বসন্ত' (১৯২৩), 'শেষবর্ধন' (১৯২৫), 'সুন্দর'(১৯২৫), 'নটরাজ'(ঋতুরঙ্গ) (১৯২৭), 'গীতোৎসব' (১৯৩১) ,'শাপমোচন' (১৯৩১), 'চন্ডালিকা', 'তাসের দেশ' (১৯৩৩), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬) এবং 'শ্যামা' (১৯৩৮)।

নির্দেশক গ্রন্থ :

'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাথ' — শঙ্খ ঘোষ । 'নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ' — পবিত্র সরকার। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি '— বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। 'রবিজীবনী '— প্রশান্তকুমার পাল। ' বিশ্বপথিক ' — কালিদাস নাগ । 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য'— শান্তিদেব ঘোষ। 'পুণ্যস্মৃতি'— সীতা দেবী। 'যাত্রী'—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'রবিতীর্থে'— অসিতকুমার হালদার। 'ঘরোয়া'— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ' রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন'— প্রমথনাথ বিশী। ' সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ'— হেমেন্দ্রকুমার রায়। ' বাঙ্গালির নাট্যচর্চা'— অহীন্দ্র চৌধুরী। ' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশির কুমার'— অমল মিত্র। 'রবীন্দ্রসংগীত'— শান্তিদেব ঘোষ। 'রবীন্দ্রকথা'— খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'আমাদের শান্তিনিকেতন'— সুধীররঞ্জন দাশ। 'পিতৃস্মৃতি'— রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'আনন্দ সর্বকাজে'— অমিতা সেন। 'লিপিবিবেক'— বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। 'রাতের তারা দিনের রবি'— শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। 'ঠাকুর বাড়ির অভিনয়'— অজিতকুমার ঘোষ।

বাংলা নাটক ১৮৫২-৭৬

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক. ১৭৯৫-তে লেবেডেফের থিয়েটারে 'কাল্পনিক সংবদল' নামে বাংলা-হিন্দী-ইংরেজি মিশ্রিত নাটকটিই প্রথম বাংলা প্রযোজনা। তিনি নাম ও চরিত্রনাম বদল করে একটি বিদেশী নাটকের অনুবাদ করান এবং অভিনয়সূত্রে ব্রিটিশদের বিরোধিতার মুখে পড়েছিলেন, এটাই বড়ো কথা । তবে প্রকৃত বাংলা নাটকের পত্তন ১৮৫২ সালে, জে.সি. গুপ্ত করুণ রসাত্মক 'কীর্তিবিলাস' ও তারাচরণ শিকদার-র মিলনান্তক 'ভদ্রার্জুন' রচনার মধ্য দিয়ে।

দুই. বাংলা নাটক রচনার আগে কৃষ্ণযাত্রাগুলি বাঙালির নাট্যস্বভাব তৃপ্ত করতো। সখের যাত্রাগুলি শিক্ষিত বাঙালির মন জয় করতে পারেনি, না ' বিদ্যাসুন্দর', না 'নল দময়ন্তী' । ১৮৫২-র পর বাঙালি নাট্যকারের মডেল হলো: (১) কৃষ্ণযাত্রা (২) কালীয়দমন যাত্রা (৩) শেক্সপীয়রের নাটক (৪) গ্রীক নাটক।

তিন. ১৮৭২-এর আগে ধনী ব্যক্তিদের অ-ব্যবসায়িক মৌখিক নাট্যশালা একাধিক প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারের জন্ম দিয়েছিল— যেমন রামনারায়ণ , দীনবন্ধু, মধুসূদন।

চার. রামজস্ বসাকের বাড়িতে এবং চুঁচুড়ায় নরোত্তম পালের নাট্যশালায় 'কুলীন কুলসর্বস্ব', বিদ্যোৎসাহিনী মঞ্চে 'সাবিত্রী সত্যবান' , বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী' , মেট্রোপলিটন থিয়েটারে 'শর্মিষ্ঠা' এবং 'বিধবা বিবাহ', পাথুরিয়াঘাটায় ' যেমন কর্ম তেমনি ফল', জোড়াসাঁকো

নাট্যশালায় 'কৃষ্ণকুমারী' , 'একেই কি বলে সভ্যতা', বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়ে 'সতী' নাটক অভিনয় সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নাট্যরীতি চর্চা । পৌরাণিক , ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রোমান্টিক নাটক এসে গেল।

পাঁচ. ১৮৫২-৫৬— ১২ টি নাটক (৮টি মৌলিক, ২টি ইংরেজি, ২টি সংস্কৃতের অনুবাদ)। ১৮৫৭-৭২— রচিত নাটক — ২৪০, অভিনীত নাটক—৩৮।

ছয়. ন্যাশানাল , গ্রেট ন্যাশানাল ও বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৭২-৭৩) সরকারী সাহায্য নয় , ধনীর বদান্যতা নয়, জাতীয়তাবোধ / নাটক- রচনা ও অভিনয়ে মধ্যবিত্তদের গুরুত্ববৃদ্ধি।

সাত. নাট্যনিয়ন্ত্রণ / ১৮৭৬ - এর পূর্বে বলপূর্বক, ১৮৭৬- থেকে আইন নির্ভর উপেন্দ্রনাথ - অমৃতলাল-দক্ষিণাচরণের ভূমিকা।

প্রহসনের ধারা
প্রহসন বনাম কমেডি

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক. লেবেদেফের নির্বাচন দুটি প্রহসন। বাঙালির অনুকরণ ও ভাঁড়ামি প্রীতি । পাহারাওয়ালা, গায়ক-গায়িকা , চোর-আইনজ্ঞ ইত্যাদি বিচিত্র হাস্যরসাত্মক চরিত্র। তিনটি ভাষাতেই একই সংলাপ বলেছিল কি?

দুই. শখের যাত্রা/ নিম্নশ্রেণীর হাস্যরস : প্রহসনের অভাব

তিন. মধুসূদনের দুটি প্রহসন: প্রতিক্রিয়া / উচ্চাঙ্গের প্রহসন

চার. দীনবন্ধু/ প্রহসনকারেরই প্রতিভা : 'লীলাবতী'র সাফল্যই ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা।

পাঁচ. নাটকে ব্রিটিশ বিরোধিতা/ প্রহসনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার 'গজদানন্দ ও যুবরাজ ' এবং ' হনুমান চরিত'

ছয়. চীন: জাপান: ইরান— ক্ল্যাসিকাল নাট্যরীতি

সাত. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : মলিয়র-প্রভাব। একেই কি বলে সভ্যতা : দায়ে পড়ে দারগ্রহ, বিয়ে পাগলা বুড়ো: হিতে বিপরীত— তুলনীয়।

আট. গিরিশ ঘোষ / প্রহসন লিখলেন না কেন? ঢ্যায়সা কা ত্যায়সা, সভ্যতার পান্ডা প্রহসন নয়।

নয়. রবীন্দ্রনাথ 'প্রহসন' -এ প্রথম 'ভূমিকা' ব্যবহার রীতি

দৈহিক বর্ণনা

স্বগতোক্তি

ট্রাজেডি-তে প্রহসনের চরিত্র— দেবদত্ত।

দশ. অমৃতলাল : প্রহসনে অঙ্ক বিভাগ নেই— চোরের ওপর বাটপাড়ি, তাজ্জব ব্যাপার। প্রহসনে গান— শাবাশ আটাশ, রাজা বাহাদুর নৃত্যগীতের প্রাবল্য।

এগার. বাংলা প্রহসন জন্ম থেকেই বাস্তব ঘেঁষা। কমেডি?

বারো. দ্বিজেন্দ্রলাল : মধুসূদন ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব : দৃশ্য বর্ণনা: কাল বর্ণনা: প্যারডি—

তেরো. প্রথম-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকাল / রাজনৈতিক সংকট ও প্রহসনের অভাব প্রমথনাথ 'মৌচাকে ঢিল', এর ভূমিকায় লিখছেন,' এ যুগ কমেডি শিল্পের যুগ।'

চোদ্দ. বাংলা প্রহসনে দুর্দশা কেন?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের সামাজিক প্রেক্ষিত

রামেশ্বর শ'

আধুনিক যুগে সাহিত্য-সমালোচনায় সমাজ পরিবেশের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় বিশেষভাবে কথাসাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নিবিড়তার, উপন্যাসে বাস্তবতার পরিমাণ অধিকতর। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে পরবর্তী কালে রচিত বাংলা সাহিত্যে এই সামাজিক উপাদান পূর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ দাবিরূপে ঘোষিত হচ্ছে। মার্কস্‌বাদী চিন্তাধারার প্রভাবে এই প্রবণতার সমধিক বিস্তারও ঘটেছে। মার্কসের বিখ্যাত উক্তি—

' The mode of production in material life determines the social, political and spiritual process of life. It is not the consciousness of men that determines their existence, but, on the contrary , it is their social existence that determines their consciousness.'

— Marx and Engels . 'Literature and Arts' , Current Book House, Bombay, 1956, P-1.

এ যুগের সাহিত্যদৃষ্টিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই কথা মনে রেখে আলোচ্য পর্বের বাংলা কথাসাহিত্যের আর্থ-সামাজিক পটভূমির মূল রূপরেখা সংক্ষেপে বর্ণিত হবে। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ শোষণে বাংলার সমাজজীবনে দুরবস্থা, কুটির শিল্প ও কৃষির বিপর্যয় , শিল্পায়ন, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ , জনসংখ্যা বৃদ্ধি , বেকার সমস্যা, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদির কথা আলেচিত হবে। এই সঙ্গে এ যুগের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশও বাংলা কথাসাহিত্যের ভাববস্তু ও রূপরীতিকে অন্তত অংশত প্রভাবিত করেছে। এযুগের একজন দার্শনিক এর গুরুত্ব স্বীকার করে বলেছেন: ' The work of a poet depends not only on himself and his age , but on the mentality of the nation to which he belongs and the spiritual, intellectual, aesthetic tradition and environment. '

— Sri Aurobindo : ' The Future Poetry', 1991, p-36.

একদিকে বাংলার সমাজজীবনে নানামুখী অবক্ষয়ী প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তেমনি তার জাতীয় জীবনে নানা গঠনমুখী প্রয়াস, জাতীয়তার জাগরণ, সৃষ্টিশীল ভাবনা, আন্তর্জাতিক সাহিত্য - সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগও দেখা দিয়েছে। এসব দিকেরও সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপিত হবে। সামগ্রিকভাবে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের পটভূমির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তই বর্তমান আলোচনার বিষয়।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী :

১। সাহিত্য ও শিল্পপ্রসঙ্গে মার্কস্, এঙ্গেল্‌স্ ও লেনিন— ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, কলকাতা।

২। সাহিত্যে প্রগতির দর্শন: তত্ত্ব ও প্রয়োগ— অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ।

৩। সাহিত্যের মাত্রা : দ্বান্দ্বিক সূত্র— অধ্যাপক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়।

৪। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা— অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খন্ড)— অধ্যাপক সুকুমার সেন।

৬। বাংলা উপন্যাসে কালান্তর— অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭। কালের প্রতিমা, কালের পুত্তলিকা— অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

৮। বাংলাদেশের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড) —অধ্যাপক রামেশচন্দ্র মজুমদার।

৯। তারাশঙ্কর: দেশ-কাল-সাহিত্য— অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার।

১০। আধুনিক বাংলা উপন্যাস— অধ্যাপক রামেশ্বর শ'।

১১। কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা— ড. অলোক রায়।

নজরুল : প্রাসঙ্গিকতা

রীতা কর

নজরুল শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে মনে হয়েছে নজরুলকে ফিরে দেখা দরকার। প্রয়োজন বোধ করেছি তিনি কতটা 'হুজুগের কবি' অথবা কতটা বর্তমান দিনেও তাঁর ভাবনার প্রয়োজনীয়তা। তিনি কি কেবলই তৎকালীন না কি সাম্প্রতিক কালেও তিনি সমানভাবে আদৃত। তাঁর বিদ্রোহ কেবলই বিদেশীশাসন বা সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির বিরুদ্ধেই নয়, এ-বিশ্বের যেখানে যত উৎপীড়ন আছে, তাঁর বিদ্রোহ সেই সব উৎপীড়নের বিরুদ্ধেই। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো তা তৎকালীন, কিন্তু শিল্পীর দায়বদ্ধতার কথা মনে রেখে বলা যায় আজও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই শিল্পীর অন্যতম কর্তব্য কর্ম। যারা কেড়ে খায় মানুষের মুখের গ্রাস তাদের প্রতি আঘাত হানার প্রয়োজন কী আজ ফুরিয়েছে ? ফুরিয়েছে কী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই-এর গুরুত্ব? তাই বলতে হয় নজরুলের প্রয়োজন আজও সমানভাবে গুরুত্ব পায়। অযোধ্যার ঘটনার প্রেক্ষিতে এখনও তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হয় 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন'?

তিনি বুঝেছিলেন সাধারণ মানুষের কাছে 'স্বরাজ'-এর অর্থ ব্যাখ্যা অপেক্ষা 'দুটো ভাত একটু নুন' অনেক বেশি কাম্য। রাজনৈতিক ডামাডোল, রাজনীতির কারিকুরি অপেক্ষা সুস্থভাবে বাঁচার জন্য আমাদের বর্তমান যুগে স্থায়ী সরকার চাওয়ার সঙ্গে নজরুলের 'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন' (ঐ, পৃ-৯৬) এই ভাবনার সাদৃশ্য অনুভব করি না!

১৮৬৭ সালের এপ্রিলে হিন্দুমেলায় রাজশক্তির প্রতিপক্ষক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গাও ভারতের জয়', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখচন্দ্রিমা ভারত তোমারি'-গান দুটি যে ভূমিকা নিয়েছিল তারই পথ ধরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সাম্যসাম' এবং কিছু পরে 'সাম্যবাদী'র কবি নজরুল ইসলামের আগমন।

'বর্ণভেদ বা বর্ণবিদ্বেষ'-এর মধ্য দিয়ে মানবধর্ম কালিমালিপ্ত হয়, সে-সত্য সর্বজনের চেতনা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব থেকেই 'শূদ্র' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'বর্ণ বর্ণ নাইরে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
বনেদি কে আর গর-বনেদী
দুনিয়ার সাথে গাঁথে বুনিয়াদ
দুনিয়া সবারি জনম-বেদী।'

'সত্যি বলতে কি, সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনায় উনিশ শতকীয় রোম্যান্টিকতার স্নিগ্ধতা আছে, কিন্তু ভূখণ্ডে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বার মতো বহ্নিজ্বালা নেই। কবি হিসাবে তিনি সমাজ-সংবেদী, মানবদরদী, কিন্তু বিষয়ের দিক থেকে তীক্ষ্ণ ও তীব্র নন।··· গণ-উৎসাহ জাগাবার গতিশীল ক্ষমতা নেই।' ('সাম্যবাদী' কবি নজরুল ও সঞ্চিতা, দেবকুমার বসু সম্পাদিত, শিলালিপি পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃ-৮২-৮৩) — সমালোচক জহর সেনমজুমদারের মন্তব্য মেনে নিতেই হয়। কিন্তু নজরুল সেই বিদ্রোহের সৈনিক। সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে মুচি, মেথর, জোলাকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধেছেন, নজরুল সেখানে মানব-মুক্তির যোদ্ধা হিসেবে তাদের নিয়েছেন। রুশ-বিপ্লবের সফলতা যুব-মানসে আত্মপ্রত্যয় প্রদান করে। সেই প্রেক্ষিতেই নজরুল পল্টনে যোগদান করেন, লাল-ফৌজের উত্তাপ অনুধাবন করেন।

বিপ্লবের পথ ধরে যে নতুন রাশিয়ার জন্ম, সেই রাশিয়ার নীতি শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, ১৯২২ সালে চৌরীচৌরায় কৃষক-বিদ্রোহ এ-দেশের মানুষের আবিল দৃষ্টি সরিয়ে দিয়ে প্রত্যক্ষ বাস্তবের, নির্মম সত্যের মুখোমুখি করেছে। আমেদাবাদ, মাদ্রাজ, বোম্বাই-এর বস্ত্রকল এবং কলকাতার চটকলগুলির শ্রমিক বিদ্রোহ। ১৯১৯ সাল জুড়ে কমবেশি হরতাল। ১৯২০ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সর্বহারার রাজনৈতিক মঞ্চ তৈরি হচ্ছে, কমিউনিস্ট পার্টির জন্মের মধ্য দিয়ে। ১৯২৫-২৬ সালে বীরভূমের শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করল। ১৯১৯ সালে নজরুলের 'ব্যথার দান' গল্পে দেখা যাচ্ছে লাল ফৌজে যোগ দেওয়ার প্রসঙ্গ — যা থেকে তাঁর সাম্যবাদী চিন্তান্তরের শেকড় সন্ধান করা অসম্ভব নয়। ফলত অনিবার্য হয়ে উঠল নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার আবির্ভাব। 'অগ্নিবীণা' (১৯২২)-তে 'মানব-বিজয় কেতন' -এর কথা। বললেন— ' আমি সেই দিন হব শান্ত/ যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না/ অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না/ বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত/আমি সেই দিন হব শান্ত।' (তদেব, পৃ-৪)।

'অগ্নিবীণা'য় যে সুর ধরলেন তার আরও এক ধাপ অগ্রগমন 'সর্বহারা' (১৯২৬)। 'সাম্যবাদী' কবিতায় তিনি সাম্যের গান গাইলেন—

'গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলিম ক্রীশ্চান।'

মার্কসবাদী চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ পরিণতি 'সাম্যবাদী' কবিতা।

বুক ফাটে তাও মুখ ফোটে না যাদের, সেই নারীসমাজের কথাও পেয়ে যাই তাঁর কবিতায়—

' আজ কপট কোপের তূণ ধরি,
ঐ আসল যত সুন্দরী,

কারুর পায়ে বুক ডলা খুন, কেউ বা আগুন,
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে!
তাদের প্রাণের 'বুক-ফাটে তাও-মুখ-ফোটে না-বাণীর বীণা মোর পাশে'
ঐ তাদের কথা শোনাই তোদের
আমার চোখে জল আসে' (আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, তদেব, পৃ-৯)

লেনিন নারীর অবস্থার পরিবর্তনের কথা প্রসঙ্গে— পারিবারিক কাজের একঘেঁয়ে নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি তখনই হবে যখন দেশে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা হবে— এ-কথা বলেন। সেকথাই নজরুল বললেন— ' সেদিন সুদূর নয় , যে-দিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়' (নারী, তদেব, পৃ-৮৮) তিনি স্বীকার করেন—

' সাম্যের গান গাহি—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!'

আমাদের সীমিত পরিসর, তাই আলোচনার শেষে নজরুলের প্রেমের গান প্রসঙ্গে দু-একটি পংক্তি যোগ করতে চাই। 'জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি'— বিদ্রোহী হওয়া সত্ত্বেও নজরুলের প্রেমের কবিতা বা গান আজও শ্রোতার আদরের সামগ্রী। তাঁর প্রেম পর্যায়ের গান আজও আমাদের আবিষ্ট করে। সাত সুর দিয়ে প্রিয়ার যে বাসর তিনি রচনা করেন সেখানে তাঁর কবিতার বুলবুল এখনও গান গায়। তাই তাঁর প্রাসঙ্গিকতা শতবর্ষের পথেও যে অনিবার্য সে-কথা স্বীকার করতেই হয়।

বাংলা শিশুসাহিত্য : সূচনা ও ক্রমবিবর্তন (১৮০১ — ১৯৪৭)

রবীন্দ্রনাথ বল

শিশুসাহিত্য ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ এক নয় ।
মুখে মুখে প্রচারিত ছড়া-গ্রন্থ-রূপকথার মুদ্রিত প্রকাশ এবং ছোটোদের জ্ঞানার্জন সহায়ক শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলির প্রকাশনা প্রায় একই সময় শুরু হয় । উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই এই দুটি ধারার সূচনা আমরা দেখতে পাই । ১৮০১-১৮১২ পর্যন্ত হিতোপদেশ, বত্রিশ সিংহাসন, ঈশপের গল্প প্রভৃতি গল্পমালা লিখেছিলেন গোলোকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র প্রমুখ লেখকগণ । আড়ষ্টভাষা, ছেদ, যতি, কমা চিহ্নের কোনো বালাই ছিল না ।

১৮১৭ তে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হলো স্কুল বুক সোসাইটি । ১৮২১ এ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হলো বাঙলা শিক্ষা গ্রন্থমালা । এবং ১৮২২-এ প্রকাশিত হলো 'পশ্বাবলি' । এই পশ্বাবলিতে ছবি ছিল, জীবন্ত বিষয়ের বর্ণনা থাকত । অনেকে পশ্বাবলিকে পত্রিকা বললেও এর আকার ও প্রকাশনা সৌন্দর্যের জন্য কেউ কেউ গ্রন্থ হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন । এই পশ্বাবলি গ্রন্থ থেকেই বাংলা শিশুসাহিত্যের সূচনা বলে গবেষক ও সমালোচকদের অনুমান । ইতিমধ্যে ১৮১৮ তেই বেরিয়েছে 'দিগদর্শন' পত্রিকা — যে পত্রিকায় ছোটোদের জন্যেও বেশ কিছু রচনা থাকত । ১৮১৮ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ছোটোদের জন্য প্রায় পনেরো কুড়িটি পত্রিকা বেরিয়েছে । এর বেশিরভাগ পত্রিকাই

ছোটোদের শিক্ষাদানের উদ্দেশে প্রকাশিত । তবে জ্ঞানের সঙ্গে আনন্দের খোরাক ছিল বেশ কয়েকটি পত্রিকায় । এদের মধ্যে সখা, সাথী, মুকুল পত্রিকা উল্লেখযোগ্য । ১৮৯৫-তে প্রকাশিত মুকুল পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী । যে মুকুল পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রামচন্দ্রসুন্দর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার এবং সম্পাদক স্বয়ং । এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দু কলেজ পাঠশালা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা । পাঠশালার প্রয়োজনে পাঠক্রম তৈরি হয়েছে । পাঠশালার প্রয়োজনে অক্ষয় দত্ত ও বিদ্যাসাগর উঠেপড়ে ছোটোদের জন্যে চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রয়াসী হলেন । অক্ষয় দত্তের ' চারুপাঠ' এই সময়ে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । সর্বজনপাঠ্য হলেও মূলত প্রধানত ছোটোদের জন্য বিদ্যাসাগরের লেখা বেতাল পঞ্চবিংশতি, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী গ্রন্থগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হলো । পাঠগণ্ডীর বাইরে বেশকিছু বই প্রকাশিত হলো । ভাষার আড়ষ্টতা কমেছে, বিষয়বস্তুতেও বৈচিত্র্য এসেছে । বস্তুত বিদ্যাসাগরের সময়েই শিশুসাহিত্য রচনার পটভূমি তৈরি হয়েছে বলা যায় ।

সেই সূচনাপর্ব থেকে তখনও পর্যন্ত ছোটোদের ঘরে বসে আনন্দের জন্যে পড়ার বা ছোটোদের উপহারযোগ্য কোনো বই বেরোয়নি বলা যায় ।

১৮৯১ সালে প্রকাশিত হলো যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি ও খেলা' । সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা থেকে অনুমান করা যায় 'হাসি ও খেলা'ই বাংলায় প্রকাশিত প্রথম শিশু সাহিত্য। যোগীন্দ্রনাথ মুখের কথাকে ছাপার হরফে প্রকাশ করলেন । ১৮৯১-১৯১০ বাংলা শিশু সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় । এই সময়েই প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রকিশোরের একাধিক গ্রন্থ । ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের শিশু । ১৯০৬ -এ প্রকাশিত হলো, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি । যোগীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, অবনীন্দ্রনাথ, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রমুখের একাধিক রচনায় বাংলা শিশুসাহিত্য বিচিত্রধারায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে । ১৯১২ সালে প্রকাশিত হলো বরদাকান্ত মজুমদারের শিশু । শিশুর দু'বছর বয়সে ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হলো 'সন্দেশ' । বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় ও চিত্রসজ্জায় সন্দেশ শিশুচিত্তকে চমৎকৃত করে দিল । পূর্বোক্ত লেখকসম্প্রদায়ই সন্দেশের লেখক গোষ্ঠী হলেন ।

১৯২১-এ প্রকাশিত হলো মৌচাক । ১৯২২-এ শিশু সাথী এবং ১৯২৩-এ খোকাখুকু । ১৯৪০-এ আনন্দবাজারে এবং কিছুকাল পরে যুগান্তর পত্রিকায় 'আনন্দমেলা' ও 'ছোটোদের পাততাড়ি' বিভাগের প্রবর্তন । সন্দেশ, মৌচাক, খোকাখুকু, পাঠশালা, রামধনু পত্রিকার নিয়মিত লেখকবৃন্দ ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ধীরেন ধর, খগেন মিত্র এবং আরো অনেকে । যাঁদের রচনায় বাংলা শিশু সাহিত্য বিচিত্রধারায় পল্লবিত হয়েছে বিকশিত হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে ।

মহারাষ্ট্র-পুরাণ

রেবা সরকার

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের বাংলা সাহিত্যে নবীনচন্দ্র-সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'কে ব্যতিক্রমী ধরলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বিবৃত হয়েছে এমন রচনা বিরল দৃষ্ট। এই প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতকে রচিত গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ' কাব্যটির উল্লেখ স্বাভাবিকভাবেই অনিবার্য হয়ে পড়ে। ডা. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছেন, — 'মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ইহাই একমাত্র ইতিহাসাশ্রিত যথার্থ তথ্য কাব্য'। ডা. বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যের আলোকে কিছু রেখাপাত করা বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৭৪২ খ্রীঃ থেকে ১৭৫১ খ্রীঃ পর্যন্ত সময় এক মর্মান্তিক ভয়াবহতার পর্ব। এই সময় সুদূরবর্তী মহারাষ্ট্রীয়েরা বারবার অপ্রতিহত গতিতে বাংলাদেশ আক্রমণ করে। প্রায় সমকালে রচিত 'সিয়ার-উল্-মুখোর', 'মুজাফ্ফরনামা' প্রভৃতি ফার্সী কালপঞ্জীতে এই বর্গী আক্রমণের নানা ঘটনার উল্লেখ আছে। তাছাড়া লিউক, স্পার্কটন প্রভৃতি সমকালীন ইংরেজ লেখকেরাও অভ্রান্ত তথ্য প্রমাণাদিসহ বর্গী আক্রমণের নানা ঘটনা ও বিবরণ ভবিষ্যৎ কালের জন্য সংরক্ষণ করে গেছেন। 'বঙ্গদর্শন'-এর নবম খণ্ডেও এই ঐতিহাসিক ঘটনার নানা দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে।

সাধারণত, দলবেঁধে বা বর্গ নিয়ে আক্রমণ করত বলে মাহারাষ্ট্রীয়েরা ইতিহাসে বর্গী নামে সুপরিচিত। বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত নবাবের সৈন্যরাই ছিল এই বর্গীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য। কিন্তু তাহলেও প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায়, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এরা অত্যাচার ও লুণ্ঠন চালাত। ফলে, সাধারণ মানুষের জীবনযাপন অত্যন্ত বিপদাপন্ন হয়ে পড়ত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবন-জীবিকা সব কিছুতেই সৃষ্টি হতো অচলাবস্থা। আমাদের আলোচ্য 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' কাব্যটি এই বর্গী আক্রমণের এক ইতিহাসাশ্রিত জীবন্ত চিত্র। ১১৪৯-৫০ সনে পশ্চিমবঙ্গে বর্গীদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন, নবাব আলীবর্দীর সাময়িক পরাভব এবং পরিশেষে জনসাধারণের বিরোধিতায় বর্গী সেনাপতি ভাস্করের পরাজয় এবং নবাব আলীবর্দীর চক্রান্তে ভাস্করের নিধন — মোটামুটিভাবে এই কাহিনীই গঙ্গারামের কাব্যের মূল বিষয়বস্তু।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত মহারাষ্ট্র পুরাণের পুঁথিতে কাব্যরচনার কাল প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে —'ইতি মহারাষ্ট্র পুরাণে প্রথম কাব্যে ভাস্কর পরাভব।। সকাব্দ ১৬৭২, সন ১১৫৮ সাল। তারিখ ১৪ই পৌষ, রোজ শনিবার।' অর্থাৎ এই কাব্যটি ১৭৫১ খ্রীঃ রচিত হয়। কবি বিশেষভাবে 'প্রথম কাব্যে ভাস্কর পরাভব' উল্লেখ করায় মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দ্বিতীয় কোনো খন্ড রচনাও হয়তো তাঁর অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত এমন কোনো খন্ডের সন্ধান পাওয়া যায়নি। মোট ৭১৬ পংক্তিতে সমাপ্ত কাব্যটিতে বাংলাদেশে বর্গী হাঙ্গামার মর্মান্তিক ভয়াবহ কাহিনী সরল পয়ার ছন্দে সুনিপুণ বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

লক্ষণীয় যে গঙ্গারাম কাব্যটিকে পুরাণ নামে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' ছন্দোবদ্ধে রচিত একটি ধর্মীয় কাব্য। এবং তদনুসারেই কবি পুরাণ পদ্ধতিতে কাব্যের সূচনা করেছেন—

'রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজি পাপমতি হইঞ্যা।
রাত্রদিন কৃড়া করে পরস্ত্রী লইঞ্যা।।

শ্রীঙ্গার কৌতুকে জীব থাকে সর্বক্ষণ।
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন।।'

—সুললিত পয়ার কাব্যের এই গৌরচন্দ্রিকা পুরাণ কাব্যকে প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু 'এহো বাহ্য'। কাব্যটির পুরাণ পদ্ধতির বর্ণনা তার বহিরাবরণমাত্র, কাহিনীবয়নের সূত্রে কবি এখানে অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশের ইতিহাসের এক বহু মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করতে বসেছেন এবং এই দৃষ্টি কোণ থেকেই 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'এর মূল্য অপরিসীম। পুরাণে দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। তাই অনতিবিলম্বেই শিব এখানে ধ্যানমগ্ন হয়ে পৃথিবীর ভারনাশের চিন্তাটি স্থির করলেন —

'নন্দীকে ডাকিয়া শিব বলিছে বচন
দক্ষিণ শহরে তুমি জাগ ততক্ষণ।।
সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে।
অধিষ্ঠান হয ··· তাহার দেহেতে।।
বিপরিত পাপ হইল পৃথিবী উপরে।
দূত পাঠাইঞা যেন পাপী লোক মারে।।

তারপরেই,

সাহুরাগ বোলে তবে রঘুরাজার তরে।
অনেকদিন হইল বাংলার চেউ না দেত্র মোরে।।

বাংলাদেশে বর্গী আক্রমণের মূল কারণ হিসাবে গঙ্গারাম যে ইতিহাসনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন কবি ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের গ্রন্থ সূচনা অংশে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে সেই ঘটনার চকিত উল্লেখ করেছেন, যদিও তাঁর ব্যাখ্যানুযায়ী আলীবর্দীর ভুবনেশ্বর লুণ্ঠনের কারণে শিবের ক্রোধ এবং তার ফলে শিবের নির্দেশে ও নন্দীর স্বপ্নাদেশে রঘুরাজা কর্তৃক ভাস্কর পণ্ডিতকে বর্গী সেনাপতি রূপে বাংলায় প্রেরণ। তবে এক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত তথ্যের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

ভারতচন্দ্রে অতি সংক্ষিপ্ত বর্গী আক্রমণের বর্ণনা আছে—

কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন ঝিউড়ি বহুড়ী।।

মহারাষ্ট্র পুরাণে এই চিত্রেরই সুবিস্তার —

'সেক সৈয়দ মোগল পাঠান যত গ্রামে ছিল
বরগির নাম শুইনা সব পলাইল।।

এছাড়া ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে বিস্তৃত অত্যাচারের চিত্র তিনি এঁকেছেন, তাও তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তিরই পরিচায়ক —

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল।
গো-হত্যা, স্ত্রী হত্যা শত শত কৈল।।

ইতিহাসকে আধুনিক কালে যে অর্থে গ্রহণ করা হয়, গঙ্গারাম নিঃসন্দেহে সেই অর্থে তাঁর কাব্য রচনা করেননি। কিন্তু একথা বলতে বাধা নেই যে, পুরাণের ভঙ্গিতে গল্পচ্ছলে সরল পয়ারী ছন্দে তিনি সেকালের মানুষের জন্য যে গল্প পরিবেশন করেছিলেন তা দ্বিতীয় রহিত। তাই ঐতিহাসিক যখন বলেন — 'It is a highly valuable piece of historical writing' (কালীকিঙ্কর দত্ত)

তখন সাহিত্য সমালোচককেও সমস্বরে স্বীকার করে নিতে হয় যে 'মহারাষ্ট্র পুরাণ ইতিহাসাশ্রিত যথার্থ তথ্যকাব্য' । এইখানেই কবির কৃতিত্ব ও কাব্যের অনন্যতা ।

রবীন্দ্রসাহিত্যে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রেরণা

রত্না বসু

রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাট্য 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' , 'কচ ও দেবযানী', 'গান্ধারীর আবেদন', প্রবন্ধগুচ্ছ 'প্রাচীন সাহিত্য' খুব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ পাঠ দিয়েই যে বালকের 'সহজ'এর লেখাপড়া শুরু, পরবর্তীতে তারই নানা কাহিনী ভিন্ন বাক্‌প্রতিমা গ্রহণ করেছে; মূল সূত্রটি কিন্তু উৎসেরই চিরনবীন প্রকাশ। এভাবে সাহিত্যনির্মাণ সম্বন্ধে যে-আদর্শ বা ভাবাদর্শ মূল মর্মনিহিত ভাবরূপ হয়ে ওঠে, সাহিত্যের রূপাদর্শ ও ভাবাদর্শও তাকে কেন্দ্র করেই পরিশীলিত সঞ্জীবিত আকার নিয়েছে। সাহিত্যের আদর্শ নির্ণয় করতে গিয়ে কবিবচনের পৃষ্ঠভূমিতে যে সংস্কৃতসাহিত্যের ব্যাপক চর্চা নিহিত তা স্পষ্ট। কবির 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলি, 'মানুষের ধর্ম' এবং 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধাবলিও তারই সাক্ষ্য বহন করে। কবিতায়, গানে, নৃত্যনাট্যে, প্রবন্ধে কতবার কতরূপে তাপস ও তপোভূমি কিংবা তপোবন স্থান পেয়েছে; সেই চিত্ররূপ কবির মনোলোকের দিগ্‌দর্শন উপস্থিত করে যা,— কুমারসম্ভবের হিমালয় , তার তপোভূমি, মহাদেবের ধ্যানমূর্তি, শকুন্তলা-নাটকের মালিনীনদী তীরে কণ্বমুনির তপোবন, রামায়ণে তমসা-নদীতীরের বাল্মীকিমুনির তপোবন, — এসবেরই নবরূপ বা পুনরুচ্চারণ যেন। শুধু সংস্কৃতকাব্যের ধ্যানগম্ভীর রূপ নয় ললিতকলাও আকৃষ্ট করেছে কবিকে, নায়িকার রূপবর্ণনায়, অজস্র প্রেম ও প্রকৃতির গানে, কবিতায় তার স্বাত্মীকৃত রূপ দেখা যায়। 'বিজয়িনী' কবিতার অচ্ছোদসরসীনীরে স্নানোদ্যতা রমণীর মধ্যে কি কুমারসম্ভবের তৃতীয়সর্গের অভিসারিকা পার্বতীর রূপবর্ণনার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় না? 'ভানুসিংহের পদাবলী'-র গান কি গীতগোবিন্দকে পুনরুজ্জীবিত করে নি?

অন্যদিকে কবির সমগ্র বেদ-উপনিষদ্-পাঠ যেন সারাৎসার হয়ে রূপ নিয়েছে ' মানুষের ধর্ম'-প্রবন্ধাবলিতে। মূল বচন উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা চলেছে আগাগোড়া । ছিন্নপত্রের একাধিক পত্রেও এ-ভাবনার অনুরণন ছড়িয়ে আছে বিক্ষিপ্তভাবে। রামায়ণের কাহিনীর প্রেক্ষিত নিয়ে কবির রচনা 'কালমৃগয়া' ও 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নৃত্য-ও গীতিনাট্য, যেখানে মূল সংস্কৃতবচনের অন্তর্বয়ন আছে একাধিক স্থলে। কালমৃগয়ার তৃতীয় দৃশ্যে অন্ধমুনির বেদপাঠে যে-বচন উচ্চারিত, —' যে এই বায়ুকে বৎস বলে জানে তাকে পুত্রশোকে কাঁদতে হয় না',— তা নাটকীয় তাৎপর্যবাহী dramatic irony; তার পরমুহূর্তেই মুনি ছেলেকে জল আনতে পাঠাচ্ছেন 'তৃষ্ণায় কণ্ঠাগত প্রাণ' হয়ে; সেই জল আনতে পাঠানোর পরেই দশরথের বাণে বিদ্ধ হয়ে সেই পুত্রের মৃত্যু; পুত্রশোকে মুনি হতবুদ্ধি । শাপ দিলেন রাজাকে। মুনির বেদবচন-

উচ্চারণ এবং অভিশাপ দুইই কবি রেখেছেন মূল সংস্কৃতে; বাংলা দেন নি। মায়ার খেলা নৃত্যনাট্যের (দ্র. গীতবিতান, অখণ্ড, পরিশিষ্ট ১) শেষ দৃশ্যে কবি মূল পাঠে একটি ধ্যানমূর্তির বর্ণনা রেখেছিলেন; সেই 'তাপস মৃত্যুঞ্জয়'এর মূর্তি কুমারসম্ভব-কাব্যের তপোনিরত 'নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' মহাদেবের বর্ণনারই অনুধ্বনি। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের শেষেও আছে তিনটি সংস্কৃত মন্ত্র; অবশ্য বাংলা অনুবাদও দিয়েছেন পাশাপাশি। কবির দীর্ঘ গীত 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' — বুদ্ধবচনেরই অনুরণন। 'পিতা নো'সি' মন্ত্র স্মরণ করে কবিকণ্ঠে উচ্চারিত 'তুমি আমাদের পিতা'— গান। অজস্র গানের ভাষায় ধ্বনিত উপনিষদের বাণী —'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতো হয়মগ্নিঃ । তমেব ভান্তম্-অনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' শুধু তাই নয় আপাতভাবে লক্ষিত না হলেও অন্তরঙ্গ বয়নেও রবীন্দ্রকাব্যের পশ্চাতে মূল সংস্কৃত কাব্য প্রচ্ছন্ন । কবির কবিতা বা নৃত্যনাট্যে মদনচরিত্রকল্পনা এমনই একটি বিষয়। মদনের পরাজয়, মদনভস্ম ও উমার জীবনের ব্যর্থ বসন্তসজ্জা, বসন্তবিলাস ও তার আত্মগ্লানি ক্রম-পরিবর্তন করে রূপ নিয়েছে চিত্রাঙ্গদা-গীতিকাব্যের আঙ্গিকে ও বচোবিন্যাসে। দুই ক্ষেত্রেই মদনের পরজয় ও পরাভবই চিত্রিত । তবে গভীর ব্যঞ্জনা ও সূক্ষ্ম আঙ্গিক-নির্মাণের মধ্যে তা ভিন্নতর রূপ ও রস লাভ করেছে। রবীন্দ্রকাব্যে বসন্তবর্ণনার মধ্যে বারেবারেই শোনা যায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের বসন্তের আনাগোনা। বিরহের বর্ণনার মধ্যে শোনা যায় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের হৃদয়ের কান্না। বাংলা সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসৃষ্টি ও রবীন্দ্রদৃষ্টি আজও মৌলিক স্থান অধিকার করে আছে। আর তার মূলে আছে একদিকে ঔপনিষদ অনন্ত আনন্দের মহিমার উপলব্ধি, অন্যদিকে বিপুল সংস্কৃত-সাহিত্য-সম্ভারের অমৃতময়ী রসধারা— এ-দুয়ের প্লাবনে আপ্লুত উচ্ছ্বসিত আত্মস্থ কবিমানসে অবগাহন করতে হলে উৎসের অনুসন্ধান করতেই হয়।

জীববৈচিত্র্য জীবপ্রযুক্তি ও মেধাসত্ত্ব অধিকার

শ্যামল চক্রবর্তী

বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকে পা রাখতে চলেছি আমরা। একুশ শতকের শুরুতে পৃথিবীর চেহারাটা ক্রমশ যেন অপরিচিত হয়ে উঠছে। যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির আন্তর্জাতিক অর্থনীতি এখন পঙ্গু। অর্থনীতির নতুন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় 'পরিবেশ'। 'পরিবেশ'-এর অন্যতম অঙ্গ জীববৈচিত্র্য। পৃথিবীর রয়েছে দু'টি ভাগ। একভাগে জীববৈচিত্র্য অফুরাণ অথচ মানুষের জীবনযাত্রা দুর্দশায় পরিপূর্ণ। অন্যভাগে জীববৈচিত্র্য রিক্ত কিন্তু জীবনযাত্রায় সমৃদ্ধিঈর্ষণীয়। একুশের পৃথিবীতে এই দু'ভাগের লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। ১৯৪৮ সালের তৈরি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ইচ্ছামৃত্যু ঘোষণার আগে ৪৩৮ পাতার খসড়া দলিল তৈরি করেছিল। সংস্থাটির সংক্ষিপ্ত নাম গ্যাট। দলিলটির নাম ডাঙ্কেল প্রস্তাব। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। গ্যাট থাকবে না। জন্ম নেবে নতুন সংস্থা। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। ডব্লিও টি ও । ১৮৫৬ সালে পরাধীন ভারতে প্রথম তৈরি হয়েছিল পেটেন্ট আইন। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসে ঠেকেছে 'ভারতীয় পেটেন্ট আইন ১৯৭০'এ। ইউরোপের প্রথম পেটেন্ট আইন ভারতেরও পরে। ১৮৮৩ সালে। প্যারিস কনভেনশন থেকে নেওয়া পেটেন্ট আইন। পৃথিবী এর বাইরে আজ দেখছে নতুন পেটেন্ট আইন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় যা নথিভুক্ত হয়েছে। স্বাক্ষরকারী হিসেবে আমাদের দেশকে এসব আইন মেনে চলতেই হবে।

জীব প্রযুক্তির যুগে জীবনের ছলাকলাকে নানাভাবে পাল্টে দেওয়া যায়। জীবনের প্রতিভূ ডি.এন.এ.। ডি.এন.এ. তৈরি গাদাগুচ্ছের 'জিন' দিয়ে। কোনো ডি.এন.এ.তে 'জিন' যোগ বিয়োগ করা এখন প্রায় কাঠমিস্ত্রীর কাজের সমান (উদ্ভাবনাকে ছোটো করে দেখছি না)। জীববৈচিত্র্য সম্বন্ধ অঞ্চল থেকে সকল শস্য সকল কৃষিবীজ একসময়ে গিয়েছে পৃথিবীর নানা দেশে। কেউ কখনও এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। আজ নিজের ঘরে সকল শস্য সম্পদ জমিয়ে ধনীদেশগুলি (জিন ব্যাঙ্ক তার অন্যতম দৃষ্টান্ত) তৈরি করেছে নতুন পেটেন্ট আইন। জীব প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে কোনো শস্যবীজ সামান্য পরিবর্তিত করে একশোভাগ মালিকানা ঘোষণা করা হচ্ছে। প্রকৃত উৎপাদক থেকে যাচ্ছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বাণিজ্যের নতুন একটা চেহারা উঠে আসছে পৃথিবীতে। এই পথে আমরা পথিক হবো কি? যদি না হই, কি আমাদের করণীয়। সে সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে।

উনিশ শতকের মহিলা কবিদের কবিতা নারীবাদের আলোকে

শর্মিষ্ঠা সেন

ফেমিনিস্ট আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ পাশ্চাত্যে, হিন্দু বাঙালি নারীর আদর্শ বেহুলা, তার স্বামী তার পূজ্য দেবতা, ত্যাগই তার মহিমা । কিন্তু বিশ্বব্যাপ্ত নারীবাদের অভিঘাতে আজ তার ভূমিকা একটু বিচলিত । সাম্প্রতিক বাঙালি মহিলা-কবির কবিতায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় । আজকের কবিরা বলবার ভঙ্গি, ভাবা সমস্তই পাল্টেছেন, কেউ অতিক্রম করেছেন তাঁর পুরুষরচিত ভূমিকাকে, কেউ দুলেছেন অর্জিত সংস্কার আর না-সংস্কারের দোলায় ।

এই ভাবনা যেমন পাশ্চাত্যের অভিঘাতের ফল, তেমনি এর শিকড় রয়েছে বিগত দশকের মহিলারচিত কবিতাতেও । গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কাব্য ও মানকুমারী বসুর কাব্যপাঠে এই সত্যই প্রতিভাত হয় ।

বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, পাওয়া গেলেও বিবর্ণ, ভঙ্গুর পৃষ্ঠা এই দুই কবির সাহিত্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সমালোচকই কথা বলেছেন, তিনিই এই কবিদের কবিতায় স্বামীহারা নারীর শোকাশ্রু দেখতে পেয়েছেন। কবিতাগুলি একমাত্র যে গুণে গুণান্বিত, তা হলো স্বামীস্মৃতি রোমন্থন, বৈধব্যের বেদনা আছে, একথা মানতে আমরা বাধ্য ।

কিন্তু, এই স্বরই তাঁদের কবিতার একমাত্র স্বর নয় । স্বামীপ্রেমের চেয়ে অনেক বেশি বাধ্য-জীবনের শৃঙ্খল যন্ত্রণা, যা আগুন আর শ্মশানের প্রতীক হয়ে কাব্যে এসেছে অনেক জায়গায় ।

আসলে, উনিশ শতকের মহিলা-কবির কাছে কবিতা একটা আড়াল, একথা মনে রেখে আমাদের প্রতীকগুলির পুনর্পাঠ করা প্রয়োজন । সমাজে যে ভাবনা তাঁদের পক্ষে বাধাপ্রাপ্ত, সেই ভাবনা প্রতীকের আড়াল দিয়ে মুক্তির পথ খোঁজে সাহিত্যে । তাই এঁদের দুজনের কবিতাতেই স্বপ্নমিলন সম্ভব হয় দূরান্তে, মাঠে, বিজন বনে, নদীতীরে, সুদূর স্বর্গলোক, মহাকাশ বা দূর নক্ষত্রমণ্ডলীতে ।

এঁদের দু'জনের কবিতার নারীই অলঙ্কারসজ্জিতা, প্রাণোচ্ছল, হাস্যমুখর, প্রেম-প্রতীক্ষায় অধীর ।

এঁদের দু'জনের কবিতায় রূপ, রস, গন্ধ, রং এর ছড়াছড়ি । ফোটা ফুল, আলো-মুখ, নক্ষত্র খচিত কালো-রাত্রি, চন্দ্র বিরাজিত আকাশ, গানের সুর, রঙীন সমুদ্রের ইমেজ কবিতায় ভরপুর ।

মহিলা কবির বিশ্বব্যাপী ঐতিহ্যের অঙ্গীকার তাঁদেরও ছোটো ফুল, ছোটো-কুঁড়ি, ছোটো তারা ইত্যাদি এঁদের কবিতায় এসেছে ।

নারীমুক্তির ভাবনা এঁদের কবিতায় ।কৌলীন্যের প্রতিবাদ, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বহুবিবাহ-বাল্যবিবাহের বিরোধ,নারী-পুরুষের অসাম্য, পক্ষপাতী সমাজকে ধিক্কার এসব এই দুই কবিরই কবিতার বক্তব্য ।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কঠোর সমালোচনা নারীবাদ না-জানা এই কবিদের কবিতাকে অনন্য করে তুলেছে । কবিতার পুনর্পাঠে কি ভাবে চেনা কথার থেকে বেরিয়ে আসছে নতুন টেক্সট্‌, আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে তা দেখাতে চেষ্টা করেছি ।

গিরীন্দ্রমোহিনীর 'কি বলিব লোকনিন্দাভয়ে কাঁপে মোর অবলা পরাণ' আর মানকুমারীর 'পাছে লোকে কিছু বলে' জাতীয় কবিতায় সবরকম আড়াল সরিয়ে কবিতা হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ সমাজ সমালোচক ।

কবিতা 'কাব্যগুণ' সমৃদ্ধ না হলেও এই কবিতাগুলিকে সমালোচকের কথামতো ' এ ঘর সংসারের পাঁচাপাঁচি ছবি' ব'লে অতি সরলীকরণ করা অবাঞ্ছনীয় । বয়ান (text) অপরিবর্তনীয় একমাত্র ব'লে আর মনে করেন না আধুনিক সমালোচনা-তাত্ত্বিকরা । এই সূত্রে বিশ্বের অপরাপর মহিলা কবির কবিতার পার্শ্বে subordination এবং mis-reading এর অত্যাচার পুষ্ট এই দুই কবির কবিতার পুনর্পাঠের প্রয়োজন অনস্বীকার্য । সে উত্তরদায় বাঙালি পাঠকের ।

না-বলা বাণী ও প্রতিবাদী স্বর

শ্রীমতী চক্রবর্তী

রাসসুন্দরী দাসী রচিত আত্মজীবনী 'আমার জীবন' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বাংলা গদ্যে লেখা প্রথম আত্মজীবনী ও একজন মহিলার রচনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আত্মজীবনী বা জীবনী সাহিত্যের একটি প্রধান ধারা যা উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে বাঙালির ইতিহাসচর্চা ও ইংরেজি সাহিত্যে নানা জীবনী পাঠ করার সূত্রে আরম্ভ হয়। মধ্যযুগে জীবনী লেখা হলেও তা ছিল মহাপুরুষদের জীবনী কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস সচেতনতা থেকে সাধারণ মানুষের জীবনী লেখা আরম্ভ হয়।

বইটির মধ্যে নানা জায়গায় যে নীরবতা ও প্রতিবাদী স্বর পেয়েছি তার প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। ইদানিং মহিলা লেখিকাদের রচনার আলোচনায় silent writting যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। বিখ্যাত ইংরেজ লেখিকা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ রচিত ব্যক্তিগত চিঠি প্রসঙ্গে Cathenine Stimpson বলেছিলেন ' Letters occupy a middle space between writtings, for one self (a dairy journal) and fiction. ভার্জিনিয়া ও রাসসুন্দরীর মধ্যে দুই মেরুর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও

একজায়গায় আশ্চর্য মিল, তাঁরা দুজনেই মহিলা সাহিত্যিক। এই কারণেই হয়তো রাসসুন্দরীর রচনায়ও দুটি লাইনের মধ্যবর্তী একটি অদৃশ্য লাইন আছে ও সেখান থেকে লেখিকার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

এই গ্রন্থটির দুটি ভাগ আছে প্রথমটি ১৮৬৮ খ্রীঃ ও দ্বিতীয়টি ১৮৯৮ খ্রীঃ রচিত। শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে লিখেছেন যে রাসসুন্দরী ধর্মপিপাসাগত ও চৈতন্যভাগবত পড়তে পারবেন বলে লেখাপড়া শিখতে চেয়েছেন।

লেখিকার ধর্মপিপাসা প্রশংসনীয় তবে মনে রাখতে হবে যে তখন সমাজ মেয়েদের লেখাপড়া শেখাকে কত গর্হিত অপরাধ মনে করত। তাই হয়তো ধর্মের আবরণে তিনি সমাজের কঠোরতাকে শিথিল করতে চেয়েছেন। তার লেখাপড়া শেখার বাধা না পড়ে এইজন্য ধর্মের মোড়কের মধ্যে লেখাপড়া শিখেছেন। ইতিহাসেও তার দৃষ্টান্ত আছে যেমন মীরাবাই, মহাদেবী আক্কা।

গ্রন্থটির দুটি খন্ডের আরম্ভে সরস্বতী বন্দনার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে লেখিকা জীবনে ও গ্রন্থে স্ত্রী শিক্ষাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ সরস্বতী বিদ্যার দেবী।

রাসসুন্দরীর জীবনকাল ১৮০৯-১৯০০ , এই সুদীর্ঘ নব্বই বছরে হিন্দুনারী ও হিন্দুসমাজ অনেক পথ অতিক্রম করেছে। প্রথমদিকে ব্রাহ্ম মহিলারা শিক্ষাচর্চায় অগ্রণী হন। ১৮১৯ থেকে কলকাতায় নানা স্কুল খুললেও গ্রামে তখনও শিক্ষার আলো পৌঁছয়নি। রাসসুন্দরীর কথা থেকে জানা যায় ঘরের দরজা বন্ধ করে লিখতে হতো। অধিকাংশ লোকই ভাবত নারী বিদ্যাচর্চা করলে সমাজ রসাতলে যাবে।

গ্রন্থটির নানা স্থানে স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী সমাজের প্রতি সমালোচনার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তিনি বারবার বলেছেন শিক্ষার অভাবেই নারীর আজ এত দুর্দশা ও তাদের পশুর মতো জীবন কাটাতে হয়। ভাবতে অবাক লাগে সেযুগের একজন সাধারণ গৃহবধূ চিন্তায় কত অগ্রসর হতে পারেন।

লেখিকা এই গ্রন্থে শ্বশুরবাড়ির প্রতিটি লোকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সেখানে তাঁর যে ভূমিকা তা এক আদর্শ গৃহবধূর। কিন্তু মাঝে মাঝে এই ভূমিকা থেকে তিনি সরে আসেন ও তখন তাঁর প্রতিবাদী স্বর শোনা যায়। সেই স্বরে ধ্বনিত হয় সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অভিমান। এই ব্যবস্থার ফলেই তিনি বাপের বাড়ি যেতে পারতেন না কারণ তাকে পাঠান হতো না। মাকেও তিনি শেষ দেখা দেখতে পারেননি। নিজেকে তিনি বলেছেন ''বদ্ধ বিহঙ্গী'' এই ইমেজের মধ্যে দিয়ে নারীর পরাধীনতা ও বন্দীত্ব জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে।

এই গ্রন্থে লেখিকার স্বামীর কথা একেবারে নেই বললেই চলে। হয়তো স্বামীর সম্বন্ধে নীরবতা পালন করে তিনি সেই যুগের বিবাহ ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। এই সমাজ ব্যবস্থার ফলেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ও অবস্থার বিপুল ব্যবধান থাকত ও তারফলে থেকে যেত সম্পর্কের দূরত্ব।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নানা সামাজিক আন্দোলনের ফলে নারী জাগরণ এসেছিল। এগুলির মধ্যে রাসসুন্দরী স্ত্রী শিক্ষাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজ ও সংসারের মধ্যে থেকেও প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। এটি তার ব্যক্তিগত জীবনী বলে উপেক্ষা করা যায় না কারণ একান্ত ব্যক্তিগত কথা বলার মধ্যেও তিনি সমাজ চিত্র নির্মাণ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ

সত্যবতী গিরি

কারও কারও মতে চণ্ডীদাস সম্ভবত সংস্কৃতে দানলীলা ও নৌকালীলাকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই ধরনের কাব্য আমরা হাতে পাই নি। অথচ অন্যদিকে দেখছি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দুটি খণ্ড, দান ও নৌকাখণ্ড । এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষকে ছেড়ে অনুমানকে অবলম্বন করা হয়েছে। বিরোধিতা করার জন্য এই ধরনের কুতর্ককে প্রয়োগ করা গেলেও গ্রহণীয় হয়ে ওঠে না। কারণ সনাতন গোস্বামী স্বতন্ত্র কাব্য হিসেবে যদি শব্দগুলির ব্যবহার করতেন তবে তা দানলীলা নৌকালীলা হতো না। খণ্ড তো অপূর্ণতাজ্ঞাপকই । সম্পূর্ণ কাব্য হিসেবে গীতগোবিন্দের উল্লেখ করার পর তিনি এই খণ্ডগুলির উল্লেখ করেছেন। দানখণ্ড , নৌকাখণ্ড শব্দগুলি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা দেখে আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই সনাতনের উদ্দিষ্ট বিবেচনা করি।

কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য আদৌ এ নয় যে, সনাতন-উদ্দিষ্ট কাব্য হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের উদ্দেশ্য চৈতন্য-পূর্ববর্তী কৃষ্ণকথার স্বরূপ সন্ধান। সনাতন কৃষ্ণকথার যে দুটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন এবং জীবনীকারের উল্লেখে শ্রীচৈতন্যদেব যে দুটি লীলা অভিনয় করতেন তা বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে চৈতন্যপূর্ব কাল থেকেই বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল— এইটিই সত্য হিসেবে প্রতিভাত হয়। এবং বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য চৈতন্যদেবের আস্বাদনধন্য যদি নাও হয়ে থাকে কিংবা সনাতন যদি এই কাব্যটিকে উল্লেখ নাও করে থাকেন, তবুও একথা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে চৈতন্যপূর্বকালের এই জনপ্রিয় প্রসঙ্গ দুটি বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য মারফৎই আমরা পেয়েছি। অন্যত্র কোথাও এর সন্ধান পাওয়া যায় নি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মহাপ্রভু আস্বাদন করতেন কিনা — এই বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও এই কাব্য-বিষয়টিকে চৈতন্যপূর্ববর্তী বলে গ্রহণ করার পক্ষে বেশ কিছু প্রমাণ আমরা পেয়েছি। অতএব পঞ্চদশ শতাব্দীর কাব্য-বিষয় হিসেবেই আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণকথার বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতার সন্ধান করবো।

ঐতিহ্য ও উত্তরণ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির প্রথমাংশ, শেষাংশ এবং মাঝখানের কিছুটা অংশ পাওয়া যায় নি। এজন্য কিন্তু কাহিনী অনুধাবনের অসুবিধা হয় না। ভূমিভারহরণের জন্য দেবতাদের অনুরোধে মর্ত্যে কৃষ্ণের জন্ম, মথুরাগমন, মথুরা থেকে কিছু সময়ের জন্য প্রত্যাবর্তন এবং রাধার সঙ্গে মিলনের পর কৃষ্ণের পুনরায় মথুরা যাত্রা ও বিরহিণী রাধার ব্যাকুল ক্রন্দন পর্যন্ত এসে পুঁথিটির পাতা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই কাব্যটি মিলনান্ত অথবা বিয়োগান্ত তা বোঝা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি মোট ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত— জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ।

কাব্যটিতে এর কাহিনী অংশ আমরা যেটুকু পাচ্ছি, এবার তা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। দেবতাদের প্রার্থনায় কংসাসুরের অত্যাচার-পীড়িত পৃথিবীর ভার মোচনের জন্য বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে জন্মালেন। আর লক্ষ্মী রাধারূপে জন্মালেন সাগর গোয়ালা ও পদুমার কন্যারূপে। এরপর কাহিনীতে কৃষ্ণ এক গ্রাম্য গোপ যুবক আর রাধা তখন আইহন গোয়ালার পত্নী। বড়ায়ির কাছে রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বড়ায়ির হাতে তাম্বুল দিয়ে রাধাকে প্রেম নিবেদন করলেন। রাধাচন্দ্রাবলী এই প্রেম প্রত্যাখ্যান করে বড়াইকে অপমান করলেন। অপমানিত কৃষ্ণ বড়ায়ির সহযোগিতায় রাধার

প্রেম লাভের জন্য ষড়যন্ত্র করলেন। দানী সেজে কৃষ্ণ রাধার দধিদুগ্ধ নষ্ট করলেন এবং রাধাকে জোর করে ভোগ করলেন। নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে সম্ভোগ করার জন্য কান্ডারী সেজে গোপীদের যমুনা পার করে দিলেন এবং শেষে নৌকা ডুবিয়ে রাধার সঙ্গে জলকেলি করলেন। এবার রাধা কৃষ্ণের প্রতি কিছুটা অনুকূলা হলেন। অতঃপর ভারবাহীরূপে কৃষ্ণ রাধার ভার বহন করলে ও রৌদ্রনিবারণের জন্য রাধার মস্তকে ছত্রধারণ করলে রাধা রতিদানের আশ্বাস দিলেন। পরে কৃষ্ণ , রাধা ও অন্যান্য গোপিনীদের সঙ্গে বনবিলাস করলেন। এই কাব্যে কৃষ্ণের বীর্যপ্রকাশক একটি মাত্র যে লীলা রয়েছে তা কালীয়দমন । কালীয়দমনের পর গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের জলক্রীড়া ও বস্ত্রহরণলীলা। এরপর দেখি কৃষ্ণ রাধার হার চুরি করেছেন এবং রাধা যশোদার কাছে গিয়ে কৃষ্ণের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন। এজন্য ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ রাধার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে মদনবাণ নিক্ষেপ করলে রাধা মূর্চ্ছিতা হলেন। রাধার অবস্থা দেখে কৃষ্ণ ভীত ও অনুতপ্ত হলেন। রাধার শোকে ব্যাকুল বড়াই কৃষ্ণকে বন্ধন করে ফেলল, কিন্তু কৃষ্ণের কাতর অনুরোধে পরে তার বন্ধন মোচন করল। পরে রাধার জ্ঞান ফিরে এলে রাধা এবং কৃষ্ণ মিলিত হলেন। এরপর বংশীখণ্ডে দেখা যায়, একদা কৃষ্ণবিমুখী রাধা এখন কৃষ্ণপ্রেমব্যাকুলা। কৃষ্ণের বাঁশীর সুর রাধাকে ব্যাকুল করে তোলে। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রাধা বড়াইর সাহায্য প্রার্থনা করলে বড়াই রাধাকে কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করার পরামর্শ দিল। বাঁশীর শোকে কাতর কৃষ্ণ বহু অনুনয় বিনয় করলে রাধা তাঁর কাছ থেকে মিলনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাঁশী ফিরিয়ে দিলেন। সর্বশেষ অংশে 'রাধাবিরহে' বিরহব্যাকুল রাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন। মিলনের পর ক্লান্ত রাধা কৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে নিদ্রিত হলে কৃষ্ণ বড়াইর হাতে তাঁর ভার দিয়ে সেই অবস্থায় তাঁকে পরিত্যাগ করে মথুরা যাত্রা করলেন। এরপরই পুঁথি খণ্ডিত।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা-অংশের বিভিন্ন দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের ও পুরাণের প্রভাব যেমন রয়েছে— তেমনি প্রত্যক্ষভাবে কাহিনীর ধারাবাহিক বর্ণনায় পুরাণ ও লৌকিক সংস্কৃতির সম্মেলনও লক্ষ করা যায়। দানখণ্ড নৌকাখণ্ডকে অনেকেই সম্পূর্ণ লৌকিক উপাখ্যান বলে থাকেন। এগুলি বহু প্রাচীনকাল থেকে লোকমুখে প্রচলিত। স্থায়িত্ব ও জনপ্রিয়তার জোরেই পুরাণ ও সাহিত্যে এগুলি স্থান পেয়েছে। জাতক এবং বৈদিক সাহিত্যেও লোকজীবনের দৈনন্দিনতার স্পর্শে উজ্জ্বল এই ধরনের অনেক গল্প পাওয়া যায় এবং আপাত দৃষ্টিতে অপৌরাণিক উপাদানই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বেশি গৃহীত হয়েছে। জন্মখণ্ডে কবি বেশি প্রভাবিত হয়েছেন ভাগবতের দ্বারা। তবে ভাগবতকে তিনি এই অংশে হুবহু অনুসরণ করেন নি। তার প্রমাণ হলো, ভাগবতে বসুমতী গোরূপ ধারণ করে ব্রহ্মার কাছে নিজের দুঃখ নিবেদন করেছেন। এই কাহিনী কবি পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন। আবার পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতো দুটি সুপ্রচলিত কৃষ্ণলীলাকথার পুরাণ থেকেও কবি সবসময় উপাদান গ্রহণে উৎসাহিত হন নি। সেই কারণে পদ্মপুরাণের রাধা বৃষভানুনন্দিনী হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা সাগর গোয়ালার কন্যা। পদ্মপুরাণে কৃষ্ণ ও রাধার সখাসখীদের নামের বিস্তৃত বর্ণনা থাকলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এদের নামের কোনো উল্লেখ নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের রাধা চন্দ্রাবলী নামটুকু গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের রাধা স্বকীয়া নায়িকা, ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ দিয়েছেন। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা কৃষ্ণের মাতুলানী। আবার ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে রাধার প্রসঙ্গ আদৌ না থাকলেও , পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখেছি রাধাপ্রসঙ্গ বহু প্রাচীনকাল থেকেই লৌকিক সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা কেবলমাত্র পুরাণসম্ভবা নন।

তবুও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রধানত পৌরাণিক অংশ ভাগবত থেকেই নেওয়া হয়েছে। তবে ভাগবতের শারদ রাসের প্রসঙ্গ এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কাহিনী কোনো

পুরাণে নেই। ছত্রখণ্ড ও ভারখণ্ড এই দানলীলারই পোষক আখ্যান। বংশীখণ্ডও প্রচলিত অপৌরাণিক আখ্যান। হারখণ্ড-বাণখণ্ড প্রভৃতিও লৌকিক কাহিনী থেকে নেওয়া বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৃন্দাবনখণ্ডের কাহিনীর আভাস ভাগবতে আছে। সেখানে আছে গোপীদের নিয়ে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ভ্রমণ করছেন। ফুলচুরি, বৃন্দাবনে ক্রীড়া, নৌকালীলা, বাঁশী চুরি, বস্ত্রহরণ ও দানলীলা প্রভৃতি রূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গারভেদ প্রকরণে রয়েছে। এক্ষেত্রে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিচয়ের প্রসঙ্গ না তুলে আমরা বলতে পারি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার এবং উজ্জ্বলনীলমণি রচয়িতা একই সাধারণ উৎস থেকে এই সমস্ত কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। আমাদের অনুমান, এই সাধারণ উৎসটি হলো লোক-কথা।

এ ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীর মধ্যে পূর্ববর্তী শতাব্দী অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবাহিত কৃষ্ণকথার স্তরপরম্পরা লক্ষ করা যায়। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ থেকে কবি তাঁর কাব্যকাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। অগ্নি, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণের কিছু কিছু প্রসঙ্গও চণ্ডীদাসের এই কাব্যে পাওয়া যায়। কবি কৃষ্ণকে পদ্মনাভ , চক্রপাণি, গদাধর, সারঙ্গধর প্রভৃতি নামে সম্বোধন করে পুরাণানুসরণেরই পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কিশোর কৃষ্ণ, স্বাভাবিকভাবেই মনে করিয়ে দেয় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের 'মায়াবালকবিগ্রহঃ' কৃষ্ণকে। কিন্তু এই পুরাণের মতো কবি রাধাকে কৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠা করে রাখেন নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার অপেক্ষা কৃষ্ণ 'বয়সে জ্যেষ্ঠ' । এখানে পুরাণপারঙ্গম কবি সচেতনভাবেই পুরাণকে অস্বীকার করে স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে চেয়েছেন। বাস্তবতার প্রতি এই আকর্ষণ নিঃসন্দেহে লোক-রুচির অনুগ। বংশীধারী কৃষ্ণের মূর্তি বর্ণনায়ও বড়ু চণ্ডীদাসের বিশিষ্ট কবি-মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সদুক্তিকর্ণামৃতের কোনও কোনও পদে এবং গীতগোবিন্দে বংশীবাদনরত কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণের হাতে বাঁশী নেই— এমন কি রাসলীলাতেও নয়। ভাগবতে প্রথম বংশীবাদনরত কৃষ্ণকে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বংশীধারী কৃষ্ণপ্রসঙ্গে প্রাচীন পুরাণ ও লৌকিক কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এই কাব্যে গোচারণের প্রথম থেকেই কৃষ্ণ বেণুবাদনরত তাঁর কাব্যের একটি খণ্ডের নামই বংশীখণ্ড। তাঁর কৃষ্ণের বাঁশী আবার মণি ও স্বর্ণনির্মিত। অবশ্য বংশীর কথা সনাতন গোস্বামী তাঁর ভাগবতের টীকায় উল্লেখ করেছেন। তবে কৃষ্ণের বংশীধ্বনির গীত সম্পর্কে এই কবি যা বলেছেন— কৃষ্ণকথার ইতিহাসে তা অনন্য, একক। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, গীতগোবিন্দ, এমন কি পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যেও এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন কৃষ্ণের ওঁকার ধ্বনিত হতো এবং চতুর্বেদ গীত হতো—

১. হরিষে পুরিআঁ কাহাঞি তাহাত ওঁকার (পৃ-১১৬)

২. ঋগ্ যজু সাম অথর্ব্ব চারী বেদ গাওঁ বাঁশীর সরে। (পৃ-১২৭)

কবি তাঁর কাব্যে কৃষ্ণকথার উপাদান সংগ্রহে নানাবিধ আকর অনুসন্ধান করেছেন — এটি তার অন্যতম উদাহরণ।

চণ্ডীদাস কৃষ্ণের যে প্রসাধন কল্পনা করেছেন তা কিন্তু এক গ্রাম্য গোপকিশোরের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কৃষ্ণের মাথায় ঘোড়া চুল, পায়ে একদা বাংলাদেশে সুপ্রচলিত মগর খাড়ু এবং হাতে বলয়। শুধু তাই নয়, তাঁর রাখালরূপকে সম্পূর্ণতা দানের জন্য বাঁশীর সাথে হাতে লগুড়ও কবি দিয়েছেন। গ্রামীণ সাধারণের রুচিকে পরিতৃপ্ত করার জন্যই কবি কৃষ্ণের এই গ্রাম্যরূপ অঙ্কন করেছেন। নিঃসন্দেহে এটিও কবির লোকমুখিতারই প্রমাণ।

কিন্তু অন্যদিকে আবার এই বড়ু চণ্ডীদাসই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার মহাযোগেশ্বর কৃষ্ণের সাদৃশ্যে তাঁর কৃষ্ণকে বলেছেন 'মহাযোগী' এবং একসময় রাধার প্রণয় নিবেদনের উত্তরেও কৃষ্ণ বলেন 'অহোনিশি

যোগ ধোয়াই' । হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে যোগস্বামী বিষ্ণুর মূর্তিবর্ণনা পাওয়া যায়। ধর্মপূজাবিধানেও কৃষ্ণকে যোগনিদ্রাসমাশ্রিত ও ধ্যায়ী বলা হয়েছে। পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা মহাযোগী কৃষ্ণের দৃষ্টান্ত পাই না। এটিও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ।

কিন্তু একদিকে মহাযোগী কৃষ্ণ এবং অন্যদিকে ঘোড়াচুল, মগর-খাড়ু বলয়পরিহিত, লগুড়ধারী কৃষ্ণ— এই বৈপরীত্য আপাত বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলেও এটিও কবির লোকরুচি পরিতৃপ্ত করার প্রবণতা থেকেই জাত। যুক্তিসিদ্ধ প্রামাণিকতা অথবা রসসিদ্ধ স্বাভাবিকতার চেয়ে ঐশ্বর্যমিশ্রিত বিস্ময়রস এবং গ্রাম্যতা উভয়ই অশিক্ষিত সাধারণের রুচিকে আকৃষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে। লোক-মনস্তত্ত্বের এই সাধারণ সত্যটুকু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির জানা ছিল । তাই কালীয়দমনলীলার কৃষ্ণকে তিনি গরুড়বাহন বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য গীতগোবিন্দেও গরুড় বাহন কৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে।

সব মিলিয়ে বলা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনীতে কোথাও অনন্যতা নেই। কবির মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে আদিরস ও লোক-কথাকে পুরাণের কাঠামোয় ফেলে নতুন স্বাদে উপস্থিত করার মধ্যে। এবং দ্বিধাহীনভাবে আমাদের স্বীকার করতে হবে, পৌরাণিক কাঠামো থাকলেও লোক-কথার সমুজ্জ্বল মদিরা পরিবেশন করাই ছিল এই কবির প্রধান লক্ষ্য।

রবীন্দ্রসাহিত্য-পর্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ

সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যসমালোচনা দুটি ভিন্ন ধরনের কাজ— সংস্কৃত আলঙ্কারিক দু'জাতের প্রতিভার নাম করেছেন 'ভাবয়িত্রী' ও 'কারয়িত্রী' — এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে, তবু কোনো কোনো সময় দেখা যায় তা একই ব্যক্তির মধ্যে অবস্থান করছে— বড়ো কবি তাই বড়ো সমালোচক হতেও পারেন — যেমন বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথও ক্রান্তদর্শী কবিমনীষী । তাই সাহিত্যের এই দুই বিভাগেই তাঁর অবারিত পরিক্রমা।

সাহিত্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্য সমালোচনায় অসাধারণ পরিচয় দেন নি, তিনি নিজের লেখারও সম্যক আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধনিবন্ধ, চিঠিপত্র, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনী এবং কিছু কিছু আলোচনায় তাঁর সাহিত্য সমালোচনার পরিচয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তার কিছু অংশ সংগ্রহ করে আমরা তাঁর নিজের দৃষ্টি দিয়ে তাঁর সাহিত্য আলোচনার চেষ্টা করেছি। বহু বিচিত্র ও বিস্তৃত রবীন্দ্ররচনার ক্ষেত্র-তাই সবটুকুকে একত্রে ধরে দেওয়া অসম্ভবজ্ঞানে আমরা তাঁর একখানি কাব্য ও একটি নাটক নিয়ে তাঁর আলোচনার মূল্যায়ন করতে চাই— কাব্যটি 'বলাকা' নাটকখানি ' রাজা ও রানী'।

রবীন্দ্রনাথের এই স্বসাহিত্যপর্যালোচনা— উক্ত কাব্য বা নাটক সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা এমন কথা আমরা বলি না কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো এমন বিশাল প্রতিভাধর এক স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য সন্ধানে তাঁর নিজের আলোচনাটি বিশেষ মূল্যবান তাতে আমাদের সংশয় নেই। লেখকের নিজস্ব বক্তব্য থেকে তাঁর রচনার নেপথ্যজগতের অনেক সংবাদ পাওয়া সম্ভব যা তাঁর সাহিত্য বোঝার কাজে আমাদের অনেক সময়েই সাহায্য করে।

রবীন্দ্র-উত্তর এবং প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের বাংলা কবিতা : একটি রূপরেখা

সুমিতা চক্রবর্তী

বলা হয়ে থাকে যে রবীন্দ্র-উত্তর প্রথম কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কথাটি খুব ভুল নয়। মোটের উপর ১৯৩০ সালের আশপাশ থেকে আধুনিক বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র চিহ্নগুলি পরিস্ফুট হলো বলে মনে করি আমরা। সেই নবীনতার কিছু মুদ্রা রবীন্দ্রকাব্যে লক্ষিত হয়েছে অন্তত দশ বছর কাল।

কেন ১৯৩০-এর কাছাকাছি সময়টিকে নবীন কবিতার প্রারম্ভকাল বলে মনে করি তা বলা দরকার।

বিশ শতকের একেবারে গোড়া থেকেই বিপ্লবী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাবের বিরোধিতার সূত্রে মানুষের মনে জমে উঠেছিল ক্ষোভ আর উত্তেজনা। প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) পৃথিবীর সর্বত্রই বহু লালিত-বিশ্বাস আর মানসিক আশ্রয়ের কেন্দ্রগুলিকে ভেঙে দিল। রুশ বিপ্লবের ফলে মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব সম্পর্কিত পুরোনো ধারণাগুলিতে লাগল সংশয়ের কম্পন। যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপীয় সাহিত্য দেখাল এক মর্মান্তিক ভাঙনের ছবি।

যে-কবিরা লিখতে শুরু করেছিলেন ১৯১৫-১৬ থেকে ১৯২৫-২৬ এর মধ্যে, তাঁদের লেখাতেও কোথাও কোথাও দেখা গেল স্বতন্ত্র ভাবনার ছাপ। সত্যেন্দ্রনাথের সমতাপন্থী রাজনীতি-ভাবনায়, বস্তুর সৌন্দর্যে এবং তুচ্ছ আপাত-অসুন্দরের রূপে মুগ্ধ হবার প্রেরণায়; মোহিতলালের পরুষ কর্কশতার কবিতা-রূপে, ভোগভাবনার প্রবলতায়, দুঃখবোধ মিশ্রিত সত্য উপলব্ধির স্পষ্টতায়; যতীন্দ্রনাথের দুঃখ-দর্শনে ও বাস্তবের ছবি আঁকায়; নজরুলের সাম্যভাবনা, মানবিকতা ও রাজনীতি বোধের বিদ্রোহাত্মক উচ্চারণে সেই নবীনের উদ্বোধন।

বিশেষভাবে সাহিত্যের পশ্চিমী আধুনিকতার প্রতি সচেতন দৃষ্টি, বিশ্ববোধ আর যুদ্ধোত্তর সংশয়াকীর্ণ জীবনচেতনা নিয়ে দেখা দিলেন আধুনিক কবিরা। ১৯২৭ সালের 'প্রগতি' পত্রিকা, ১৯৩১-এর 'পরিচয়' পত্রিকায় সেই আধুনিকতার প্রথম নিশান উড়ল। তারপর এক দশক ধরে বাংলা কবিতায় জীবন উপলব্ধির বিভিন্ন স্তরে নতুন যুগের ভাবনা ও রূপ-প্রকরণের স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কিন্তু ফ্যাসিবাদের উত্থান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ের চাপ—এই সব একত্রে মিলে ১৯৩৭-৩৮ সাল থেকে বাংলা কবিতার আধুনিকতার ভাবনায় এসেছে আরো এক পট-পরিবর্তন। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী, সমাজমনস্ক, সর্ব-অর্থে শোষণের প্রতিবাদে — সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকবাদের প্রতিবাদে উদ্দীপ্ত কবিতার স্রোত এসেছে বাংলা সাহিত্যে।

খুব সংক্ষেপে হলেও ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ এই সতেরো বছরে বাংলা কবিতায় এসেছে এই দুটি তরঙ্গ। তাদের মধ্যে মিল আছে। অমিলও প্রচুর। তার মধ্যে নবীনের উদ্ভাবন আছে, পরম্পরার স্বীকৃতিও দুর্লক্ষ নয়। এই বিমিশ্র ছবিটিই তুলে ধরা হবে আলোচনায়।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা : তার প্রাসঙ্গিকতা

সুগতা সেন

ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার স্বরূপটি আজ যে আমরা সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করি তা আধুনিক ভারতীয় রেনেসাঁসের ফল। আর সেই রেনেসাঁসের (তা পূর্ণ না খণ্ডিত সে প্রশ্ন আলাদা) True Child হলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিই নন, এক অর্থে তিনি এর শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাও বটে। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের পীঠস্থান যেমন ইতালি, ভারতীয় রেনেসাঁসের জন্মভূমি তেমনি অবিভক্ত বাংলাদেশ। সেই অনুষঙ্গে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ একাধারে আমাদের পেত্রার্ক ও দ্য ভিঞ্চি যুগপ্রবর্তক ও যুগপ্রতীক।

আধুনিক ভারতীয় রেনেসাঁসের অভ্যুত্থান রবীন্দ্রজন্মের বহুপূর্বে রামমোহনের সময়ে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য আরও বহু মনীষীর সঙ্গে ঠাকুর পরিবারও এই নবজাগরণ, ধর্মীয়-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। জাতীয় অভ্যুত্থানের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে জন্মালেন রবীন্দ্রনাথ, যেন ইতিহাসেরই অভিপ্রায়, নবজাগ্রত দেশ সেদিন রেনেসাঁসের নিয়ম অনুসারেই আত্মোপলব্ধির নতুন আলোয় নতুন পথের সন্ধানে উৎসুক। কিন্তু পথনির্বাচনে সমস্যা ঘটে; বাধে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাবাদর্শের দ্বন্দ্ব, নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব। রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ ফসল রবীন্দ্রনাথ সেদিন নবজাগরণের সমস্ত বাণীকে আত্মস্থ করে নিয়েই দ্বন্দ্ব নিরসনের ভার নিলেন, — দেশকে যথার্থ পথের নির্দেশ দিলেন। দেশ তাঁকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে প্রণোদনা দিয়েছিল, তিনি দেশকে ফিরিয়ে দিলেন তার অনেক বেশি—

সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং রবিঃ।

সেকারণেই তাঁকে একাধারে রেনেসাঁসের সৃষ্টি ও স্রষ্টা বললে অত্যুক্তি হয় না। সর্বপ্রকার স্বাধীনতার পিছনে যে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা আবশ্যিক একথা কবি মানতেন; এবং আমাদের গ্রামপ্রধান দেশে গ্রামীণ ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন বিনা যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভব নয়, এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তিনি ছিলেন একমত। আর সেই উন্নতিতে পল্লীশিক্ষার প্রয়োজনও তিনি জানতেন। অন্যদিকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সমবায় পদ্ধতি এই দুটির মধ্যে পল্লীপ্রধান ভারতীয় সমাজের স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পথ দেখেছিলেন তিনি। শিলাইদহ পতিসরে থাকতেই তিনি কৃষিব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি চালু করেন। পরে তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়ে চলে এল বীরভূমের প্রান্তরে। বিশেষ করে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য তিনি শান্তিনিকেতনের পাশে শ্রীনিকেতনে পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করলেন (১৯২৩)। সেখানে কৃষি, গোপালন, মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগি-মৌমাছি পালন থেকে শুরু করে বহুবিধ কুটিরশিল্প শিক্ষা ও প্রসারের ব্যবস্থা করেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র ছাত্রীরাও শ্রীনিকেতনে গিয়ে এইসব কুটিরশিল্পের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। শ্রীনিকেতনেও নির্ভরতা শিক্ষার জন্য একটি অবৈতনিক, আবাসিক স্কুল করেছিলেন 'শিক্ষাসত্র' নামে। ছাত্রদের মধ্যে ব্যবসায়িক বুদ্ধি জাগানোর জন্য 'আনন্দবাজার' উৎসব প্রবর্তন করেন সেখানে ছাত্ররা নিজেদের তৈরি শিল্পদ্রব্য বিক্রি করতেন। আবার সেই লভ্যাংশ সেবাবিভাগের মাধ্যমে আর্ত-দরিদ্রের সেবায় ব্যবহৃত হতো। বস্তুত 'শ্রীনিকেতন' নামটির মধ্যেই পল্লীজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটিয়ে এই শ্রীহীন দেশে লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আনার সংকল্প ব্যক্ত হয়েছে। আর কর্মনায়ক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ ধরা আছে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের প্রাঙ্গণে। এদিক দিয়ে বিচার করলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে অনন্যসাধারণ লোকগুরু বলেও স্বীকার করতে হবে।

কিন্তু সর্বোপরি এ কথাটি অবশ্যস্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত স্বজাতিক ও স্বাদেশিক কর্ম চিন্তায় তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর বিশ্বের দিকে। কুটিরশিল্পের উন্নতি ছাড়া দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রসরণ সম্ভব নয় জেনেও পশ্চিমী যন্ত্র সভ্যতার সুফল গ্রহণে তিনি পিছ-পা ছিলেন না। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রযুক্তি বিদ্যাকেও তিনি সমাদর জানিয়েছিলেন। এখানেই গান্ধীর সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটেছে কিন্তু এখানেই তিনি আধুনিক এবং আন্তর্জাতিক। জাতীয়তাবোধের গভীর থেকে তাঁর আন্তর্জাতিকতাবোধের উন্মেষ; কেননা তাঁর আন্তর্জাতিকতা বিশ্বমুখী ভারতপথেরই নামান্তর। স্ব-জাতীয় বিজাতীয় নির্বিশেষে আজ আমাদের খাওয়া-পরা-চলা-ফেরা সমস্তই সমস্তের যোগে— এই inter dependence (আত্মনির্ভরতা) এর বাণী তো ভারতপথেরই বাণী—'দিবে আর নিবে, মিলাবে, মিলিবে'। মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায় মানবমিলনের যে পথ ভারতপথিকেরা বলে গেছেন, সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালা খুললেন বোলপুরের প্রান্তরে 'বিশ্বভারতী'তে। বললেন 'স্বজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে— ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।'

কবি বললেন ধর্ম একটাই — সে মানুষের ধর্ম। আহ্বান করলেন সেই মহামানবকে যিনি বিশ্বমানবসত্তার প্রতীক —The Man।

তাঁর স্বপ্নকে রূপদানের চেষ্টা দেখা যায় বর্তমান রাষ্ট্রসংঘের পরিকল্পনায়। আজ বিশ্বজোড়া যে inter dependence-এর চিত্র, সমস্ত পৃথিবীর যোগে সমস্ত পৃথিবীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে সৎপ্রচেষ্টা, সেই globalisation এর আদর্শ তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতারই পরিচয় মেলে। সমগ্র ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক রবীন্দ্রনাথ দেশ কাল ছাপিয়ে সমগ্র পৃথিবীর জন্যে পথনির্দেশ করেছেন। রামমোহনকে তিনি বলেছেন 'আধুনিক' কেননা তাঁর কাল অতীতে, অনাগতে পরিব্যাপ্ত। সেই অর্থে তিনিও অতি আধুনিক— পশ্চিম তাঁকে Poet, Philosopher এর সঙ্গে prophet বলে স্বীকার করেছে। যত দিন যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ততই অপরিহার্য বলে গণ্য হচ্ছেন। আগামী শতকে তিনি বড়োই প্রয়োজনীয়-অতিপ্রাসঙ্গিক ও অতি-আধুনিক ।

সাহিত্যের ইতিহাস থেকে সাহিত্যেতিহাস

স্বপন মজুমদার

সাহিত্য আর ইতিহাসের সংলগ্নতা যেমন, তেমনি তাদের স্বতন্ত্রতা আরিস্ততল বা কহ্লনের কাল থেকেই তাত্ত্বিকদের ভাবিয়েছে। সাহিত্য ও ইতিহাস : দুয়েরই অন্যতম অবলম্বন আখ্যান। তবে ঘটনার কালানুক্রমিক বিবরণ বা বিবৃতির মধ্য দিয়ে গ'ড়ে উঠেছে ইতিহাস, আর ঘটনার কল্পিত হ'লেও — ভাষ্য বা ব্যাখ্যান পেয়েছি আমরা সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ বলবেন, তথ্য ইতিহাসের , সত্য সাহিত্যের সামগ্রী।

সাহিত্যের ইতিহাসে তাহ'লে এ-দুয়ের অনুপাত কেমন হবে তাই নিয়েই তর্ক দেখা দিয়েছে সম্প্রতি। প্রচলিত সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষপাত ছিল সাহিত্য-ঘটনার— লেখকের জন্ম-মৃত্যু বা গ্রন্থপ্রকাশ পরম্পরা সংগ্রন্থন করার দিকে। আর নবীন সাহিত্যেতিহাসের প্রবণতা সৃষ্টির অন্তর্গূঢ় কার্যকারণ সন্ধানের

প্রতি। সেই কারণেই অন্যান্য সৃজনশিল্পও অনায়াসে চলে আসে প্রতিতুলনায়।

প্রচলিত সাহিত্যের ইতিহাস সাহিত্যকে অন্যান্য প্রকাশশিল্প থেকে শুধু যে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখেছে তাই-ই নয়, তার অভিধাক্ষেত্রকেও নিতান্ত সংকীর্ণ ক'রে তুলেছিল শুধুমাত্র পাণ্ডুপুঁথি আর মুদ্রিতগ্রন্থের মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ ক'রে রেখে। অন্যদিকে নবীন সাহিত্যেতিহাস মুখাপেক্ষী থাকে বিচিত্রবিদ্যার বিস্তৃত পরিসরে কোনো লেখা বা লেখককে প্রতিস্থাপন ক'রে দেখতে। সাহিত্যের ইতিহাস তাই যতটা নিশ্চিত নির্ণয়ের বোধ থেকে লেখা হ'তে পারত, সাহিত্যেতিহাস ততটাই সম্ভাবনার সন্ধান দেয়। সাহিত্যের ইতিহাস যেখানে এক বা একাধিক সাহিত্য-বর্গের রৈখিক ও ক্রমিক ইতিহাস জানায়, সাহিত্যেতিহাস তাদের পারস্পরিক জটিল বিন্যাস ও নিয়ত পরিবর্তন স্থানাঙ্ক বিষয়ে আমাদের সচেতন করে।

সাহিত্যের ইতিহাসে যুগকে একক ধ'রে যে-যুগবিভাগ করা হ'ত, সেখানে ভাবনার প্রবহমানতা উপেক্ষিত হয়েছে নিয়ত। এই যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করার জন্যই সময়কে মাত্রা হিসেবে ধরা হয়েছে সাহিত্যেতিহাসে, ভাবনা দিয়ে পর্ব চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়নি। সময়বদ্ধও সময়মুক্ত দুইভাবেই তবে সাহিত্যের পরিচয় ধরা পড়তে পারে এই নবীন প্রস্থানে। পরম্পরা জানতে এ-ক্ষেত্রে আমাদের সবথেকে উপযোগী হতে পারে প্রতিগ্রহণতত্ত্ব। কখনো কোনো লেখ বা লেখক, কখনো কোনো বিশেষ সাহিত্যধারা বা ভাষা-সাহিত্য, কখনো-বা জাতি বা দেশের ক্রমব্যাপ্ত বলয়ে ধরা পড়তে পারে এই প্রতিগ্রহণের স্বরূপ। সময় ও উপাদানের তারতম্যে নির্ধারিণ করতে হবে এই বিবরণ বা বিবৃতির বয়ান। আর স্বাভাবিকভাবেই, এক যুগ থেকে অন্য যুগের বয়ানে আসবে ভিন্নতা। সাহিত্যেতিহাস পরম্পরার মধ্যে সেই বৈচিত্র্যের সন্ধান করে, বৈচিত্র্য বিলোপ করতে চায়না!

সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রকাব্য

স্বরূপকুমার যশ

কবিকুলচূড়ামণি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃজন ক্ষেত্রে প্রথমত এবং শেষপর্যন্ত মনে-প্রাণে কবি। তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা আবর্তিত হয়েছে তাঁর বিশিষ্ট কবিপ্রকৃতিকে ঘিরেই। তাঁর এই বিশিষ্ট কবিপ্রকৃতি গড়ে উঠেছে বাঙালি সংস্কৃতির বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপটে। তাছাড়া সংস্কৃতি যে কোনো শিল্পীর জীবনদর্শনের এক অনিবার্য প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাই আমাদের শত শত বৎসরের বয়ে আসা অতীত জীবন বা ইতিহাসকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

বৌদ্ধ সংস্কৃতি একদিকে কবি-মানসে মুক্তির ধারণা গড়ে তুলেছে, সেই মুক্তির জগতে নেই সীমাবদ্ধতা স্বার্থপরতা, নেই সাম্প্রদায়িকতা ও অস্পৃশ্যতার বেড়াজাল। 'অভিসার', 'কুয়োর ধারে', 'শুচি' প্রভৃতি কবিতায় তারই প্রভাব। অন্যদিকে এই সংস্কৃতির স্পর্শে আমাদের দেশে ত্যাগ-সেবা-ভক্তির যে নবরূপ দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ সেই অমৃতরূপের সন্ধান দিলেন 'কথা' কাব্যের 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা', 'নগরলক্ষ্মী', 'মস্তক বিক্রয়', 'মূল্যপ্রাপ্তি' প্রভৃতি কবিতায়।

রবীন্দ্রমানসে উপনিষদের প্রভাব যে কত গভীর তা আমাদের কারও অজানা নয়। ঠাকুর পরিবারের ঔপনিষদিক আবহাওয়ায় শৈশব থেকে উপনিষদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। কবির

সত্যদর্শনের পথ বৈদিক কবিদের পথেরই যে অনুরূপ তা 'বিচিত্রা'র 'দান' কবিতা থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। অবশ্য কখনও কখনও এই সত্য উপলব্ধি কবির নিজস্ব চিত্তধর্ম থেকে অনুভূত বা জাত। তাই দেখা যায় উপনিষদের কথার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের কথা বলার প্রয়াস।

বাংলার কৃষিনির্ভর সমাজ-জীবনে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন রূপের অভিব্যক্তি রবীন্দ্রকাব্যে অনায়াসে লক্ষণীয়। নদীবক্ষে ব্যবহৃত সারিগানও যে তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ উপলক্ষে 'নদী' নামে ছোট্টো পুস্তিকা পাঠে। 'পূরবী' ও 'মহুয়া'তেও সারিগানের উল্লেখ আছে। লৌকিক ধর্মাচারণে গ্রামজীবনের মেয়েলি ব্রতের খুঁটিনাটি অনুষ্ঠানের উপর তাঁর মমত্ববোধের পরিচয়—' শিশুকালে /নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে/ আমারে মাগিয়া লবে বর। ' ('স্বর্গ হইতে বিদায়'— চিত্রা)। বাংলার লোকউৎসবে স্নানযাত্রার মেলার সুনিপুণ ছবি অঙ্কনও করেছেন ('সুখ-দুঃখ'-ক্ষণিকা)। গ্রামবাংলার প্রাচীন রামযাত্রার বর্ণনা আমাদের শৈশব থেকেই পরিচিত—' আমাকে মা শিখিয়ে দিবি/ রামযাত্রার গান,/ মাথায় বেঁধে দিবি চূড়ো,/ হাতে ধনুক বাণ।'

ঠাকুর পরিবারে শান্ত সমাহিত উপনিষদিক ও প্রাক্‌পৌরাণিককালের ভারতীয় চিন্তা ভাবনার সঙ্গে অস্তায়মান এদেশীয় মুসলমানী সংস্কৃতির বহিরঙ্গ ভব্যতা ও শালীনতার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। এই ইসলামী সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির ও স্থাপত্যের দিকচিহ্নস্বরূপ প্রকাশ— 'অঙ্গধরি সে অনঙ্গস্মৃতি/ বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি।' ('তাজমহল'-বলাকা) রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক দ্বৈতবোধের সঙ্গে মধ্যযুগীয় সন্ত-সাধক কবীর, দাদু, রজ্জব, নানক, রবিদাস প্রভৃতিদের মনোভাবের সাদৃশ্য রয়েছে। 'উৎসর্গ'-এর বিখ্যাত কবিতা 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে'র সঙ্গে দাদুর 'বাস কহৈ হোঁ ফুল পাঁউ'—এর আশ্চর্য সাধর্মগত মিল পাওয়া যায়। 'মানসী'র বেশ কয়েকটি কবিতায় (সিন্ধুতরঙ্গ, নিষ্ঠুর সৃষ্টি, মরণ স্বপ্ন) এই সংশয়ী চিত্তের প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছে। এই ভাবনাই রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ে মানবতাবোধ ও অধ্যাত্মবোধে মিশে গেছে।

রবীন্দ্র কাব্যজগতে শুধু 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তেই নয়, তাঁর উত্তর-কালের কাব্যেও বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরণন শোনা যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর রূপ ও ভাবের গভীরতা, অনায়াস গতি তাঁর হৃদয়ে নতুন প্রেরণা এনেছে। সমগ্র মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সাহিত্যকে যে রাধাকৃষ্ণলীলা আপ্লুত করে রেখেছিল, যার প্রভাবে বাঙালির অস্তিত্ব সেদিন বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেল, সেই বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রভাব তাঁর মধ্যে প্রবল। বৈষ্ণব পদাবলীর মধুর বাৎসল্য রসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা ও রহস্য যুক্ত হয়ে কাব্যরূপ লাভ করেছে 'শিশু' কাব্যটি। মানুষের এই ক্ষুদ্র তুচ্ছ সংসারেই যে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত সেকথা অতি সহজভাবে ব্যক্ত করেছেন 'সোনার তরী' ও ' চৈতালী'তে। সহজিয়া বৈষ্ণবদের মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও মানুষের মধ্যেই দেবতার অবস্থান, এসব ভাবনা তাঁর মধ্যেও সুস্পষ্ট। সেইসঙ্গে বাংলার বাউলদের 'মনের মানুষের' অন্বেষণ কবিহৃদয়ে সাড়া জাগিয়েছিল। গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে/ আমার মনের মানুষ যে রে। ' গানে কবি উপলব্ধি করেছেন যে মানুষ নিজের ও বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে দিয়ে সেই পরম মনের মানুষের সন্ধান করে ফিরছে। বাউলদের মনের মানুষকে তিনিও অন্তরের মাঝে খুঁজে পেয়েছেন— 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে/ দেখতে আমি পাইনি। ' (৯২ সংখ্যক কবিতা-গীতাঞ্জলি)।

কবির কাব্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে শতদল হয়ে ফুটে আছে সুমহান ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। তাঁর কাব্য ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট গুণাবলীর আশ্রয়ে বিশ্বসভায় নন্দিত হয়েছে, তিনি আমাদের গর্ব। সকল বিভেদের মধ্যে স্বকীয়তা বজায় রেখেও যে ঐক্য স্থাপন করা যায় তা তিনি বারে

বারে ব্যক্ত করেছেন।এছাড়া মানসীর — 'দুরন্ত আশা', 'বঙ্গবীর', 'গুরুগোবিন্দ' প্রভৃতি কবিতায় আমাদের মেরুদন্ডহীন কৃত্রিম পরাশ্রয়ী জীবনযাপনকে তিনি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। অন্যদিকে 'মানসী' (মেঘদূত, একাল ও সেকাল, অহল্যার প্রতি), 'কল্পনা' (স্বপ্ন , বর্ষামঙ্গল) ও 'কাহিনী'র (কর্ণকুন্তিসংবাদ, গান্ধারীর আবেদন) বেশ কিছু কবিতায় আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি— কালিদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, রামায়ণ-মহাভারত, সেকালের মানুষ, তখনকার ভাস্কর্য সবই বর্তমানের পর্দায় প্রতিবিম্বিত করেছেন এবং সেই সঙ্গে বর্তমানের সীমাবদ্ধ জীবনের যন্ত্রণা তিনি অনুভব করেন। 'চৈতালী' থেকে এই ঐতিহ্যভাবনার স্বরূপ একটু অন্যরকম। তিনি প্রাচীন তপোবন আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

ধর্মানুভূতি সংস্কৃতির আর একটি প্রকোষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের মতো মানবতাবাদী কবির কাছে ধর্ম কোনো প্রচলিত সংস্কার বা মোহ নয়, তা হলো আত্মবিশ্লেষণ । সকল বিরোধের অবসান ঘটে। আমার যথার্থ মুক্তি ঘটে শুভবুদ্ধির সাহায্যে, সংকীর্ণতায় নয়।তাই ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানগত আনুগত্য প্রবল হয়ে উঠলে তিনি সেখান থেকে সরে এলেন। শাস্ত্রানুশাসনের চিরাচরিত পথ মুক্তমানুষের পথ নয় জেনে তিনি বাউলদের অনুষ্ঠানহীন ধর্মের পথে সত্যের অনুধ্যান করেছেন। তাঁর কাছে মানবপ্রেমই সকলধর্মের মর্মকথা —' তাই তোমার আনন্দ আমার পর/ তুমি তাই এসেছ নিচে।' (১২১ সংখ্যক কবিতা-গীতাঞ্জলি) ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বা প্রাণহীন দেবালয়ে দেবতাকে পাওয়া যায় না। তাই মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত পুণ্য - লোভীর উদ্দেশে কবির কটাক্ষ—' অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে/কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে।' (১১৯ সংখ্যক-গীতাঞ্জলি)। আপন অন্তরে যাঁর অবস্থান, বাইরের বস্তুজগতে তাকে খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন—' কাজ কি আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়/পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়।' (৮১ সংখ্যক -গীতিমাল্য)। তাই মধ্যযুগের ধর্মীয় আচার সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন গীতালি (৯৯ সংখ্যক) , পত্রপুট (২০ সংখ্যক), পুনশ্চ (শুচি, স্নানসমাপন) প্রভৃতি কাব্যের কবিতায়। দেবতার সাম্প্রদায়িক রূপ মানুষে মানুষে মিলনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, বিশ্বমানবতা হয় খন্ডিত ; সেজন্য মধ্যযুগের সন্তেরা এই ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সত্যের পথে মানুষের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁদের সুরে সুর মিলিয়েই সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের— ' যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে/ ভাঙো ভাঙো , আজি ভাঙো তাতে নিঃশেষে— ' (ধর্মমোহ— পরিশেষ)। আরও নিদর্শন আছে— পুনশ্চের খৃষ্ট, বড়দিন, মানবপুত্র কবিতায় মানবতাবাদী কবি মানুষের মধ্যে বিভেদসৃষ্টিকারী ধর্মকে কোনোদিন গ্রহণ করতে পারেননি। তাই তাঁর জীবনদেবতা কোনোদিন প্রচলিত ধর্মীয় রূপের গণ্ডীতে আবদ্ধ হননি।

সর্বধর্মসমন্বয়কারী মুক্ত জীবনাদর্শের পথিক রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান, ভাব ও কর্মসাধনা প্রাত্যহিক জীবনের কুশ্রীতা ও মালিন্য থেকে মুক্ত করে বাংলার সংস্কৃতিকে ভারত তথা বিশ্বের দরবারে একদিন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে । জীবন থেকে আনন্দ সঞ্চয় করে মানুষ হবে আত্মপ্রতিষ্ঠ, সংস্কৃতিবান । কারণ মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অপার বিশ্বাস।

গড় শ্রীখন্ড : পদ্মা ও মনসা

সুমনা পুরকায়স্থ

'গড় শ্রীখন্ড' উপন্যাসের আলোচনায় প্রথমেই বলতে হয় এই উপন্যাসটি ঠিক আক্ষরিক অর্থে পদ্মাপারের বৃত্তান্ত নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন ধরনের জীবিকা নিয়ে এই উপন্যাসে এসেছে, যেমন— জমিদার, কৃষক ও ব্রাত্য শ্রেণী। যে উপন্যাসের পটভূমি রচিত হয়েছে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দেশবিভাগকে আশ্রয় করে সেখানে সমস্যা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় এই উপন্যাসে Protagonist চরিত্র সৃষ্টির সুযোগ থাকলেও শেষ পর্যন্ত কোনো চরিত্রই প্রাধান্য পায় নি। একমাত্র পদ্মাই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। এই স্বল্প পরিসরে পদ্মার সামগ্রিক আলোচনা সম্ভব নয়, সুতরাং মনসামঙ্গলের মনসার সঙ্গে পদ্মার সম্পর্কটুকু দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়টিকে তিনটি স্তরে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। প্রথমত পদ্মার নিজস্ব স্বভাব ধর্মের সঙ্গে মনসার রূপগত সাদৃশ্য দেখানো, দ্বিতীয়ত একটি নারী চরিত্রকে আশ্রয় করে মনসামঙ্গলের কাহিনী রূপকাকারে কীভাবে এসেছে ও তৃতীয়ত উপন্যাসের বক্তব্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে কীভাবে পদ্মা ও মনসা এক হয়ে যাচ্ছে। সেটাই আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমে লক্ষ করা যেতে পারে উপন্যাসে পদ্মার ভাঙা-গড়ার রূপ বার বার চোখে পড়ছে। সেটা কখনো কখনো প্রবাদ প্রবচনের মধ্য দিয়েও দেখা যাচ্ছে। পদ্মার প্লাবনের কালে কখনো বা কারো জমি ও সর্বস্ব ভেসে যাচ্ছে, আর যার প্রতি পদ্মা সুপ্রসন্ন তার ভাগ্যে নতুন চর জেগে উঠছে। এই উপন্যাসের সান্যালমশাই এমনি ভাগ্যবান এক চরিত্র। তার প্রায় তিন'শ বিঘা খাস জমি সোনা ফলার মতো উর্বর হয়েছে। আর পদ্মা যখন সান্যালদের প্রতি প্রসন্ন, তখন দেখা যাচ্ছে দাদপুর গ্রামের লোকরা চলে আসছে বুধে ডাঙায়, জলমগ্ন হয়েছে দাদপুর। পদ্মা যে অহরহ তার এপার কিংবা ওপার ভেঙে হাত বদল করে চলেছে, বা জাগিয়ে তুলছে চর তার বর্ণনা বহুবার এসেছে উপন্যাসে। পদ্মার এই রূপের সঙ্গে মনসার একটা সাদৃশ্য করা যেতে পারে। কিয়া পাতে যে কেতকাসুন্দরীর জন্ম হয়েছিল তার আর এক নাম পদ্মা। দেবী কেতকীর প্রচন্ড রোষ এবং প্রসন্ন দৃষ্টি— একদিকে বিষনয়ন ও অন্যদিকে অমৃত নয়ান। কখনো বা 'বিষনয়ান এড়ি অমৃত নয়ানে চান' আবার কখনো 'অমৃতনয়ান এড়ি বিষনয়ানে চান' তিনি। পদ্মাও তেমনি কারো জীবনে অভিশাপ আবার কারো জীবনে আশীর্বাদ।

আলোচ্য উপন্যাসের পদ্ম চরিত্রটির মধ্য দিয়ে পদ্মা ও মনসা এক হয়ে গেছে। অর্থাৎ পদ্ম, পদ্মা ও মনসা যে এক বা অভিন্ন তা লক্ষ করা যেতে পারে।

আলোচ্য উপন্যাসে পদ্ম ও পদ্মাকে দিয়ে রূপক তৈরি হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে ছলাকলা, প্রতিশোধস্পৃহা অথচ আকণ্ঠ ভালোবাসা নিয়ে পদ্মার যে নারীরূপ এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে সেখানেই পদ্ম ও পদ্মা এক হয়ে গেছে।

এই পদ্ম বা পদ্মার সঙ্গে মনসার সম্পর্ক উপন্যাসের মূল বক্তব্যের স্তরেও খুঁজে পাওয়া যায়।

যে প্রেমের শক্তি পদ্মার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে তার উৎস সন্ধানে দেবী মনসাকেই খুঁজতে হয়। অমিয়ভূষণ একটি প্রবন্ধে 'গড় শ্রীখন্ড' আলোচনা প্রসঙ্গে মনসা সম্পর্কে তার যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তার অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হলো,—

'... মনসা জিনিসটাকে আমি যা বুঝেছি ইংরেজিতে তাকে তোমরা লিবিডো (Libido)

বলো , মনসা হলো সেই দেবী কুলকুণ্ডলিনী সর্পমুখ্য দেবী। তাকে জাগ্রত করে মাথায় পিটুইটারি গ্লাণ্ডে নিয়ে যাওয়া যোগে ধর্ম। এই জিনিসটা সহজ করে বোঝাবার জন্য কাব্যটা লেখা হয়েছিল।··· আদিযোগী মহাদেবের একবার মনে হলো, আমি পদ্ম বনে খেলা করব। পদ্ম বন কোথায়? আমাদের শরীরে ছটা পদ্মবন আছে। উনি পদ্মবনে নামলেন, নামতে নামতে তিনি একেবারে যেখানে কুলকুণ্ডলিনীর অধিষ্ঠান, সেখানে নেমে গেলেন। সেখানেই মনসার সঙ্গে দেখা। তিনি মনসাকে নিয়ে উঠছেন। সেই যে বিষময়ী লিবিডো তাকে জ্ঞান দেবার জন্য উঠছেন। সেজন্য মনসার ব্যাখ্যা করেছি লিবিডো কিন্তু Unconscious তো, মনের অংশেই যেন মনসা। সেজন্যই তিনি শিবের আত্মজা। তার মানে Libido is part of mind, super ego is part of mind। সেজন্যই আত্মজা। আমাদের শরীরের ওই যে বিষ ··· কাম, ক্রোধ, হিংসা — এই সমস্তর যে মূল শক্তি — Libido, যেটা নষ্ট করলে একটা মানুষ যুবক হয় না ··· একটা মেয়ে যুবতী হয় না। তাকে বলছি, মা তুমি সামনে এসো। তিনি প্রথম বিষহারিনী। এই পুজো হচ্ছে বাঙালির পুজো। একটা বাঙালির সমন্বয়ের পুজো। হিন্দু-মুসলমান-যোগী মিলে একটা সমন্বয় গঠিত হয়েছে। এই মনসার থেকেই পদ্মা। ওই পদ্মা-পদ্মিনী নদী বাংলাদেশের প্রাণ। সেই পদ্মিনী, মনসা— সব এক। ··· পদ্মা বাঙালির জিনিয়াসের সিম্বল। জিনিয়াস বলতে জাতির গভীরতম সত্তা— তার সিম্বল পদ্মা। পদ্মা নেই তো বাঙালি নেই। পদ্মা যেখানে সেখানে পদ্মাদেবীও আছে ··· '

রামচন্দ্র এই মনসাকেই উপেক্ষা করে আত্মরক্ষার পথ খুঁজেছিলেন। তাই তার নিস্তার নেই। তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে পদ্ম, পদ্মা তথা মনসার কাছে।

উপন্যাসের উপসংহারে পদ্মার ভয়াবহ প্লাবনে যে প্রলয়ের ইঙ্গিত সেখানে নিষ্ঠুর প্রকৃতির কাছে আর্ত মানবের আশ্রয় ভিক্ষার চিরন্তন মিথটি ব্যঞ্জনা পেয়েছে। এখানেও মনসার মিথকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। লেখক তাই বলেন, '··· সেই প্রার্থনা কার কাছে? দয়া কে করবে? সেই পদ্মাকে , নিজের মনসাকে , বাঙালি তার প্রাণশক্তিকেই প্রার্থনা করেছে। এইটা হচ্ছে আসল। এই যে একটা কৌম, এই মিথ যেখান থেকে তৈরি হয়ে উঠেছে, গল্পটা সেই শিকড় থেকে এসেছে ।···'

সব শেষে একথাই বলব, অমিয়ভূষণের সমস্ত উপন্যাসগুলিতে এই শিকড় বা root -এর সন্ধান তাকে একটা স্থির বিশ্বাসের ভূমিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। 'গড় শ্রীখন্ড'ও তার ব্যতিক্রম নয়। আর এখানেই পদ্মা আর মনসা এক হয়ে যায়।

মধুসূদনের মহাকাব্যের নায়ক

সুস্মিতা সোম

হাসপাতালের জীর্ণ শয্যায় ' মেঘনাদবধ' নামে একখানি সদ্য প্রকাশিত কাব্য হাতে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন। প্রতি মুহূর্তে রাত্রি গভীরতর ও প্রকৃতি ভীষণতর হতে লাগল। হাসপাতালের স্তিমিত আলো, মুমূর্ষের স্তিমিত মস্তিষ্কে জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার অন্তিম অগ্রতায় স্মৃতির শোভাযাত্রা আনাগোনা করতে লাগল। জীবনের জীর্ণজ্বরের অবসানে সাহিত্যিক ম্যাকবেথ। ডাক্তার, বন্ধু-বান্ধবের নিষেধ উপেক্ষা করে আস্তাতে চললেন—' Tomorrow and to-morrow and to-morrow creeps in this petty pace from day to day. To the last syllable of recorded time ··· out, out brief candle, life's but a walking shadow.' মেঘনাদবধ কি আমাকে অমরত্ব দান করিবে

না রাজনারায়ণ ?— সমুদ্রের মধ্যে একবিন্দু দ্বীপ ইংলন্ড না সিংহল ? ' I sigh for Alliou's distant shore '— সতত হে নদ, মোর পড় তুমি মনে। —মাইকেল এম.এম. ডাট, ব্যারিস্টার অ্যাট-ল অব গ্রেজ ইন। হাঃ-হাঃ-হাঃ । পুওর মনু আই-সি-এস ফেল চটি-চাদরে মাই ডিয়ার ভিড়্। চল্লিশ হাজার টাকার কমে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করা যায় না— আমার পুত্র দুটি যেন তোমার পুত্রদের সঙ্গে অন্ন পায়। মেঘনাদবধ-ব্রজাঙ্গনা-বীরাঙ্গনা- রাশি রাশি অপরিশোধিত বিশ ··· out,out brief candle!— এ যুগের বিখ্যাত এক সমালোচকের হাতে নবযুগের শ্রেষ্ঠ রূপকার মধুসূদনের জীবনের অন্তিম দৃশ্যগুলি এইভাবেই চিত্রিত হয়েছে।

১৮৬৬ সালের ২৬ জুন বিদ্যাসাগরকে মাইকেল মধুসূদন এক চিঠিতে জানালেন—' কিছু লোক আছে প্রকৃতি যাদের দিয়েছে পাওনা আদায় করা নায়েবের হৃদয়, এরা পারলে স্ত্রী কন্যাদের উলঙ্গ রেখে টাকা বাঁচায়। এই জীবন আমার কাম্য নয়। আমার যা আছে তা নিয়ে যা খুশি করবার অধিকার আমার আছে ··· এ জগতের লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো আমিও বাজি ফেলব এবং নিজের হৃদয় ও মন যতটা শক্তি জোগাবে ততদূর পর্যন্ত লড়ে, হয় দাড়াব, না হয় ধরাশায়ী হব।' মধুসূদনের এই চিঠি আপাত অহং সর্বস্ব শোনালেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই চিঠির মাধ্যমে শোনা গেল নবজাগরণের প্রথম তূর্যধ্বনি। আমাদের সাহিত্য এতদিন পর্যন্ত ছিল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক। কিন্তু মধুসূদনই বোধহয় বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত অর্থে বুর্জোয়া সাহিত্য রীতি প্রচলন করেন।

আসলে মধুসূদন তাঁর বলিষ্ঠ হাতে নায়ক পরিকল্পনার পরিকাঠামোটাই সম্পূর্ণ পরিবর্তন করলেন। আমরা ভারতীয়রা জন্মান্তরে বিশ্বাসী সুতরাং ট্র্যাজেডি তত্ত্বের কোনো জায়গাই ছিল না সাহিত্যঅঙ্গনে। অথচ রাবণ চরিত্রের আকর্ষণের হেতুই হলো মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি । পৃথিবীর সমস্ত ট্র্যাজেডির মতো এর মূলেও আছে এক প্রচন্ড দ্বন্দ্ব। একদিকে অটল শক্তি, অসীম তেজ, অপরিমেয় পৌরুষ— অন্যদিকে স্নেহ, বাৎসল্য, প্রেম, প্রীতি, দয়া-দাক্ষিণ্য নিয়ে আর দশজনের মতো সুখ শান্তির নীড়ের পিয়াসী। তাই আগাগোড়া শক্তিস্পর্ধী রাবণ।

আসলে নায়ক রাবণের এই হাহাকার যতখানি নায়ক রাবণের তার চাইতেও অনেক বেশি পরিমাণে মধুসূদনের অন্তরাত্মার । ১৮৫৬ সালের ৫ জানুয়ারি গৌরদাসের কাছ থেকে মধুসূদন এক চিঠি পেয়ে মাদ্রাজ থেকে কলকাতা আসতে মনস্থির করেন। ইতিমধ্যে তাঁর 'চমৎকার স্ত্রী' রেবেকা এবং চার সন্তানের আপাতদৃষ্টিতে পরম সুখের নীড়ে একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল। আর এর কারণ ছিল মধুসূদনের সহকর্মী কন্যা হেনরিয়েটা। এরপর আর কোনোদিনও তিনি তাঁর মাদ্রাজের সংসারে ফিরে যেতে পারেন নি । তিনি যখন কলকাতা চলে আসেন তখন তার বড়ো মেয়ে বার্থারের বয়স ছিল ছ-বছর, চার বছর দশ মাসের ছোটো মেয়ে ফিবি, তৃতীয় সন্তান সাড়ে তিন বছরের পুত্র জর্জ আর দশ মাসের কনিষ্ঠ পুত্র। স্নেহের বন্ধন অথবা পারিবারিক দায়িত্ব কোনো কিছুই তাকে তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারে নি। তাদের জন্যে তিনি কোনো টাকা পয়সাও রেখে আসেন নি। এই কারণে অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক মধুসূদনের মাদ্রাজ ত্যাগের আড়াই মাস পরে (২১ এপ্রিল, ১৮৫৬) তার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়। তাঁর এই আচরণ এত অগ্রহণযোগ্য ছিল যে, তিনি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নীরবতা পালন করেছেন। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের অন্তিম দৃশ্যে পুত্রের মৃত্যুশয্যায় যে রাবণকে কবি দাঁড় করিয়ে দিলেন সেই রাবণ বললেন —

'ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে

সঁপি রাজ্যভার, পুত্র , তোমায় করিব
মহাযাত্রা।'

এ কোন রাবণ? আমিত্বের অহংকারে আস্ফালিত রাবণ একটু একটু করে কখন বিলীন হয়ে গেছে ব্যর্থ, পরাজিত মধুসূদনের পিতৃসত্তার কাছে কবি নিজেও তা টের পান নি। কিন্তু রাবণ চরিত্র অঙ্কনে কবি যে তাঁর সৃষ্টির শক্তিকে হৃদয় নিঙড়ে এনেছিলেন হাসপাতালের দরিদ্র শয্যায় প্রলাপ উক্তি সেই স্বাক্ষর বহন করছে— ' Out, out brief candle, life's but a walking shadow. '

প্রসঙ্গ : চণ্ডীদাস

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালির আশা, বাঙালির ভাষা, বাঙালির প্রাণে যত ভালোবাসা, তার প্রথম যথার্থ রূপকার চণ্ডীদাস। তাই চণ্ডীদাসকে বাংলা লিরিক কাব্যের গঙ্গোত্রীও বলা চলে। যে লিরিকপ্রাণতা গ্রাম্যকবির কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়ে গ্রাম্য-নদীর ক্ষীণ রেখায় প্রাবাহিত হয়েছিল, সেই ধারাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে বিশ্বসাহিত্য সমুদ্রে মিশে গেল। চণ্ডীদাস 'ধরম' আর 'মরম'এর কবি। গভীর আর্তি, আত্মার অনির্বাণদীপ্ত, প্রেমের সংশয় লেশহীন আত্মসমর্পণ যে সনাতনী ব্যাকুলতার জন্ম দিয়েছে, চণ্ডীদাসের কাব্য তারই বাণীরূপ।

একটি মাত্র পদ বিশ্লেষণ করেও দেখানো সম্ভব, চণ্ডীদাসের কবিদৃষ্টি কত সুদূরপ্রসারী। পদটি 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম'। পদাবলীর রস কবি কর্ণপুর অনুযায়ী মোট ৬৪ প্রকার । তিনি এই ৬৪ রসকে মোটামুটি দুটি মূল শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন— বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। এরই মধ্যে বিপ্রলম্ভ চারপ্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। কবি কর্ণপুর এই পূর্বরাগকে আবার ৮ প্রকার বলে নির্দেশ করেছেন ; (১) চিত্রপট দর্শন, (২) স্বপ্নেদর্শন, (৩) সাক্ষাৎ দর্শন, ৯৪) বন্দী বা ভাটের মুখে শ্রবণ, (৫) দূতী মুখে শ্রবণ, (৬) সখীমুখে শ্রবণ, (৭) গুণিজনের গানে শ্রবণ, (৮) বংশীধ্বনি শ্রবণ। কিন্তু কেবল নাম শুনে পূর্বরাগ সঞ্চারের কথা কোথাও পাওয়া যায় না।

নামের অলৌকিক আকর্ষণী শক্তি রূপ লাভ করেছে চণ্ডীদাসের পদটিতে। আলোচ্য পদটি শ্রীরাধার পূর্বরাগের প্রথম পদ। বৈষ্ণব পদাবলীতেও বোধ হয় এটি চণ্ডীদাসের প্রথম পদ । গৌরচন্দ্রিকা, বাল্যলীলা, কালীয়দমন এমন কি শ্রীরাধিকার বয়ঃসন্ধির পদও নেই তাঁর, তিনি একেবারে উপনীত হলেন পূর্বরাগে। প্রেমের আরম্ভ পূর্বরাগে কিন্তু শেষ কোথায় জানি না— বোধ হয় অপূর্ব রাগে। মিলন, বিরহ, ভাবমিলন-সবকিছু জড়িয়ে অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণার অপূর্ব অগ্নিস্নান এই প্রেম। সেই অগ্নির নাম কৃষ্ণনাম -রূপী একটি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হলো রাধার হৃদয়ে; তার প্রথম প্রতিক্রিয়ার নাম দিলেন কবি পূর্বরাগ । কিন্তু কোথায় পূর্বরাগের পরিচিত প্রকরণ, বয়ঃসন্ধির মুকুল বিকাশ, দেহে মনে অনির্দেশ্য অস্থিরতার শিহরণ, প্রাণলতার অবোধ বৃক্ষ সন্ধান এবং কোনো একটি আশ্রয়দৃষ্টে সমর্পণ স্বপ্নে নিশাযাপন কিংবা ব্যর্থ নিশায় 'রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি'—সে জিনিস কোথায়? চণ্ডীদাস পূর্বরাগের সমস্ত বিধি লঙ্ঘন করেছেন। তিনি পূর্বরাগেই রাধাকে যোগিনী করান, তাঁর রাধা নাম শুনেই কেঁদে আকুল হন। একি পূর্বরাগ?— না অপূর্বরাগ। এ রাধা ক্রমবিকাশের ছন্দাতীত যেন কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি, যেমন 'বৃন্তহীন

পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' উঠেছে।

পদটিতে ভগবৎ প্রেমের কয়েকটি স্তর প্রদর্শিত হয়েছে। প্রথমত , নাম শুনেই প্রেম। সাধারণ প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার চিত্তে নাম শুনেই প্রেমের মুকুল বিকশিত হয় না। কিন্তু এ নাম তো সাধারণ নাম নয়, এ যে মূলেই অপ্রাকৃত অলৌকিক। কোন্ অমৃতসিন্ধু মন্থন করে উঠেছিল 'কৃষ্ণ' এই অক্ষরদুটি , যা শ্রবণমাত্রেই মর্মে প্রবেশ করে, যে নাম সকল ইন্দ্রিয়গণের প্রহ্লাদন ও পরপ্রেমের উন্মাদন, তা অলৌকিক-অপ্রাকৃত। তা চর্মকর্ণে শ্রুত নয়, মর্মকর্ণে আকর্ণিত। শুধুমাত্র কৃষ্ণনামের ধ্বনিতেই শ্রীরাধিকার প্রাণলতা থরথর কম্পমান।

দ্বিতীয়ত , নামের মাধুর্য নামগানই বৈষ্ণবের সাধনা। অবিরাম নামের নেশা উচ্চাঙ্গের ভগবৎ প্রেমের লক্ষণ।

উপনিষদে বলা হয়েছে —'মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' — সেই সব মধু যেন একীভূত হয়েছে 'কৃষ্ণ' এই দুটি অক্ষরে। তাইত এ নাম রাধার কর্ণমূলে ধ্বনিত হয়ে মনকে বিদ্ধ করে তা সমগ্র সত্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। তার লক্ষণ প্রাণের আকুলতা, তার লক্ষণ বদন কখনই কৃষ্ণ নামের বিরহ সইতে পারে না।

তৃতীয়ত, কৃষ্ণ নাম জপের মহিমা। শ্রী রাধিকা চেষ্টা করেও এ নাম থামাতে পারেন না। এ নাম জপ করতে করতে রাধার দেহবোধ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তখন সব বাসনার অবসান; শুধুমাত্র একটি বাসনাপদ্মকে ঘিরে মন ভোমরা প্রাণভোমরা গুণ গুণ করে ফেরে । সে বাসনা নামীর দর্শনের বাসনা। সমস্ত পদটিতে কৃষ্ণনামের অলৌকিক মহিমা অপরূপভাবে প্রকাশিত । স্বভাবতই মনে পড়ে গৌরবসুন্দরের সেই উক্তি—

' হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।। '

মহাপ্রভুর এই দিব্যবাণী যেন তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে কবিতাপস চণ্ডীদাসের হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছিল, তারই বাণীরূপ আলোচ্য পদটি।

চতুর্থত্ব নামের দৈবীমহিমা এই যে তা প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য মনকে উতলা করে । তাইত কৃষ্ণসঙ্গ লাভের জন্য রাধার ব্যাকুলতা । নামের প্রতাপেই যখন চিত্তের এই অবস্থা, তখন অঙ্গের স্পর্শে কি হবে! এই নামের আবাসস্থল সেই শ্রী অঙ্গ শ্রীমতীর দৃষ্টিপথে পতিত হলে সতীত্ব ধর্ম কি রক্ষা করা যাবে! এখানে কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরকীয়া প্রেমের ইঙ্গিত পাচ্ছি না? বিশেষভাবে লক্ষণীয় কবির ভণিতা—' কুলবতী কুল নাশে আপনার যৌবন যাচায়'— অংশেটিতে পরকীয়া প্রেমের ইঙ্গিত কি স্পষ্ট নয়? গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরে যেটা লিখিত হয়েছিল চণ্ডীদাস বহুপূর্বেই তা দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করেছিলেন। এখানেই তাঁর মহাজনত্ব। 'মহাজন' শব্দের নিহিতার্থ সিদ্ধচরিত্র। তাই চণ্ডীদাসের পদই একমাত্র মহাজনগীতি। এখানে সতীত্ব অর্থে জীবের সংসার বন্ধন। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের দ্বারা আচ্ছন্ন জীব সবকিছু বন্ধনকে তুচ্ছ করে অনিবার্য গতিতে ছুটে চলে আপন দয়িতের উদ্দেশে। তাই চণ্ডীদাস বলেছেন— এই নামের অনিবার্য পরিণাম হলো— এ নাম একবার যার মর্মে প্রবেশ করেছে তার আর নিস্তার নেই।

পরিশেষে বলি আমার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, আসলে চণ্ডীদাসের পদের সুকুমার ভাবদেহকে কলঙ্কিত করেছে। ফুলের গন্ধ, চাঁদের আলো, আকাশের নীলিমা, সমুদ্রের তরঙ্গ এ সবের যেমন ব্যাখ্যা হয় না তেমনি চণ্ডীদাসের পদও স্বতঃস্ফূর্ত ঝর্ণাধারার মতো স্বয়ং প্রকাশ। তাঁর প্রতিটি শব্দ যেন মুক্তোবিন্দু, আর এক একটি পদ যেন মুক্তোর মালা। কবি নিভৃতে আপন প্রাণের মাধুরী মিশিয়ে এক একটি পদ রচনা

করে আপন দয়িত কৃষ্ণচন্দ্রের গলায় পরিয়ে দিয়েছেন। পদটিতে বৈষ্ণব সাধনার কয়েকটি ক্রম কি সুন্দরভাবেই না রূপ পরিগ্রহ্ করেছে। এখানে রাধা অর্থে ভক্ত ভগবানএর মহিমা, তা শ্রবণে ও মননে দেহে মনে সাত্বিক ভাবের আবির্ভাব এবং পরিশেষে কৃষ্ণৈকসত্তা হয়ে যাওয়া— এইগুলি এই পদে কত সহজ সরল ভাষায় রূপ পরিগ্রহ্ করেছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি কোনো তত্ত্বগ্রহ্ন করেন নি, অথচ সর্বতত্ত্বের প্রাণালোক আপনা থেকে বিচ্ছুরিত।

বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পথ দু'রকম ভৌগোলিক জগতের পথ ও অন্তর্জগতের পথ। বিবেকানন্দ এই অন্তর্লোকের পথিক। তিনি বললেন মানুষই পারে মানুষ তৈরি করতে; তাই মানুষই ভগবান। শিবজ্ঞানে জীবসেবার মন্ত্র ছিল তাঁর।

বুদ্ধদেবের মতো বিবেকানন্দও পৃথিবীব্যাপী ধ্বংস ও মৃত্যুর লীলাকে চিত্তবল বা spirituality দিয়ে জয় করার কথা বললেন। বললেন ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করে খাঁটি মানুষ হয়ে উঠতে হবে। শুধু নিজেকে সংগঠন করা নয়, অন্যকেও সংগঠিত করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যেই স্বামীজি বেরিয়ে পড়লেন সারা পৃথিবীতে। মানুষকে ভালোবেসে, মানুষ গড়ার স্বপ্ন দেখে, মানুষের সেবার মন্ত্র নিলেন এতবড়ো রোমান্টিক আর কে আছেন?

তাঁকে ভারতের আধুনিক বস্তুবাদের জনক বলেছেন জনৈক সমালোচক। যুক্তিবাদ ও ভক্তিবাদকে সমন্বিত করেছেন তিনি।

তাঁর ভাষাও তাঁরই মতো চরিত্রশালী। প্রথমদিকের আড়ম্বরপূর্ণ ভাষাকে ক্রমে শাণিত চলিত ভাষায় পরিণত করলেন তিনি। তাঁর বিশ্বভাবনা, জীবনভাবনা, সাহিত্যভাবনা যেমন তাঁর নিজের, ভাষাও তাঁর নিজের।

ব্রাহ্ম আন্দোলন ও উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ

স্বপন বসু

উনিশ শতকের প্রথম দিকে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার লক্ষ্য নিয়ে রামমোহনের উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। ১৮৩০-এ রামমোহনের বিলাত যাত্রা— এর পর ব্রাহ্মসমাজের দুর্দিনের সূত্রপাত। দ্বারকানাথের অর্থ সাহায্যে তা কোনোরকম টিকে থাকে। তবে ব্রাহ্মসমাজের মূল আদর্শ থেকে সরে আসে। ব্রাহ্মসমাজের নবজন্মদাতা দেবেন্দ্রনাথ। ১৮৩৯-এ তত্ত্ববোধিনী সভা। এইকালে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যোগাযোগ— সমাজের আর্থিক দায়দায়িত্ব গ্রহণ।

১৮৪৩-এর ৭ পৌষ । দেবেন্দ্রনাথ ও আরও ২০ জনের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা। রামমোহনের আমলে যা ছিল সমাজ, দেবেন্দ্রনাথের কালে তা পরিণত হলো ধর্মে। কিছু কিছু মতভেদ সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজীদের দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব স্বীকার। কেশবচন্দ্রের যোগদানের পর ব্রাহ্মধর্মের শক্তি বৃদ্ধি— দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের সংঘাত। জাতিভেদ, উপবীত ধারণ ও অসবর্ণ বিবাহ এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চরম মতভেদ। পরিণামে ১৮৬৬-র নভেম্বরে ব্রাহ্মসমাজে বিভাজন— আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। নানা বিষয়ে (স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, অবতারবাদ) কেশবের সঙ্গে তাঁর অনুগামীদের মতভেদ । ১৮৭৮-এ কুচবিহার বিবাহকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজে আবারও ভাঙন— ব্রাহ্মসমাজ ত্রিধাবিভক্ত— আদি ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ। দু'বছর পর কেশবচন্দ্রের নববিধান ঘোষণা 'হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম এখন সমস্ত জগতের ব্রহ্ম'। শিষ্যদের (গিরিশচন্দ্র সেন, প্রভাতচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ রায়) বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের ব্রাহ্ম আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা, বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ইত্যাদি সত্ত্বেও উনিশ শতকের বাঙালিজীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম—

(ক) সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে;

(খ) স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার ক্ষেত্রে;

(গ) বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে (বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সহবাস সম্মতি, সুরাপান নিবারণ, অশ্লীলতা নিবারণ)ব্রাহ্মদের ভূমিকা;

(ঘ) জনশিক্ষা বিস্তারে ও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায়;

(ঙ) নির্যাতিত কৃষকসমাজ ও লাঞ্ছিত মানুষের পাশে ব্রাহ্মরা যেভাবে এসে দাঁড়িয়েছেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য— প্রসঙ্গত হরিশচন্দ্র,শশীপদ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় , রামকুমার বিদ্যারত্ন, কৃষ্ণকুমার মিত্রের ভূমিকা—

এ-বিষয়ে আগ্রহীজন এই বইগুলি দেখতে পারেন:

হিস্ট্রি অব দি ব্রাহ্মসমাজ— শিবনাথ শাস্ত্রী

দি ব্রাহ্মসমাজ এ্যান্ড দি শেপিং অব মডার্ন ইন্ডিয়ান মাইন্ড — ডেভিড

দি ব্রাহ্মসমাজ— যোগানন্দ দাশ (অতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত স্টাডিজ ইন দ্য বেঙ্গল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)

ব্রাহ্মসমাজ— প্রগতি ও পরিণতি — শ্যামল সেনগুপ্ত

উনিশ শতকে পূর্বপদের সমাজ— মুনতাসীর মামুন

ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস— স্বপন বসু

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীনাথ চন্দ্র প্রভৃতির আত্মজীবনী।

উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য

সুধীর বিষ্ণু

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরসীমায় অবস্থিত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, এবং মালদহ— এই ছয়টি জেলা সাধারণভাবে 'উত্তরবঙ্গ' নামে পরিচিত। ভৌগোলিক বৈচিত্র্য ও জনবিন্যাসের দিক থেকে এই অঞ্চলকে সমগ্রভারতের ক্ষুদ্র রূপ বলা যায়। প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলের উপর দিয়ে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির আগমন ও প্রত্যাগমন ঘটেছে। একদল চলে গিয়েছে। অন্য আর এক দল মানুষ এসে তাদের স্থান অধিকার করেছে; কিন্তু সব নরগোষ্ঠীই বিভিন্ন ভাবে তাদের কিছু না কিছু চিহ্ন রেখে গিয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অস্ট্রোলয়েড ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর লোকেরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তারপর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পথে প্রবেশ করেছিলেন মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর কয়েকটি শাখা। অবশেষে আর্যদের আগমন ও আর্যীকরণের ফলে সমগ্র বঙ্গদেশের মতো উত্তরবঙ্গেও গড়ে উঠে একটি মিশ্র জনগোষ্ঠী এবং সমন্বয়প্রাপ্ত সংস্কৃতি। উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, একমাত্র মালদহ জেলা ছাড়া অন্য জেলাগুলিতে রাজবংশী জনসম্প্রদায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ। যদিও এই সব জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠীর সাঁওতাল, মুন্ডা,শবর, ওঁরাও, খারিয়া, প্রভৃতি উপজাতি, মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মেচ, রাভা, গারো, টোটো, লেপচা, রং, ভোটিয়া এবং বিপুল সংখ্যক আদিবাসী বাঙালি বসবাস করেন।

কোচবিহার রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত সংস্কৃত ও বাংলাসাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হলেও রাজসভার বাইরে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়েছে বিচিত্র ভাবধারায় সমৃদ্ধ লোক-সাহিত্য। ওই লোক সাহিত্যে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের প্রাণের আবেগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সমৃদ্ধ লোকসাহিত্যের আশ্রয় ভাওয়াইয়াগান, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, ঘুমপাড়ানীগান, ছেলে ভুলানো গান, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, বারোমাসিয়া, ভক্তিগীতি, দেহতত্ত্বেরগান, চোরচুন্নী, ধানকাটাগান, বিবাহ-গান প্রভৃতি ।এইসব গানে রাজবংশী সমাজের সবল ও অনাড়ম্বর জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। এই রচনাগুলি কবে, কার দ্বারা রচিত হয়েছিল, তা জানার উপায় নেই। তবে সুদুর অতীতকাল থেকে প্রচলিত এই স্বতঃস্ফূর্ত রচনাগুলিতে রাজবংশী জনমানসেরই চিত্র ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

রাজবংশীরা ধর্মভীরু জাতি। নানা লৌকিক দেবতার পূজা ও ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে তাঁরা সুখ ও সমৃদ্ধিকামনা করেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খোঁজেন । উত্তরবঙ্গে পল্লী অঞ্চলে পূজিত দেবতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— মহাকাল বা বুড়া ঠাকুর, তিস্তাবুড়ী বা মেছেনী, ভান্ডানীমাও, পেট্‌কাটিমাও, বিষুরি বা বিষহরি , পাগলাপীর, পেত্যানী, মাসান , হুদুমা এবং আরও অনেকে। এইসব দেবতা-অপদেবতার পূজা ও ব্রতপালন নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য গান ও ব্রত কথা। 'মেছেনী' হলেন দেবী তিস্তা। গৃহদেবী ও গ্রামদেবী রূপে তিস্তার উপাসনা জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত । এই দেবীর উদ্দেশে পল্লী কবি গেয়েছেন—

' তিস্তাবুড়ী নামে রে—
বাজে হীরামন বাঁশীরে।
মোর মনে লাগিয়া গেইল্

গায়ের পাছোড়া হারেয়া গেইল
গাঁয়ের গারান, সালাম রে
বলদ না দিয়া টাকা রে।'

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনসমাজের একটি প্রিয় গান চোর-চুন্নী (চোর-চোরনী)। প্রতি বৎসর কালীপূজার সময় মূলত পুরুষরা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে এই গান গেয়ে থাকে। কালীপূজার দিন থেকে পরবর্তী চতুর্দশী পর্যন্ত এইগান চলে। একজনকে চোর এবং অন্য একজনকে চোরনী সাজানো হয়। প্রতিবৎসর নতুন নতুন গানও রচনা করা হয়। চোর-চুন্নীর উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে এই গানগুলিতে একদিকে যেমন চৌর্যবৃত্তির পটভূমিকায় তাদের দাম্পত্য ও গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী ফুটে ওঠে, অন্যদিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমাজের বিভিন্ন-অসঙ্গতি সম্পর্কেও মন্তব্য করা হয়েছে।

বিবাহ একটি প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠান। প্রতিটি লোকসমাজেই বিবাহ-উৎসবকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অসংখ্য গান। রাজবংশী সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। রাজবংশী সমাজে বিবাহে গান অপরিহার্য। ব্যঙ্গকৌতুক ও হাসি-তামাশা লোকজীবনের একটি বিশিষ্ট দিক। রাজবংশী সমাজে হাসির গান নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সাধারণভাবে এই গানগুলি 'ফাউক সালি' বা 'ফাক্‌সালি' নামে পরিচিত। জলপাইগুড়ি জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে এই গানকে 'খ্যাচেরা' বলা হয়। কোচবিহার জেলায় এই গান 'চটকা' নামে পরিচিত। সাধারণত দোতরা যন্ত্র বাজিয়ে এই গান গাওয়া হয়। এই গানগুলি দ্রুত ছন্দের এবং দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। তবে বিষয়বস্তু সবসময় তরল বা লঘু নয়। নিম্নোক্ত গানটিতে দূর থেকে দেখা নাগরিক জীবনের নির্লজ্জতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে—

' ছি ছি, মোক নাজ নাগছে।
বেটী দাওয়ায় তাস খেলাসে—
কি হইল ভগোমান।
ঢ্যাঙ্গেড়াগিলা চড়য় শয়তান—
ঢুল্‌কিয়া দ্যাখেছে পানের টেঁকাখান।
নানা অঙ্কের হচ্ছে খেলা
কাহো কাহো খাছে গুয়াপান।
ঢুল্‌কিয়া দ্যাখেছে পানের গুয়াখান।'

রাজবংশী লোকসাহিত্যের আরও দুটি সমৃদ্ধ শাখা হচ্ছে প্রবাদ-প্রবচন এবং ধাঁধা। প্রবাদগুলির মধ্যে জীবন-অভিজ্ঞতা সংহত রূপে আত্মপ্রকাশ করে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয়ে একটা নিগূঢ় অর্থ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। রাজবংশী প্রবাদ প্রধানত কৃষিজীবন ও প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কিত এবং কিছু কিছু প্রবাদ নীতিমূলক । কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো —

১. হালুয়াক দেখিয়া যায় বয় হাল। / তার দুঃখো চিরকাল
২. চোখা গরু হালুয়ার বৈরী।
৩. ধান হইল বড়ো ধন, আর ধনগাই। কিছুধন সনা-উপা, আর সব ছাই ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের লোকভাষায় ধাঁধার উদ্ভব ঘটেছিল সম্ভবত সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে। বিবাহ বা অন্য কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে এখনও ধাঁধার প্রচলন আছে। রাজবংশী ভাষায় ধাঁধাকে বলা হয় 'ফাকিরি' (ফক্কিকা)। রঙ্‌পুর ও কোচবিহার জেলায় ফাকিরিকে বলা হয় 'শিলুক' বা 'ছিল্‌কা' (শ্লোক)। ধাঁধা একধরনের কূটপ্রশ্ন। ধাঁধার মধ্যে দিয়ে অনেকসময় নীতিকথাও বলা হয়। দৈনন্দিন

জীবনের পরিচিত বিষয়ের আড়ালে ধাঁধার মূল অর্থটি নিহিত থাকে। এজন্য লোকজীবনে ধাঁধা খুবই জনপ্রিয়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো।

১. উপয়তি ঝাং তলাতি নেদাং। উত্তর - মূলো।
২. চাইর ঠ্যাং হাবাডাবা, মাথা নাইরে ভাবা উত্তর - চৌকি।
৩. যায় তে যায়, ফিরি না আসে। উত্তর - নদী। ইত্যাদি

সাহিত্যিক গবেষণা : তাত্ত্বিক গবেষণা ও ব্যবহারিক গবেষণা

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়

গবেষণা তথা নিবিড় অনুসন্ধানের মূল স্রোতে যখন গবেষক সাহিত্যকে অবলম্বন করেন তখন তাকে আমরা সাহিত্যিক গবেষণা বলতে পারি। এই ধরনের গবেষণাকে কেবলমাত্র নান্দনিক না বলে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানমার্গের বিষয় আখ্যা দেওয়াই সমীচীন।

সাহিত্যিক গবেষণার বিষয় সম্ভাবনা ও পরিধি অনন্ত। ধরা যাক — এক বা একাধিক সাহিত্যিকের কোনও বিশেষ রচনা, সামগ্রিক সাহিত্য, রচনাশৈলী, তাঁর চেতনা, সমকালীন লেখকদের সঙ্গে তাঁর মিল বা অমিল, নানাবিধ সাহিত্যিক আন্দোলন ইত্যাদি, আবার বিশেষ কোনও যুগলক্ষণ, সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনও সামাজিক বা ঐতিহাসিক ঘটনা এর বিচার্য বিষয় হতে পারে। সারকথা, সাহিত্যসম্পর্কিত বিষয় নিয়ে গবেষক অনুসন্ধানমূলক প্রয়াস চালান এবং গবেষণার মাধ্যমে অনালোকিত কোনও নতুন বিষয়ভাবনা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন।

সাহিত্যিক গবেষণার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অনুসন্ধান ও বিচার বিশ্লেষণ নৈপুণ্যই যথেষ্ট নয়, সাহিত্যিক বোধ থাকাও একান্ত জরুরী। প্রয়োজন পাঠ সমালোচনার পাশাপাশি আত্মগত চেতনার প্রতিফলন। গবেষণার মতো নিয়মসিদ্ধপদ্ধতির সার্থকতার জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক সূত্রগুলি নিষ্ঠা ও সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করা। আরও প্রয়োজন গবেষণানির্দিষ্ট বিষয়ের সামাজিক, সাহিত্যিক পরিমন্ডল ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন।

অনেক সময় বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক গবেষণা ও ব্যবহারিক গবেষণার মধ্যে উদ্দেশ্যগত দিক বিচার করে বিভাজন করা হয়ে থাকে। ব্যবহারিক গবেষণার উদ্দেশ্য হলো প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারিক সম্পৃক্ত বিষয়ে উন্নতি সাধনার্থে ফলাফল প্রয়োগ করা, সাহিত্যিক বা তাত্ত্বিক গবেষণা মুদ্রিত এবং লিখিত রচনার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। কিন্তু বিশুদ্ধ গবেষণা গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা, পরিসংখ্যান ও বিভিন্ন গণসংযোগের মাধ্যমে সাধিত হয়। গবেষণালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে কোনও সমস্যা সমাধান করা হলে তাকে প্রযুক্ত গবেষণা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যখন কেবলমাত্র জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে গবেষণার প্রয়াস করা হয় তখন তাকে বিশুদ্ধ গবেষণা বলা হয়।

তবে বিশুদ্ধ গবেষণা ও তাত্ত্বিক গবেষণার মধ্যে বিভাজনরেখা যথেষ্ট অস্পষ্ট। কারণ ব্যবহারিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনও সমস্যা সমাধানের উদ্দেশে যে গবেষণা করা হয় এবং যে সমাধানসূত্র পাওয়া যায় তাকে প্রয়োজনে কাজেও লাগানো যেতে পারে অথবা সেটি তাত্ত্বিক পর্যায়েও থেকে যেতে পারে। অতএব গবেষণায় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দুটি দিকই অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত, কখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে মুসলিম সমাজের একটি খণ্ডচিত্র

সুধাময় বাগ

ত্রয়োদশ শতকের তুর্কি আক্রমণের বহু আগে থেকেই বঙ্গদেশে আরব বণিক এবং মুসলিম ধর্মগুরুদের যাতায়াত ছিল। তাঁদের মাধ্যমে এদেশে মুসলিম ধর্ম ও ভাবাদর্শ বিস্তৃত হয়। এই নবাগত ধর্মমত কিছু ইতিবাচক ও কিছু নেতিবাচক কারণে দ্রুত জনগণের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, এর সামাজিক ভিত্তি পূর্বেই প্রস্তুত ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিকড় এদেশে বহুব্যাপ্ত ছিল না, বৌদ্ধ ধর্মের লুপ্তাবশেষ অন্তরে অন্তরে ক্রিয়াশীল ছিল। পূর্বতন ধর্মবিশ্বাসকে ধরে রাখবার কোনো তাত্ত্বিক কিংবা সাংগঠনিক শক্তি আদৌ ছিল না। তাই ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে মানুষের দেরি হয়নি। অসংখ্য মানুষ স্বেচ্ছায়, লোভে কিংবা চাপে পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

সামাজিক জীবনচর্যা ও মননের প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সমকালীন মুসলিম সমাজের নানা বৈশিষ্ট্য বর্ণিত। হিন্দু লেখকদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের আচার আচরণ ধরা পড়েছে। মুসলিম লেখকরাও নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও জীবনচর্যার খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেইসব বর্ণনায় প্রাপ্ত উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করলে মুসলিম সমাজের গোষ্ঠীপরিচয়ের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হবে। আধুনিক যুগের হিন্দু লেখকরা মুসলিম জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রদানে অনাগ্রহী কিংবা অপারগ।

যে সব গ্রন্থে মধ্যযুগের মুসলিম লোকজীবনের পরিচয় মেলে তাদের মধ্যে অন্যতম দ্বিজমাধব ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, দ্বিজরামদেবের অভয়ামঙ্গল, বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত , আলাওলের পদ্মাবতী, তোহফা, সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ' , বাহরণ-খানের লায়লা মজনু, হাজী মুহাম্মদের পুরজামাল, আব্দুল হাকিমের নূরনামা ইত্যাদি। বর্তমান বাংলাদেশে মুসলিম কবিদের লেখা অজস্র পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ সব উৎস থেকে মুসলিম সমাজের কিছু কিছু আচার আচরণ ও জীবনযাত্রার খণ্ডচিত্র তুলে ধরছি।

আলাওলের— 'পদ্মাবতী' কাব্যে চট্টগ্রামের বহু বিদেশী মুসলমানের বসতির পরিচয় মেলে

' আরবী মিশরী সামী তুরকী হাবশী রুমি
খোরসানি উভাবেগী সকল।'

বহু শেখ সৈয়দ ··· মোগল পাঠান যোদ্ধা ··· বন্দর শহরে এই মুসলিমদের বেশির ভাগ বণিক ও যোদ্ধা শ্রেণীর। মুকুন্দরামের রচনায় চার শ্রেণীর পাঠানের পরিচয় আছে—

'সাবানি লোহানি আর লোদানি সুরয়ালি চার
পাঠান বসিল নানা জাত'।

এই বিদেশী মুসলিম সমাজের বাইরে বৃহত্তর মুসলিম জনসাধারণ ছিল ধর্মান্তরিত নিম্নবর্গের হিন্দু অথবা বৌদ্ধ। পুরাতন ধর্ম-সংস্কৃতি, বিবাহ, জীবিকা ইত্যাদি মিশে নানা গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত মুসলমান সমাজ। যেমন সৈয়দ, কাজী, মোল্লা, শেখ, খোন্দকার প্রমুখ। জীবিকা অনুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের বর্ণনা আছে মুকুন্দরামে — যেমন গোলা, ভোলা, কাবড়ি, মুকেরি, পিটারি, গরসাল, সামাকার, কাগচী,কলন্দর, রঙ্গরেজা, ইত্যাদি। নসরুল্লা খোন্দকারের শরিয়ত নামা'য় এসব নাম পাওয়া যায়।

ইসলামের সমানাধিকার ও ভ্রাতৃত্বতত্ত্বের পটভূমি থাকলেও এদেশের মুসলমান সমাজে আতরাফ্ আশরাফ্ বৈষম্য প্রবল ছিল। এছাড়া শরা ও বেশরা পন্থার পার্থক্য ঐ সমাজবিন্যাসের মধ্যে প্রকট। শরিয়তনামায়, নবীবংশে, মুহম্মদ খানের ' সত্যকলি বিবাদ সম্বাদে' বিত্ত রক্ত, আচার ইত্যাদির

কৌলীন্যভেদের সৃষ্ট জাতি ও শ্রেণীভেদ বর্তমান থাকার প্রমাণ মেলে । সম্ভবত এটি হিন্দু সমাজের জাতিভেদের প্রভাবজাত বা পূর্বধর্মের অবশেষ সংস্কার ।

ধর্মাচরণে তদানীন্তন মুসলিম সমাজে দু'ধরনের ছবি মেলে । এক অংশে কলমা, নামাজ, রোজা, জাকৎ ও হজ পালনে রক্ষণশীলতা অনুসৃত হয় — তার ব্যত্যয় কোনোভাবেই সহ্য করা হতো না। মুকুন্দরামের রচনায় পাঁচবেরি করায় নামাজ, ভাবেজীর পেগম্বরে, ' প্রাণগেলে রোজা নাহি ছাড়ে' ইত্যাদি। আরাকানের মুসলিম কবিরাও এইরকম বর্ণনা দিয়েছেন । বিজয়গুপ্ত জানান, ঐ সমাজে কেতাব কোরাণ তার বড়োই অভ্যাস এর কথা ।

কিন্তু পূর্বতন ধর্মবিশ্বাসের ছায়া নিম্নবর্গের মুসলমানের মধ্যে নানাভাবে পরিলক্ষিত হয় । কোরাণ বহির্ভূত 'পীর পূজা'ও প্রচলিত ছিল । পীরের থানগুলি বৌদ্ধ স্তূপ পূজার লুপ্তবশেষ । ব্যুৎপরস্তি কিংবা মূর্তিপূজা ইসলামে নিন্দিত , তবু শরিয়ত নামায় পাই

' কতশত মওলানায় আশুরার দিনে,
হাসান হোসেন মূর্তি নির্মান্ত যতনে
পড়শী সবেরে ডাকি পূজা করায়ন্ত । '

আলাওলের তোওফা ও শরিয়ত নামায় মহালক্ষ্মীপূজার বর্ণনা আছে । ঐ পূজায় হাঁস বলি দিয়ে তার রক্ত ধানের গোলায় ছিটানো হতো । সেইসঙ্গে বলা হয়েছে—

'নামাজ না করিলে আখেরে শ্রী টুটে
নরকে ঝড় এ লক্ষ্মী না আসে নিকটে'

শূকরচন্ডীর পূজা, মাখিনী দেবীর পূজার বর্ণনা আছে শরিয়ত নামায় ' কেহ কেহ শূকর চন্ডীরে দেওন্ত হাঁস' ' মাখিনীরে ছাগল দেওন্ত · · · জানি '। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্য নিয়ে 'পুষা'র পূজা করা হতো — ' পুষা কর্মে ব্রাহ্মণের দিই আমরায়।'

রোগমুক্তির মানসে শনিপূজার মতো অবাক 'রহমান শিরণী' দান করা হতো । মহামারী দেখা দিলে কালো ছাগল জবাই করে 'বিলশিরণী' দিত, শিরণী দানের জন্য দল বেঁধে ডালায় ঘট নিয়ে মেয়েরা মাগনে যেত । বিশেষ দিনে গরু ছাগলের গলায় মালা দিয়ে পূজা করা হতো । 'বৃষের · · শিরে গলে দেওন্ত ফুল ।'

রক্ষণশীল ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি হিন্দু বৌদ্ধ এবং লোকায়ত মিশ্র ধর্মাচরণের যথেষ্ট পরিচয় মেলে । বহুভাবে ঐ অশরিয়ত ধর্মাচরণ নিন্দিত হলেও যুগপ্রাচীন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার · · · সম্ভব হয়নি। এখনো তার রেশ নানারূপে বর্তমান ।

পোশাক পরিচ্ছদে মধ্যযুগের মুসলমান সমাজ আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতো । মুকুন্দরাম, পুরুষদের 'দশরেখা টুপি' মাথায় দেওয়ার কথা জানিয়েছেন । তারা মাথায় রাখেনা কেশ, 'বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি'। বিজয়গুপ্ত মাথায় পাগড়ি পরার কথা বলেছেন । চৈতন্য চরিতামৃতে পীরেদের কালো পোশাক পরার উল্লেখ আছে । টুপি না পরা ছিল নিন্দার । আঁটো সাঁটো ইজার পরার উল্লেখ আছে । 'ইজার পরায় দৃঢ় করি'। মেয়েদের পর্দা প্রথা ছিল । 'ভিন্ন পুরুষেরে মুখ যে নারী দেখাইল, আপনার সোয়ামির দাঁড়িতে অগ্নি দিল '। ' এই সব নারী নরকের হুতাশনে যাইবেক পুড়ি' তবে বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে, দরিদ্র ও নিম্নবর্গের মেয়েদের পর্দা ব্যবহারে শৈথিল্য দেখা যেত ।

অতিথি সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল । নবীবংশে বলা হয়েছে

'কেহ যদি অতিথিরে অন্ননা ভুক্কাত্র।
এহলোকে পরলোকে অতি দুঃখ পাত্র ।'

'ইউসুফ জোলেখা',' সত্যকলি বিবাদ সম্বাদে' এর সমর্থন আছে।

নাচগান বহুল প্রচলিত ছিল। মেয়েরা দলবদ্ধভাবে 'সহেলা' গাইত। গান চর্চারত মুসলমানকে 'পণ্ডিত' বলা হতো। সম্ভবত এটি সুফি প্রভাবের ফল। আলাওল সঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন। বিবাহের অনুষ্ঠানে বিবিধ প্রকার বাদ্য বাজানো হতো। এছাড়া ' নাটুয়ায় করে নাট রহি রহি বাট বাট '।

বিবাহের প্রচুর বর্ণনা ঐসব গ্রন্থে আছে। ঘটকের মাধ্যমে যোগাযোগ, তালুম বৌদল পাল্কিতে বর কনের যাওয়া, কন্যাপণ ও বরপণ উভয়ই বর্ণিত হয়েছে। বরকে হলুদ মাখিয়ে পাঁচ পুকুরে স্নান করিয়ে শোলার টুপি মাথায় দিয়ে, ঠুনা ঠুনা পিঠা কলা শিলা দিয়ে বরণডালা সাজিয়ে বরণ করা হতো। আঙ্গুর খোরমার সঙ্গে মধু ঘৃত দধি শর্করা ভোজন করানো হতো। সুতো দিয়ে ঘিরে আমপাতা জলপূর্ণ কলসী কলাগাছ ইত্যাদি দিয়ে মণ্ডপ সজ্জা হতো। ফুল ছুঁড়ে গেরোয়া খোলা হতো। বাজি পোড়ান, শুভদৃষ্টি, বরবধূর পাশাখেলা, ফুলশয্যা ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা আছে অহিনুদ্দিনের বিবাহ মঙ্গল গ্রন্থে।

বহু বিবাহের বর্ণনা পাই বিপ্রদাসের রচনায় 'শতেক বিবির সঙ্গে হাসান আনন্দ রঙ্গে' মেয়েরাও বহুস্বামী পরিবর্তন করতো, বিজয়গুপ্ত জানিয়েছেন 'এক মাসে তিন নিকা করা' এক রমণীর কথা। এক সদ্য বিধবাকে তার মা সান্ত্বনা দেয় 'পাবি আর বর' বলে। ' বিশ ফয়তা গেলে নিকা দিব আর ঠাঁই'। এক ব্রাহ্মণের কন্যাকে জবরদস্তি করে বিবাহ করার বিবরণ পাই বিজয়গুপ্তের রচনায় ও আব্দুল করিমের সংগৃহীত পুঁথিতে।

লোকাচার, সংস্কার, তুকতাক নানা বিষয়ের বিবরণ আছে ঐ সব পুঁথিতে। এতে বোঝা যায় হিন্দু ও মুসলিম জনজীবনে প্রায় একই ধরনের রীতি নীতি আচার অনুষ্ঠান অনুসৃত হতো। মূলত তারা একই অনুকূলগোষ্ঠীর অন্তর্গত তা এতে প্রমাণিত হয়। এগুলি একান্ত বাঙালি জাতির ঐতিহ্যগত।

মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের বাংলাভাষা প্রীতির বিবরণ উল্লেখযোগ্য। মূলত মুসলিম শাসকদের অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুরা বাংলাভাষার একান্ত বিরোধী নরকের বিধান দিতেন। মৌলবিরা বাংলাভাষাকে ' হিন্দুয়ানি' বলে ত্যাগ করার নির্দেশ জারী করতেন। তবু পথ রোধ করা যায়নি।

চতুর্দশ শতক থেকে মুসলিম কবিরা বাংলাভাষার সপক্ষে সওয়াল করতে থাকেন। শাহ মুহম্মদ সাগির, সৈয়দ সুলতান হাজী মুহাম্মদ, সেখ মুত্তালিব, আব্দুল নবী, আব্দুল হাকিম প্রমুখ কবিদের 'দেশী ভাষা' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশিত। তাঁরা কেউ বললেন 'রতন ভাণ্ডার মধ্যে বচন সে ধন' কেউ জানালেন 'সেই ভাষা হয় তার অমূল্য রতন' ইত্যাদি। তাঁরা ' বাঙ্গলা অক্ষরের আন্ধি মহাধন' অবলম্বনে 'লোক উপকার হেতু' বাংলা ভাষার গ্রন্থ রচনা করলেন। আব্দুল হাকিম সজোরে বললেন —

'যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী,
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি ।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে না যায় ।'

T.W. clerk ও আব্দুল মান্নানের পরিসংখ্যানে প্রমাণিত — ' more than average Arabic vocabularly content are to be found in the works of the Hindu poet only'

মুসলিম রক্ষণশীল অংশের চূড়ান্ত বিরোধিতা উপেক্ষা করে ধীরে ধীরে এই বাংলাভাষা প্রেম তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের জন্ম দেয় পরে গড়ে তোলে নবরাষ্ট্র বাংলাদেশ। ১৯৯১ সালে মৌলানা আক্রম যাঁর ঘোষণা ছিল, ' বঙ্গে মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আগমন পর্যন্ত বাঙলা ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।' বাংলাভাষার মর্যাদা দানে তাই মুসলিমদের অবদান ঐতিহাসিক কারণে স্মরণীয়।

রবীন্দ্রতত্ত্বনাট্যে শুভাশুভের দ্বন্দ্ব

সত্যজ্যোতি দাস

রবীন্দ্রতত্ত্বনাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের অভ্রান্ত-নির্দেশ, মানুষের জয়-অবশ্যম্ভাবী। রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, মালিক শ্রমিকের দ্বন্দ্ব ও বিরোধের পরিণতিতে সর্বহারা শ্রেণীর জয় হবেই এমন সিদ্ধান্তে তিনি এসেছেন। একটি চিঠিতে লিখেছিলেন 'আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানুষের মধ্যে। বারবার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছে মানুষ' এই মানুষের জয় ঘোষিত হয়েছে তত্ত্ব নাটকের পরিণামে।

তাঁর মনে হয়েছিল শ্রেণীদ্বন্দ্ব অনিবার্য। কিন্তু বিরোধ ও বিদ্রোহের প্রসঙ্গে তিনি অভ্রান্ত পথ নির্দেশ করেছেন। রক্তপাত নয়, মানুষের অন্তরের পরিবর্তনের পথেই মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন সম্ভব, এই স্বপ্ন-কল্পনা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে যেমন, তেমনি তত্ত্বনাটকের মধ্যেও নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

শতাব্দীর শুরু থেকে ভারত ও বিশ্বের নানা স্থানে মানব নির্যাতনের ঘটনাগুলি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল, পদে পদে মানবতার এই লাঞ্ছনা, শাসক ও শোষকের ক্রমাগত ক্ষমতা স্ফীতি, জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস ও ঘৃণা, এবং সেই কারণে বারবার যুদ্ধের আমদানি, কবি-মনে অনিবার্য ধ্বংসের সম্ভাবনাকে জাগিয়েছিল। তাই এই অশুভ সভ্যতাকে, এই পাপযুগকে বিনিপাত জানিয়ে বারবার মানুষের হৃদয়ের দরবারে আবেদন করেছেন, কিন্তু দেখেছেন শান্তির ললিত বাণী ব্যর্থ মনোরথে ফিরেছে যুদ্ধবাজ ও শাসক শোষকদের দরজা থেকে। চিরন্তন মানবতার সঙ্গী কবি তাই লেখনীকেই আশ্রয় করেছেন প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসাবে এবং ভাবীকালের সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামের পথ নির্দেশ করতে। সমকাল এইভাবে তাঁর নাটকের বিষয় হয়ে উঠেছে। নাট্যবস্তু হয়ে উঠেছে সমকালের প্রতিধ্বনি।

মনুষ্যত্বের অপরাজেয় মূর্তি-কল্পনা ও তার প্রতিষ্ঠা তাঁর তত্ত্ব-নাটকগুলির পরিণামী চিন্তা। সর্বপ্রকার বিভেদ বৈষম্য ও বিরোধের অবসানে সর্ব-মানবিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার-আদর্শ রূপায়নের কথা উচ্চারিত হয়েছে নাটকগুলিতে। সহ্যসীমা অতিক্রম করলে, সমাজ-রাষ্ট্রের মানুষ প্রচলিত বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে। সেই অস্বীকৃতি অনেক সময়, ন্যায়নীতির প্রচলিত ধারণাকে অস্বীকার করে। সকল বিরোধের অন্তে যে ' সকল ভালো ', রবীন্দ্রনাথের তার প্রতিই সার্বিক সমর্থন। কিন্তু যে অপরিণামী বিদ্রোহ বা আন্দোলন মানুষের শুভবুদ্ধিকে গ্রাস করে তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতা প্রায় সর্বত্র। তাঁর কথা — 'আনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই'। এবং সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো — সেই 'ভালো' অর্জ্জনের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ' ভালো ' বা 'মঙ্গল' জনতার সর্ববিধ-বন্ধন ও শোষণমুক্তিতেই বাস্তবায়িত হয়েছে তত্ত্বনাটকে। এই বন্ধনমুক্তি যেমন ঘটে সার্বিক সংঘর্ষের মাধ্যমে, তেমনি সমাজ মানুষের আন্তর-প্রেরণার ফলে। অচলায়তন-মুক্তধারা-রক্তকরবী-কালের যাত্রায় নিপীড়িত শোষিত জনগণের স্বাধিকার ফিরে পাওয়ার দুর্বার প্রেরণা প্রতিক্রিয়াশীল, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিরোধ ও দ্বন্দ্ব, যুদ্ধের সম্ভাবনা, রক্তপাত, মৃত্যু ও ধ্বংসের অনিবার্য ইঙ্গিত আছে। কিন্তু সব কিছুর শেষে অন্ধকারের পরপারে, সকল দ্বন্দ্ব, সংঘাতের শেষে মঙ্গলময় 'জাগ্রত যে ভালো', তার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। এই 'ভালো' জাগ্রত জনতার জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই নিয়ে এসেছে নতুনের দিশা। নতুন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার সংকল্পে, মানবিক অধিকার অর্জ্জনের পথে, এই জয় হয়েছে সার্থক।

রাজপুত্তুর : লিপিকা

সুমিতা দাস

লোকশ্রুতিবাহিত রূপকথার নির্ভরযোগ্য সংকলনের বদলে শিল্পীর কল্পনায় রূপকথাকে মানুষের সামগ্রিক জীবনের কথা করে তুলেছিলেন হান্স ক্রিশ্চিয়ান আন্ডারসন । রাজা জীবনের রূঢ়তা, নির্মম-কঠোরতা, এমন-কি ভয়াল-বীভৎসতাও অনায়াসে উঠে আসে তাঁর রূপকথা-গল্পে । আসলে রূপকাহিনী লিখতে বসলেও তিনি কখনোই ভুলে যাননা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, সমকালীন বাস্তবতা, তাঁর শিল্পী-সুলভ স্পর্শকাতর মন নাড়া খায় এখানেই । সমকালনীতা যে চাপ সৃষ্টি করে নিয়ত, তারই নিষ্পেষণে আন্ডারসনের রূপকথা হয়ে যায় করুণ জীবনের আলেখ্য । যেখানে স্বপ্ন আছে, তবে তা বস্তুজগতের যাবতীয় সভ্যতাকে, এমনকি তা নির্মম হলেও, তাকে মেনে নিয়ে, যথার্থকে অস্বীকার করার প্রবণতা একেবারে নেই সেখানে । আন্ডেরসেনের এই যে জীবনবোধ-এর ওপর ভর দিয়েই তিনি লেখেন আধুনিক রূপকথা ।

রাজকীয় বর্ণাঢ্যতা থেকে তাঁর রূপকথা নেমে এল নিতান্ত সাধারণ, তুচ্ছ, নগণ্যের ভীড়ে । তাই কালির দোয়াত, গড়িয়ে-পড়া দু-আনি, ছেঁড়া জুতো, আতস কাঁচে ফুটে ওঠা জলবিন্দু অথবা পা-খোঁড়া টিনের সেপাইকে নিয়েও লেখেন তিনি রূপকথা । 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

একটুকু-তলানি-ওয়ালা লেবেল-উঠে-যাওয়া চুলের তেলের নিশ্ছিপি একটা শিশি, চলেছে সে তার হারা জগতের অন্বেষণে, সঙ্গে সাথি আছে একটা দাঁতভাঙা চিরুনি আর শেষ ক্ষয় ক্ষয়ে যাওয়া সাবানের পাতলা টুকরো । কাব্যটির নাম দেওয়া যেতে পারে আধুনিক রূপকথা ।

একথা লেখার সময় হয়তো রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল যোগেন দেবসেনের লেখা রূপকথাগুলির কথা । রূপকথার 'রাজপুত্র'কে নিয়ে এমনই আধুনিক রূপকথা লেখেন রবীন্দ্রনাথ ' লিপিকা'য় 'রাজপুত্তুর'এ — যেখানে সাময়িক কালের আধারে চিরন্তন রূপকথার ইঙ্গিত মেলে ।

এখানে 'রাজপুত্তুর' আসলে রাজপুত্রই নয় । আর তাই 'স্বপ্নের-ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মতো' 'অসীম সমুদ্র' পেরিয়ে রূপকথার 'রাজপুত্তুর' ঘোড়ার উপর থেকে নেমে যেমনি মাটির বুকে পা ফেলে অমনি যেন কোন্ 'জাদুকরের জাদু' তে রূপকথার রাজ্য সরাসরি বদলে যায় আধুনিক শহরে, যেখানে 'ট্র্যাম চলেছে । আপিস-মুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম । তালপাতার বাঁশি-ওয়ালা গলির ধারে উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেছে ।' 'রাজপুত্তুর' এখানে 'পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শহরে পড়ে, টিউশানি করে বাসাখরচ চালায় ।' তার 'গায়ে বোতাম-খোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতো জোড়া জীর্ণ ।'

তার 'রাজকন্যা'ও থাকে পাশের বাড়িতেই, সে-ও আসলে 'রাজকন্যা'ই নয় । মা-বাবা বেঁচে নেই ব'লে এই অনূঢ়া মেয়েটি এসেছে তার 'খুড়ো'র আশ্রয়ে । চাঁপা ফুলের মতো রঙ নয় তার, হাসিতেও মানিক ঝরে না । আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা নয়, তুলনা নববর্ষায় ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারই সঙ্গে ।

পাত্রের সন্ধান মিলল । তার টাকাও বিস্তর, বয়সও বিস্তর, আর নাতি-নাতনির সংখ্যাও অল্প নয় । গায়ে হলুদের দিনে মেয়েটি পালিয়ে গেল, বিয়ে হলো পাশের বাড়ির সেই ছেলেটির সঙ্গে । একালের রাক্ষস লক্ষপতি ক্রুদ্ধ সেই পাত্র আদালতে দেবতার কৃপায় দিনকে রাত করে তুলে ছেলেটিকে

জেলে পাঠালো । প্রচলিত রূপকথায় রাজপুত্রের বিপদ বাধা অতিক্রম করে রাক্ষসের হাত থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার ও বিবাহের বর্ণনা পাওয়া যায় ।

এখানে কিন্তু প্রথমে বিবাহ, আর তারপরই ঘনিয়ে এলো দুর্যোগ, জীবন হয়ে উঠলো বিঘ্ন বিপদ-সংকুল ! জেল থেকে ফিরে আসার পর এই নরখাদক রাক্ষস-পৃথিবীতে ছেলেটির দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা শেষ হলো মৃত্যুতে ! আধুনিক রূপকথার রাজপুত্রের কপালে শুধু কারাবাস নেই, মৃত্যুও আছে। অথচ সে মৃত্যু নবজন্মেরই সূচনা করে । তাহলে কি জন্মমৃত্যুর ধারাপ্রবাহে সেই একই চিরন্তন রূপকথার রূপক ও সত্যের প্রকাশ ? মৃত্যুর সোনার কাঠির স্পর্শে দ্রুত বদলে গেল শহর, আর সেই ছেলেটিও । মুহূর্তে আবার দেখা দিল সেই 'রাজপুত্তুর' তার কপালে অসীমকালের রাজটিকা । দৈত্যপুরীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুলবে । তাই তো তার অভিযাত্রীর বেশ ! রবীন্দ্রনাথ রূপকথাটিকে বলেছেন সত্য, আর গল্পটিকে স্বপ্ন । আসলে ঠিক তার উল্টো গল্পটিই সত্য, রূপকথাটিই স্বপ্ন । রূপকথার আয়নায় যেমন বিম্বিত হয়েছে গল্পের এক অজানা মুখ তেমনি পরাজিত এক অ্যান্টি-হিরোর মধ্য দিয়ে রূপকথার রাজপুত্তুরের নবজন্ম হয়েছে । আসলে রূপকথার সত্যানুসন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ, এমন কি, কখনও তা ইতিহাসের মধ্যেও । ইতিহাসে জয়পরাজয়, যুদ্ধ সন্ধির মধ্য দিয়ে জীবনেরই জয় ঘোষিত হয় । অভিযান—জয়পরাজয় — আবার অভিযান— রূপকথারই চক্রাবর্তন, এ-যেন প্রকারান্তরে রূপকথারই চক্রাবর্তন, এমনকি, হয়তো প্রত্যাবর্তনও ।

বাংলাকাব্যে ইতিহাস-চেতনা

সুলেখা পণ্ডিত

আমরা জানি প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের জন্যেই ইতিহাস লেখা হয়নি। ইতিহাস ইতস্তত ভাবে ছড়িয়ে ছিল সেই সময়ের সাহিত্যে। যেমন ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে কোনো উপাখ্যান বলে তার শেষে বলা হতো 'ইতি হ আস' অর্থাৎ 'এইরূপই ছিল' সেখানে ইতিহাস বলা ঋষির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলনা। ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গণ্ডী অতিক্রম করে ভারতবাসী 'পুরাণসাহিত্যে' যে বিচিত্র প্রতিভা নিয়োজিত করল তাতে জাতির ইতিহাস সংরক্ষণের গুরুত্ব প্রকাশ পেল। রামায়ণ মহাভারত থেকে শুরু করে কাব্য সাহিত্যের যে যুগ তাতে ধর্মের আবরণে ভারতবর্ষের অতীতকালের ইতিহাসের পদধ্বনি ধ্বনিত হয়েছে। অর্থাৎ ধর্ম-সাহিত্য-ইতিহাস যেন হাত ধরাধরি করে পথ হেঁটেছে। বাঙালির প্রথম সাহিত্যচর্চা দরিদ্র নিম্নবর্ণের মানুষের চিত্রকেই রূপায়িত করেছে—

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেষী

— যেন প্রান্তিক ইতিহাসের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে বহুপূর্বে প্রথম বাংলা কাব্য চর্যাপদে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম শাখা মঙ্গলকাব্য। খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ কালসীমায় রচিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্যগুলি। আর্য-অনার্য, অভিজাত-অনভিজাত দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় সামগ্রিক জীবনচিত্রের ঐতিহাসিক ফসল এগুলো। একদিকে মঙ্গলকাব্যের কবিদের 'আত্মপরিচয়' অংশে যেমন কালজ্ঞাপক সূত্র ও পৃষ্ঠপোষকদের নাম পাই, অপরদিকে আখ্যানকাব্যের বিষয়বস্তুর গভীরে খুঁজে পাই তদানীন্তন রাজনৈতিক, সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের ঐতিহাসিক সত্য। এককথায় মঙ্গলকাব্যের আখ্যান রচনাতেই ধরা দিয়েছে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক উপাদান।

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যজীবনকে কেন্দ্র করে জীবনীসাহিত্যের যে জোয়ার এসেছিল তাতেও ঐতিহাসিক উপাদান রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর একমাত্র ঐতিহাসিক গাথাকাব্য গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণ'-এর কথা আমরা সকলেই জানি। বর্গীর হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করে এই একখানি কাব্য মধ্যযুগের ঐতিহাসিক দলিল। গঙ্গারাম ঐতিহাসিক তথ্যের খুঁটিনাটি সংগ্রহ করেই কাব্যখানি লেখেন। কাব্যে পাই—

'চব্বিশ জমাদার ভাস্কর সরদার
চল্লিশ হাজার ফৌজ লইঞা
সেতাড়া গড় হইতে বরগী আইল চৌথ নিতে
সাহরাজার হুকুম পাইঞা।'

ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা বর্গীদের তিনবার বাংলাদেশ লুণ্ঠন অবশেষে নবাব আলীবর্দী খাঁ কৌশলে ভাস্কর পন্ডিতকে হত্যা করেন। ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' ঐতিহাসিক কাব্য হিসেবে স্বীকৃত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'মানসিংহ কাব্য'এ ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। যদিও ইতিহাস তুলে ধরার কোনো বাসনা কবি ভারতচন্দ্রের ছিলনা তথাপি পৃষ্ঠপোষক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার, যার সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের পাঁচ পুরুষের ব্যবধান ছিল তার মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে কবি ইতিহাসের একটা সময়কে উপস্থাপিত করেছেন।

ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম কবি যাঁর মধ্যে ঐতিহাসিক বোধ ও সমসাময়িক সমাজচেতনা পূর্ণমাত্রায় মূর্ত হতে দেখি। এই প্রথম ইতিহাসের যুদ্ধগুলিকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কবিতা রচিত হতে দেখি। শিখযুদ্ধ, ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ, দিল্লীর যুদ্ধকে নিয়ে কবি কবিতা লেখেন। সেই সঙ্গে সেই সময়ের বাংলার নানান পরিবর্তনের চিত্রগুলিকেও ঐতিহাসিকের তথ্যানুসংগ্রহের মতো করে কবিতায় গেঁথে রাখেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলন, কৌলীন্যপ্রথার অপকারিতা, খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা, দেশে ব্যাপক গো-হত্যা, স্ত্রীশিক্ষা, ইয়ংবেঙ্গলের ক্রিয়াকলাপ, দুর্ভিক্ষ সমস্তই তিনি কবিতার মধ্যে সংবাদের মতো পরিবেশন করেন। এই কবিতাগুলোকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সামাজিক ইতিহাস বলা যেতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের পরে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশবোধ থেকে লিখলেন ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শে লিখলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক ভন্ডামীর উপর তীব্র ব্যঙ্গের জ্বালাময়ী কবিতা। রাজনৈতিক চেতনার স্ফুরণ কবিতার মধ্যে আন্দোলনের মনোভাবকে নিয়ে এল। 'রিপন উৎসব'এ ভারতের নিদ্রাভঙ্গ কবিতায় লিখলেন—

'হুঁসিয়ার ইলবার্ট দেখ হে রিপন লাট
সাহেব-রক্ষণী সভা সংগঠিত হয়েছে।'

কবি নবীনচন্দ্র সেন লিখলেন ইতিহাস মিশ্রিত স্বাদেশিক আখ্যানকাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ' পলাশীর মাঠে

সিরাজের পরাজয় ও পলায়ন শেষে ধৃত হয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসার পর —

' সিরাজের ছিন্নমুণ্ড চুম্বিয়া ভূতল
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন
নিবিল গৃহের দীপ নিবিল তখন
ভারতের শেষ আশা হইল স্বপন।'

পলাশীর কাব্য উচ্চশ্রেণীর ঐতিহাসিক কাব্য না হলেও ইতিহাসের বস্তুসত্য এতে নিহিত আছে। এছাড়াও যীশুখ্রীস্ট, বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেবকে নিয়ে কবি জীবনীকাব্য লেখেন।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবি জীবনে ব্যক্তিগত অনুভূতির সাথে যুক্ত হয়েছিল এদেশের এবং বিদেশের ইতিহাসের নানান গতিপথ । দেশ বিদেশের ঘটনার বিচিত্রতা কবিচিত্তে যেমন আলোড়িত হয়েছিল তেমনি তার প্রতিফলন ঘটেছিল কাব্যে। 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থে শিখ ও রাজপুত কাহিনীকে কেন্দ্র করে কবির আদর্শবোধ প্রকাশ পেয়েছে।

' সেঁজুতি'র 'নতুন কাল' কবিতায় লিখলেন—

' যে হোক রাজা যে হোক মন্ত্রী কেউ রবেনা তারা
বইবে নদীর ধারা
জেলে ডিঙি চিরকালের নৌকো মহাজনি
উঠবে দাঁড়ের ধ্বনি'

এ যেন আধুনিক ইতিহাসের শ্রমজীবী মানুষের জয়গান ঘোষণা। ইতিহাসের বহুদূর অতীত থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত চলমান শ্রমজীবী, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যারা নয়া ইতিহাস গড়ে গণতন্ত্রের পাদপীঠকে তৈরি করেছে রবীন্দ্রনাথের কবি দৃষ্টিতে তারাই ধরা পড়লেন সর্বপ্রথম।

জাতীয় মর্যাদা ও মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য কবি প্রতিবাদী হয়েছিলেন। দেশ এবং বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ, ধ্বংস, নারকীয় হত্যার দৃশ্য দেখে কবি হতাশ। এই মানসিক যন্ত্রণার প্রতিফলন ঘটেছে শেষ পর্যায়ের অনেকগুলি কবিতায়। ঔপনিবেশিক সভ্যতা ও বর্বরতার কথা তুলে ধরলেন কবি 'আফ্রিকা' কবিতায়। 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের 'বুদ্ধভক্তি', 'আহ্বান' কবিতায় বিশ্বজুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসের রূপকে তুলে ধরেন । ' প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় বিশ্বের খল রাষ্ট্রনায়কদের ক্রূরতা ও মূঢ়তাকে ধিক্কার জানালেন কবি। শেষে কবি প্রত্যয়ী হলেন—

' দামামা ঐ বাজে
দিন বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়
নইলে কেন এত অপব্যয়।'

রবীন্দ্র-পরিমন্ডলের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনেক কবিতার মধ্যে ইতিহাস ও সমাজ উঠে এসেছে কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে । ইতিহাসের অনুরাগী পাঠক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। কবির ইতিহাসপ্রীতি ধরা পড়ে বাঙালিজাতির প্রাচীন গৌরব অন্বেষণে ও স্মরণে।

কবি মোহিতলাল মজুমদার জাতীয় ইতিহাস ও পুরাণকাহিনী থেকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত গ্রহণ করে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন। 'নাদিরশাহের শেষ' 'শেষ শয্যায় নূরজাহান' 'নূরজাহান ও জাহাঙ্গীর' ইতিহাসের ঘটনায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।

পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলিম ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় বিদ্রোহী কবি নজরুল লিখলেন 'কামাল পাশা' ও ' শাত্-ইল-আরব' কবিতা। কামালপাশার নেতৃত্বে তুর্কীর নব সৌভাগ্যের জয়ডংকার তালে আমাদের দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হোক কবি তাই চেয়েছেন।

নজরুলের 'দিলদরদী' 'সত্যকবি' ও 'সত্যেন্দ্রপ্রয়াণগীত' এই তিনটি কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়া চিত্তরঞ্জন, কর্মযোগী অশ্বিনীকুমার, আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কবিতা লিখেছেন। 'সর্দাবিল' 'লীগ অব নেশন' 'রাউন্ডটেবিল কন্ফারেন্স' 'সাইমন কমিশন'কে কেন্দ্র করে কবি সংগীতও রচনা করেছিলেন। খিলাফৎ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, কৃষকমজুর সমস্যার বিভিন্ন ঘটনাকে কবি তার কবিতায় তুলে ধরেন।

এই সময়ে ঘটে যাওয়া প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় মানুষের অস্তিত্বের সংকটে নতুন আশার বাণী নিয়ে এল কার্ল মার্কসের 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'। মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনার ব্যাখ্যা দিলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারে প্রাচীন বিশ্বাসের ভিত নড়ে উঠল। এই প্রবল পরিবর্তনে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা কাব্যসাহিত্যও নতুন পথে যাত্রা শুরু করল। আধুনিক কবিদের বিচিত্র বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও জীবনানন্দের কাব্যে সমকালীন প্রেক্ষাপট ও ঐতিহ্যনিঃসৃত ইতিহাসচেতনা ধরা দিল।

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র দেশে দেশে ক্রান্তিকারী বিপ্লবীদের চিনে নেন—

' নীল নদীতট থেকে সিন্ধু উপত্যকা
সুমেরু আক্কাড আর গাঢ় পীত হোয়াংহোর তীরে,
বারবার নানা শতাব্দীর
আকাশ উঠেছে জ্বলে ঝলসিত যাদের উষ্ণীষে
সেই সব সেনাদের
চিনি আমি চিনি
সূর্য সেনা তারা।'

কবি জীবনানন্দ ইতিহাসচেতনাকে মানুষের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন। তুলে আনেন অতীত ইতিহাসকে—

' ভারত সমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই কোনো এক নগরী ছিল একদিন।'

Ninth Refresher Course in Bengali

Bengali Literature
Befor? 1947

March 4 - 27, 1998

Department of Bengali Language & Literature , ASC-CU

◆

March 4, 1998
10.30.A.M. - 1.30 P.M.
Darbhanga Hall

Inauguration : Prof. Rathindranarayan Basu, V.C.
Welcome Address
Prof. Bimal K. Mukhopadhyay

Refersher Course : aims & objectives
Prof. P.L. Majumdar
Hony. Director, ASC-CU.

On 21st February
Annadasankar Roy
Poems On 21st February
Siddheswar Sen
Guest-In-Chief
Syed Mustafa Siraj, Abdur Rauf,
Prof. C.R. Laha, Actg. V.C. Ranchi University.

Cultural Seminar
Ajit Pande, Kaushiki Bandyopadhyay,
Amitabha Bagchi, Abir Chattopadhyay
Tripti Sen , Bratati Majumdar & Rajeshwar Bhattacharya

Vote of Thanks
Dr. Dhurjatiprasad De
D.P.O. & Secretary, Arts-Commerce

4.3.'98

Time	Speaker	Topic
2-00P.M.-3.30 P.M.	Prof. Asit Kr. Bandyopadhyay Rtd.S.C. Prof. Bengali, C.U.	An Introduction to the Study of Old Bengali Literature
3-30P.M.-5.00 P.M.	Prof. Chittaranjan Laha V.C. Actg., Ranchi University	An Introduction to the Study of Medieval Bengali Literature

5.3.'98

Time	Speaker	Topic
10.30A.M.-1.30P.M.	Dr. Satyabati Giri Reader, C.U.	Cultural Background of the study of Krishnakatha
2.00P.M.-3.30P.M.	Dr. Nirmalnarayan Gupta	Shrikrishnakirtan Kabya : Another Aspect
3.30.P.M.-5.00P.M.	Prof. Debnath Bandyopadhyay Tagore Cell, R.B.U.	Court Literature

6.3.'98

Time	Speaker	Topic
10.30A.M.-1.30P.M.	Dr. Aloke Roy Reader , Scottish Church College	A. Vidyasagar and Bengali Society B. Vidyasagar and Bengali Literature
2.00P.M.-3.30P.M.	Dr. Arun K. Basu Rtd. Prof. of Bengali, R.B.U., G.L.C.U.	Study of Shaktasahitya
3.30P.M.-5.00P.M.	Sanjib Chattopadhyay	Vivekananda : Wandering

7.3.'98

Time	Speaker	Topic
10.30A.M.-1.30P.M.	Dr. Swapan Basu Reader, Bengali, B.U.	A. Bengali Literature and Hindu Reawakening Movement B. Bengali Intellectuals and Bramho Movement
2.00P.M.-3.30P.M.	Gautam Chattopadhyay Writer & Journalist	Bharatpathik Rammohan Roy
3.30P.M.-5.00P.M.	Dr. Biswanath Roy Reader, Bengali, B.U.	Tagore's Views on Pre-Modern Bengali Literature

9.3.'98

Time	Speaker	Topic
10.30A.M.-1.30P.M.	Prof. Biswanath Chattopadhyay Rtd. Prof. of English, J.U.	A. Western Impact on Bankimchandra B. Western Impact on 19th Century Bengali Poetry
2.00P.M.-3.30 P.M.	Abdur Rauf Editor, Chaturanga Patrika	Abdul Odud in Bengali Literature
3.30P.M.-5.00P.M.	Dr. Asish K. De Reader & Head, Bengali , V.U.	Structure of the Pre-Modern Bengali Poetry

10.3.'98

Time	Speaker	Topic
10.30A.M.-12.00P.M.	Dr. Jayanta Bandyopadhyay Reader, Bengali, R.B.U	Periodicals & Bengali Literature 1818-1914
12P.M.-1.30P.M.	Amitava Dasgupta Editor, Parichay	The Poetry of Tagore's Last Decade
2.00P.M.-5.00P.M.	Prof. Pinakesh Sarker Bengali J.U.,G.L.C.U.	A.What is Modern Bengali Poetry ? B.Modern Bengali Poetry : Unlike Tagore

11.3.'98		
10.30A.M.-1.30P.M.	Prof. Pallab Sengupta Vidyasagar Prof. Bengali, R.B.U.	A. Dirozeo : A Revolutionary B. English Literatue By Bengali Writers
2.00P.M.-5.00 P.M.	Sri Ashok K. Mukhopadhyay Reader & Head, Drama, R.B.U.	Tagore's Drama : A Contemporary Aspect
12.3.'98		
10.30A.M.-1.30P.M.	Dr. Biswabandhu Bhattacharya Reader, Bengali, B.U.	A Study of Bengali Novels (1901-1946)
2.00P.M.-5.00P.M.	Prof. Rabindranath Bandyopadhyay Bengali, K.U.,G.L.C.U.	A. The Socio-Economic Study of Bengali Farce B. Bengali Drama (1795-1876)
14.3.'98		
10.30.A.M.-12.00P.M.	Dr. Kartik Lahiri Rtd.Reader, Tripura Centre of C.U	Psyhological Analysis In Bengali Novels (1933-1946)
12.00P.M.-1.30P.M.	Prof. Manabendra Bandyopadhyay Comparative Literature ,J.U.	Spain In Bengali Literature
2.00P.M-.3.30P.M.	Dr. Manilal Khan Reader, Bengali, C.U.	18th Century Bengali Prose
3.30P.M-5.00P.M	Dr. Barun Chakroborty Reader & Head, Folklore, K.U.	Folk Literature
16.3.'98		
10.30A.M.-12.00P.M.	Dr. Ratna Basu Reader & Head, Sanskrit, C.U.	Tagore & Sanskrit Literature
12.00P.M.-1.30P.M.	Prof. Biplab Dasgupta Economics , C.U.	The Socio-Economic Base of Bengali Novels
2.00 P.M.-5.00P.M.	Prof. Ajit Kr. Ghosh Rtd. Prof. Bengali R.B.U.	A Critical Study of Bengali One act play
17.3.98		
10.30A.M.-1.30P.M.	Dr. Rabindranath Bal Editor, Kishor Gyan Bighan	Juvenile Literature in 19th & 20th Century
2.00 P.M.-5.00P.M.	Prof. Ajit Kr. Ghosh Rtd. Prof. Bengali , R.B.U	Evaluation
18.3.98		
10.30A.M.-1.30 P.M.	Prof. Bimal Kr. Mukhopadhyay Ramtanu Lahiri Prof. & Head, Bengali, C.U.	Aesthetics : Different Aspects
2.00P.M.-5.00P.M.	Prof. Gopikanath Roy Chowdhury Rtd. Prof. Bengali , V.B.U.	Fiction Between The Two Wars
19.3.98		
10.30A.M.-1.30P.M.	Dr. Rudraprasad Chakroborty Research Project,Kalabhawan,V.B.U.	A. Production-History Of Tagore's Drama B. Evalution
2.00P.M.-5.00P.M.	Dr.Prasanta K. Pal Rabindra Bhawan Visva-Bharati	A. The Study of Tagore's Life : An Approch Towards Tagore-Litrature B. Evaluation

20.3.98

10.30A.M.-12.00P.M.	Dr. Shyamal Chakroborty Reader, Chemistry, C.U.	Application of Litsay Theories
12.00P.M.-1.30P.M.	Prof. Bimal K. Mukhopadayay	More On Aestheties
2.00P.M.-3.30 P.M.	Dr. Nirmalendu Bhawmik Reader, Bengali, C.U.	People's Theatre in Pre-Independence Period: 'Nabanna'

21.3.98

10.30A.M.-12.00P.M.	Dr. Sukhendu Sundar Gangopadhyay Reader, Bengali, C.U.	Tagore As A Critic of Tagore Literature
12.00Noon-1.30P.M.	Prof. Nityananda Saha Chairman , W.B. College Service Commission	Environment and Chemistry
2.00P.M.-3.30P.M.	Prof. Ashok Basu Librarian, Central Library, C.U.	Rabindranath: Library & Library Movement
3.30P.M.-5.00P.M.	Dr. Dibyajyoti Majumder Editor, Pashchimbanga, K.U.	Rabindranath & Folk Literature

23.3.98

10.30A.M.-12.00 Noon	Prof. Darshananda Chowdhury Bengali, V.U.	New Trends in Bengali Theatre
12.00Noon-1.30P.M.	Dr. Tirthankar Chattopadhyay Reader, English, K.U.	Western Impact on Tagore
2.00P.M.-3.30P.M.	Prof. Dipendu Chakraborty English, C.U.	Post. Modernism and uttar Adhunikatabad
3.00P.M.-5.00P.M.	Prof. Surabhi Bandyopadhyay English, C.U.	On Research Methodology

24.3.98

10.30A.M.-12.00Noon	Dr. Sumita Chakraborty Reader, Bengali, B.U. G.L.J.U	Post Tagore Modern Bengali Poetry
12.00Noon-1.30P.M.	Prof. Mihir Bhattacharya Head, Film, J.U.	Pre-47 Cinema and Bengali Literature
2.00P.M.-3.30P.M.	Prof. Rameshwar Shaw Bengali, K.U., G.L.C.U.	Post 1st War Bengali Novels : Socio Economic - Cultural Background
3.30P.M.-5.00P.M.	Abdur Rauf Editor, Chaturanga Patrika	Nazrul & Communal Harmony

25.3.98

10.30A.M.-1.30P.M.	Prof. Rameshwar Shaw Bengali, K.U., G.L,C.U.	Evaluation
2.00P.M.-3.30P.M.	Dr. Kalyani Shankar Ghatak Reader, K.U., G.L.C.U.	Bengali Essay (1901-30)

26.3.98

10.30A.M.-1.30P.M.	Prof. Swapan Majumder Director Rabindra Bhawan Santiniketan	Pre-Independence Comparative Literature
2.00P.M.-3.30P.M.	Dr. Juthika Basu Reader & Head, Bengali, V.B.U.	Chokherbali : A Critical Study
3.30P.M.-5.00P.M.	Anil Acharya Editor, Anustup	Western Impact On Modern Bengali Literature

27.3.98
1.30 P.M. - 4.30 P.M.
Room No. 10

Valedictory Session,

Department of Bengali Language & Literature

A.
1.30 P.M. - 2.30 P.M.

Rabindra Sangeet : Sharbani Gangopadhyay, Sugata Sen

President : Prof. Bimal Kumar Mukhopadhyay, Head of the Department

Guest-In-Chief : Professor Asish Kumar Bandyopadhyay, Dean, Faculty of Arts

Guest of Honour : Professor Asit Kumar Bandyopadhyay

Concluding Address : Professor P.L. Majumder, Director, ASC

Vote of Thanks

Dr. Dhurjatiprasad De, Secretary , Arts & Commerce

B.
2.30P.M-3.30P.M.

Hour of Poetry

Sunil Gangopadhyay & Joy Goswami

President : Prof. Jyotirmoy Ghosh

C.
3.30 P.M.-4.00 P.M.

Dialogue In Music

Ajit Pande

About The Participants

1. Adip Ghosh M.A.,Ph.D.
   Basirhat College
   Basirhat, N.24 Pargs.

   The Heroes in ' Birangana'.

2. Aruna Sarkar M.A.
   Rastraguru Surendranath College
   85, Middle Road, Barrackpore,
   N.24 Parganas, Ph # 5600603
   Resi.- 364/3, N.S.C.Bose Road
   Calcutta 700047, Ph # 4710477

   The world of Tagore & Nandini In ' Raktakarabi'.

3. Ashraf Hossain M.A.
   Govt. College of Education
   Resi. Sadhanpur Housing
   Qtr. No. M/4, Burdwan

   Approach Towards the History of Bengali Literature in 19th Century.

4. Chaitanya Biswas M.A., Ph.D.
   Hiralal Bhakat College
   Nalhati, Birbhum 731220

   Prosody In Modern Poetry before Independence

5. Gayatri Nath Choudhury M.A.
   Women's College
   Silchar-1, Cachar,
   Assam, Ph # 20503
   Resi. College Road North
   Silchar 4, Assam, Ph # 37410

   From Barak Valley

6. Janardan Goswami M.A.
   Shyampur Siddheswar
   Mahavidyalay
   Ajodhya, Howrah
   Resi. 100/1, Rajballav Saha Lane
   Howrah 711101

   Impact of Folk-life & Folk-Drama In Tagore's Drama

7. Jayanta Kumar Halder M.A.
   Netaji Subhas Mahavidyalay
   Haldibari, Coochbehar
   Resi. Mohanpur, Chandangar
   24 Pargs.(S), Pin 743368

   Bibhutibhusan's 'Ahavan'

8.	Madhabi De, M.A., Ph.D. Reader, Bengali, Nistarini College Purulia-723101 **Resi.** 1/96 Bijoygarh Jadavpur, Calcutta 700 032	The Court of Panchokota & the Poet of ' Chaturdashpadi'
9.	Madhabi Biswas, M.A. Krishnath College Berhampore, Murshidabad **Resi.** 60, Belgachia Road Metro Rly. Qtr. No.-H/11 Calcutta 700037	'Padma' : a novel by Promothonath Bisi
10.	Madhumita Chakraborty, M.A. Senior Lecturer, Bengali Mrinalini Dutta Mahavidyapith Vidyapith Rd., Birati, Cal 700 051 Ph # 5393825 **Resi.** 28/2A, Sambhu Nath Das Lane Calcutta 700050, Ph # 5579496	Mrityunjay Vidyalankar : The study on Stylistics
11.	Manoj Kumar Adhikari, M.A. Saldiha College, Bankura **Resi.** 218/6 School Danga Bankura	' Narayan'
12.	Nandini Mukhopadhyay, M.A. St. Xavier's College 30, Park St., Calcutta - 700 016 **Resi.** ' Raktakarabi' 536, R.B.C. Road, Hazinagar, 24 Pargs. Pin - 743135, Ph # 858034	Unknown Female Poets in Nineteenth Century
13.	Nandita Mitra, M.A. Digboi College Digboi, Assam **Resi.** 849/B, Dubbs Area Digboi, Assam-786171	' Shaktapadavali' : Theory & Art

14.	Prabhas Kumar Roy M.A. Mahishadal Raj College Mahishadal, Midnapore	Mother In Sarat Literature : Today's Perspective
15.	Pramila Bhattacharya M.A., Ph.D. Women's Christian College 6, GreeK Church Row Calcutta 700 0 26 **Resi.** 5/22, Sebak Baidya Street Calcutta 700 0 29	Fiction of Saradindu Bandyopadhyay : His Mind & Art
16.	Pritiprabha Dutta M.A., Ph.D. Rammohan College Rammohan Sarani Calcutta 700 00 9 **Resi.** 6, Jhil Park Kamrabad , Sonarpur, 24 Pgs (S)	Brahmius In Pre-Modem Bengali Literature
17.	Reba Sarkar M.A. Calcutta Girls College 169, Dharamtolla Street Calcutta 700 006 **Resi.** 2/3, Hindustan Park Calcutta 700 029 Ph.- 464 2496	Maharastrapuran
18.	Rita Kar M.A., Ph.D. Sr. Lecturer, Bengali Behala College of Commerce Parnasree, Behala Calcutta **Resi.** C-14, Cluster - IX Purbachal , Salt Lake Calcutta 700 091 Ph. 3348105	Nazural : His Relevance
19.	Satyajyoti Das M.A. Reader, Bengali Ramkrishna Vivekananda Centenary College, Rahara N. 24 Pgs, Ph. # 5532049 **Resi.** 169/A, East Sinthi Bye Lane Calcutta 700 030, Ph. 5538792	Good & Evil In Metaphysical Dramas of Tagore

20.	Sharmistha Sen, M.A. Lecturer Zakir Husain College D.U. J.N. Mg. Delhi-110002 Resi. 147C, J & K Pocket Dilshad Garden Delhi 110095	Nineteenth Century Poetry by Women : A Feminist Study
21.	Shreemati Chakraborty, M.A. Sr. Lecturer Miranda House D.U. Patel Chest Marg University of Delhi Delhi 110007 Resi. Block II 8/2 Minto Road Apart New Delhi 110002 Ph. 3234507	Silent Writing and Voice of Protest Aamar Jiban by Rassundari Devi
22.	Sudhamoy Bag, M.A. Sabang Sajani Kanta Mahavidyalaya Sutnia, Midnapore Resi. Dakshin Damodarpure Midnapore	Muslim Life in Pre-Modern Bengali Literature
23.	Sudhir Bishnu, M.A., Ph.D. Reader, Bengali Alipurduar College Alipurduar Court Jalpaiguri 736122 Ph. (03564) 55255	Folk-Literature in Uttarbanga
24.	Sugata Sen, M.A., Ph.D. Reader, Bengali Muralidhar Girl's College P 411/14, Gariahat Road Calcutta 700029 Resi. Falt - 21, 'Krishna Vihar' 15, Sarat Chatterjee Avenue Calcutta 700029 Ph. 4666233/4632173	A Literary Appreciation of Tagore's Songs

25.	Sukumar Bandyopadhyay M.A. Sundarban Mahavidyalaya Kakdwip, 24 Pgs (S) Kakdwip (Subhasnagar) 24 Pgs.	Prasanga : 'Chandidas'
26.	Sulekha Pandit M.A. Tufanganj Mahavidyalaya Tufanganj New Town, CoochBehar	Concept of History In Bengali Poetry
27.	Sumana Purakayastha M.A. Karimganj College Karimganj , Assam Resi. Lakshmi Bazar Road. Karimganj, Assam - 788710	'Padma' & 'Manasa' In Garh Shri Khanda
28.	Sumita Das M.A. Ph.D. Rammohan College Calcutta Resi. 119, Rajabagan Baidyabati , Hoogli Pin 712222, Ph. 6324531	Rajputtur : Lipika
29.	Susmita Shome M.A. Sr. Lecturer Gour Mahavidyalaya Mangalbari, Malda Resi. Lake Garden, Ghoshpeer Malda, Ph. 65095	Hero of Meghnadbadh Kavya : Eastern & Western Source
30.	Swarup Kr. Jash M.A. Rabindrasadan Karimganj, Assam Resi. Banamali Road Karimganj , Assam 788710	Poems of Tagore : Its Cultural Background
31.	Tapan Pande M.A. Bethuadahari College Bethuadahari Nadia Resi. C/o, Chandan Sarder Bethuadahari , Nadia	Nature In Tarasankar's 'kalindi'

32. Tapas Bhattacharya$_{M.A.}$
Kharagpur College
Kharagpur, Midnapur

Vidyasagar's ' Probhaboti Samvashan' : A Reader's Response

33. Tripti Pal Choudhury$_{M.A.}$
Women's College, Silchar
Silchar 1, Cachar, Assam
Ph # 20503
Resi. C/o K.C. Pal Choudhury
Silchar 3, Tarapur Narsing Road.
Cachar, Assam 788003

Tagore's ' Katha ' : Its Source & Transformation

ক্রোড়পত্র

বাংলা বানান সংস্কার

আলোচনাচক্র
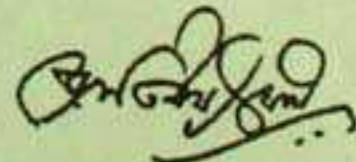
২৭ মার্চ ১৯৯৮

সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর দেড়টা

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ।। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার ও রাজশেখর বসুর সম্মতিক্রমে বাংলা বানান বিধি প্রবর্তন করে। সম্প্রতি বাংলা বানান সংস্কারের প্রচেষ্টায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আকাদেমির সচিব শ্রী সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবি-অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ, ভাষাবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক পবিত্র সরকার, আমাদের মাননীয় উপাচার্য ও বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে পরামর্শক্রমে আজকের এই সর্বভারতীয় চরিত্রের আলোচনাচক্র। এ বিষয়ে আমরা উল্লিখিত সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। বাংলা আকাদেমির প্রতি ও বিশেষত আমাদের মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম।

২০ মার্চ ১৯৯৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বানান প্রসঙ্গে আলোচনা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিভাগ-আয়োজিত 'নবম উজ্জীবনী' পাঠমালা' সমাপ্ত হচ্ছে ২৭ মার্চ, ১৯৯৮। দীর্ঘ কুড়ি দিনের এই পাঠমালার সঞ্চালক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ। অধ্যাপক ঘোষ পাঠমালার কঠিন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাংলা বানান সংস্কার নিয়ে যে-সেমিনারের আয়োজন করেছেন, তার যাথার্থ্য প্রশ্নাতীত।

বাংলা বানান সংস্কার নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভাবনাচিন্তা করেছিলেন আজ থেকে অন্তত ষাট বছর আগে। বিগত কয়েকবছর 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' এ নিয়ে ভাবছেন। 'উজ্জীবনী পাঠমালা'র সূত্রে অধ্যাপক ঘোষও কাজটা করে চলেছেন ১৯৯৫ থেকে। আজ ১৯৯৮-এর মার্চের শেষে অধ্যাপক ঘোষ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনে সেই আলোচনাকে অর্থবহ করে তুললেন তখন অবশ্যই জাতীয় স্বার্থে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ' বিভাগের ভূমিকা হয়ে উঠল ইতিবাচক। এই আলোচনায় আমার অনুপস্থিতি অকারণ নয়। অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে সেখানকার সেমিনারে যেতে হয়েছে। শুনেছি অনেকের মুখে যে, 'বানান সংস্কার' নিয়ে যে-সেমিনারের ব্যবস্থা অধ্যাপক ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছিলেন তার গুরুত্ব ও সাফল্য অপরিসীম। বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যেভাবে আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন তাতে নাকি বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে, বানান সংস্কার নিয়ে আলোচনায় যবনিকা টানার সময় হয় নি এখনও। আলোচনা আরো চলবে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বিভাগের যে একটা সক্রিয় ভূমিকা থাকা উচিত এ ব্যাপারে , তা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হল । অধ্যাপক ঘোষ অবশ্যই বৃহত্তর কর্মকান্ডের সঙ্গে আমাদের বিভাগকে যুক্ত করে দিয়ে সকলের ধন্যবাদের পাত্র হলেন।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

২৭ মার্চ ১৯৯৮
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক
বিভাগীয় প্রধান

বাংলা বানান সংস্কার

বাংলা লিপি ও বানান সংস্কারের এবং
বাংলা বানানের সমতাবিধানের
যে প্রচেষ্টাগুলি এ পর্যন্ত হয়েছে
তার আনুপূর্বিক বিবরণ এবং
বিভিন্ন প্রবণতা এক চিত্তাকর্ষক ইতিহাস।
ব্যক্তিগত, বিশ্ববিদ্যালয়গত এবং
সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস যা কিছু হয়েছে
তাতে মূল নীতি এই লক্ষ করা গেছে যে,
লিপির ক্ষেত্রে যৎকিঞ্চিৎ সংশোধন এবং বানানের ক্ষেত্রে
ক. তৎসম শব্দগুলির বানানে সংযত হস্তক্ষেপ কিন্তু
খ. অর্ধতৎসম , তদ্ভব ও আগন্তুক শব্দের বানানে
ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণের মধ্যে একটা রফা করার চেষ্টা ।
কখনও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান কিছু নিজস্ব প্রস্তাব তৈরি করেছে,
যেমন বিশ্বভারতীর ক্ষেত্রে শব্দের আদি বর্ণে আশ্রিত
'অ্যা' ধ্বনির জন্য মাত্রাওয়ালা এ-কার, সংবাদপত্রের কিছু উদ্ভাবনা।
এ নিয়ে বিতর্ক চলছে এবং চলবে। তবে এবিষয়ে
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির একটি সমন্বয়চেষ্টা
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদেরই নেতৃত্বে
একটি বিশেষজ্ঞ সমিতি সমতাবিধানের কতকগুলি সর্বজনগ্রাহ্য নীতি
তৈরি করেছেন এবং একটি বানান অভিধান প্রকাশ করেছেন।
বর্তমান আলোচনায় এই প্রয়াস ও গৃহীত নীতিগুলিকে ব্যাখ্যা করা হবে।
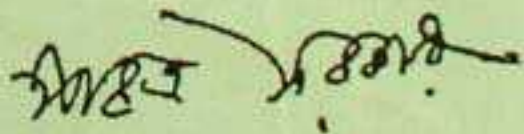
March 27, 1998

SEMINAR ON BENGALI SPELLING

10.30 A.M. - 01.30 P.M.

Department of Bengali Language & Literature

Room No. - 10

About the Seminar

Prof. Jyotirmoy Ghosh

•

Sri Nirendranath Chakraborty

Prof. Kshudiram Das

Prof. Sukdeb Sinha

Prof. Nirmal Das

Prof. Subhadra Sen

Prof. Paresh Chandra Majumder

Dr. Krishna Bhattacharya

Dr. Ratna Basu

Sri Sanat Kumar Chattopadhyay

Secretary, Paschimbanga Bangla Academy

Sri Uttapal Jha

Executive Officer, Paschimbanga Bangla Academy

•

Prof. Pabitra Sarkar

Co-Ordinator